সন্দেশ
ছোটদের সেরা মাসিকপত্র
অগ্রহায়ণ ১৪০২
শুরু হচ্ছে
সত্যজিৎ রায়ের
অপ্রকাশিত, সম্পূর্ণ
ফেলুদা-উপন্যাস
ইন্দ্রজাল
রহস্য
সম্পাদক
লীলা মজুমদার
বিজয়া রায়

১৩২০/১৯১৩ সালে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত

ছো ট দে র সে রা মা সি ক প ত্র

তৃতীয় পর্যায় বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ৮। অগ্রহায়ণ ১৪০২ ডিসেম্বর ১৯৯৫

'ফেলুদা ৩০' বিশেষ সংখ্যা

প্রচ্ছদ সন্দীপ রায়
অলঙ্করণ সত্যজিৎ রায়, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। **নামাঙ্কন** কৃষ্ণেন্দু চাকী

স ম্পা দ ক
লীলা মজুমদার
বিজয়া রায়
স হ যো গী স ম্পা দ ক
সন্দীপ রায়
শি ল্প বি ভা গ
সন্দীপ রায়। শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

কালি প্রিন্টার্স অ্যান্ড বাইন্ডার্স, ১০৯বি কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত
সন্দেশ কার্যালয়, ১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কলকাতা ৭০০০২৯ থেকে অমিতানন্দ দাশ কর্তৃক প্রকাশিত
স্বত্বাধিকারী সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি
দাম ৩০ টাকা

আ গা মী স ং খ্যা র আ ক র্ষ ণ

পৌষ ১৪০২ জানুয়ারি ১৯৯৫। দাম সাড়ে আট টাকা

সত্যজিৎ রায়ের

গোয়েন্দা ফেলুদার ধারাবাহিক উপন্যাস

ইন্দ্রজাল রহস্য

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আরও পাঁচটা ধারাবাহিক আকর্ষণ

সত্যজিৎ রায়ের

ফেলুদা ইলাস্ট্রেশন অ্যালবাম

সন্দীপ রায়ের

ফেলুদা ফোটো অ্যালবাম

সুজয় সোমের

ফেলুদার সঙ্গে আড্ডা

সেইসঙ্গে

ফেলুদা ফিল্ম-পোস্টার

ফেলুদা ক্যালেন্ডার

'ফেলুদা ৩০' বিষয়ে আরও লেখা

পবিত্র সরকার, সিদ্ধার্থ

চট্টোপাধ্যায়, কুশল চক্রবর্তী

পুরনো 'সন্দেশ' থেকে

পুণ্যলতা চক্রবর্তী ও

নরেন্দ্র দেবের গল্প

বিভাগীয় রচনা

প্রকৃতি-পড়ুয়ার দপ্তর জীবন সর্দার

গল্প-সল্প সুজয় সোম

শব্দ-জব্দ রাজশ্রী রাহা

কুইজ প্রসাদরঞ্জন রায়

বিজ্ঞানের আসর অমিতানন্দ দাশ

খেলাধুলো রূপক সাহা

বুনো রামনাথের দপ্তর

ধাঁধা

হাত পাকাবার আসর

তাছাড়া

আরও গল্প, ছড়া-কবিতা

এবং দু'-দুটো প্রতিযোগিতার

পুরস্কার-পাওয়া লেখা

প্রচ্ছদ সন্দীপ রায়

সন্দেশ । ফেলুদা ফিল্ম-পোস্টার । ১৯৭৪

ইন্দ্রজাল রহস্য / সত্যজিৎ রায় / পৃঃ ১১১

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

অগ্রহায়ণ ১৪০২ ডিসেম্বর ১৯৯৫
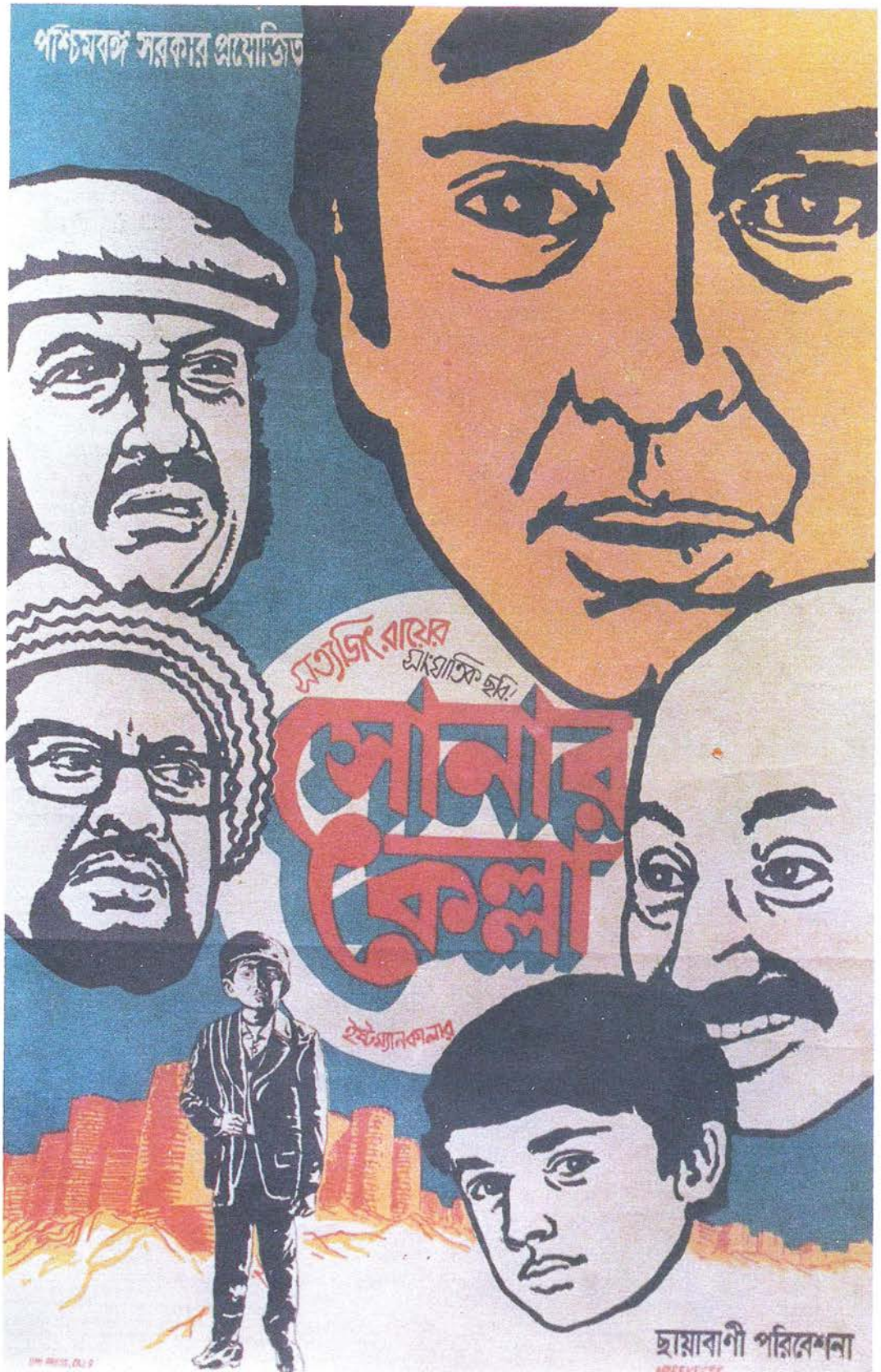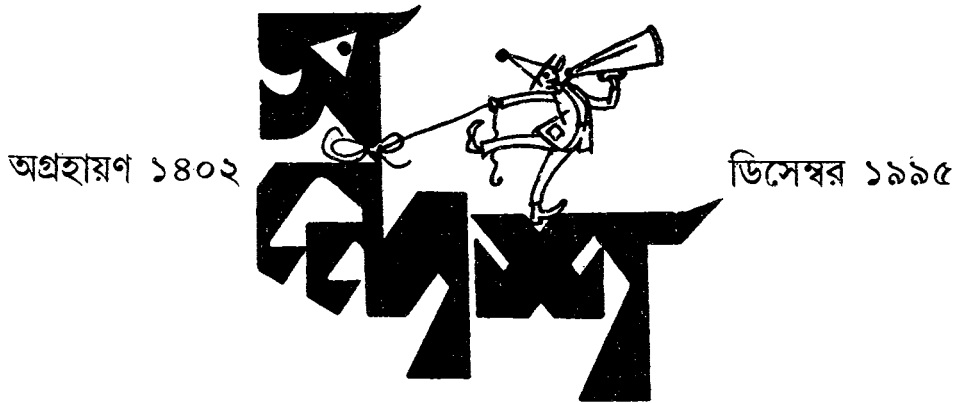
******************** 'ফেলুদা ৩০' বিশেষ সংখ্যা ********************

ফেলুদাকে

রে ব ন্ত গো স্বা মী

এই কেস্‌টায় চললে কোথায়— কোন্ কেল্লা, কোন্ পাহাড়?
ছড়িয়ে রেখে মুক্তো চুনি রত্নমূর্তি কণ্ঠহার?
থাকবে কোথায় আংটি মোহর? পাচার হওয়া সেই ছবি?
দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি? বাক্সভরা থাক্ সবই।
তিনটি দশক আগে তোমার প্রথম উদয় সন্দেশে,
'দেশ'-টা ঘুরে মাঝে মাঝে হঠাৎ উধাও কোন্ দেশে?
আড়ালে কোন্ ময়না বলে— অনেক হলো কাজ, জিরো—
চেয়ার ছেড়ে বললে হেসে, এইতো আমি আজ 'জিরো'
আমরা জানি ঠাট্টা এটা। পালটিয়েছ হয়ত ভোল—
থামিয়ে দিতে যত কাণ্ড, কেলেংকারি গণ্ডগোল।
একটি কেসেই ব্যর্থ হলে! দেখলে না তো আর খানিক—
কোন্ জগতে হারিয়ে গেল সাত রাজার ধন এক মাণিক।

ফেলুচাঁদ

লীলা মজুমদার

ফেলুদার গল্প যারা পড়েনি, তারা ঠকেছে! ভালো জিনিস উপভোগ না-করতে পারার দুঃখ আর কিছুতে নেই। মূল বাংলা ভাষায় যারা পড়তে পাবে না, তাদের জন্য অন্তত পাঁচটা ভারতীয় ভাষা এবং চারটে বিদেশী ভাষায় ফেলুদা-কাহিনী অনুবাদ হয়েছে বলে জানি, এ বড় সুখের কথা! অবিশ্যি নিরক্ষর লোকেরাও দুনিয়া-জুড়ে গোয়েন্দা ফেলু মিত্তিরকে চেনে, ড্যাব্ ড্যাব্ করে সিনেমায় দেখতে পায় বলে! লেখক নিজেই ফেলুদার দুটো খাসা গল্প নিয়ে জমজমাট চলচ্চিত্র বানিয়েছেন। জানিস, ফেলুদার মগজের ক্যারামতিতে মুগ্ধ হয়ে, আড়ালে ওঁকে আমি ফেলুচাঁদ বলে ডাকি!

ফেলুদার গল্প-উপন্যাসগুলো লেখা হয়েছে তোপ্‌সের জবানিতে, যার বয়েস ১৯৬৫ সালে ছিল সাড়ে তেরো, তারপর ২৬ বছরে (ফেলুচাঁদের শেষ উপাখ্যান 'রবার্টসনের রুবি' লেখা হয়েছে ১৯৯১ সালে) পাঁচ বছরও বাড়েনি! ফেলুদার বয়েস বেড়েছে টেনেটুনে আট বছর! ২৭ থেকে ৩৫, এই অব্‌ধি হিসেব পাচ্ছি। মোট কথা, তোপ্‌সে তার জ্যাঠ্‌তুতো দাদা গোয়েন্দা ফেলু মিত্তিরের চিরকেলে সহকারী, বেশিরভাগ রহস্য-অভিযানের সঙ্গী। আজকাল (মানে গত ৩০ বছরে) ওই বয়েসের চৌকোস্ বাঙালি ছেলেরা যে আটপৌরে ভাষায় কথা বলে, সেই চাঁচাছোলা বাংলাতেই তোপ্‌সে লিখেছে দুর্দান্ত সব ফেলুদা-কাহিনী। কোথাও কোনও আড়ষ্টতা নেই। ন্যাকামি নেই, বোকামো নেই। গল্প-জুড়ে ছবির পর ছবি ফুটে ওঠে, সিনেমায় যেমন হয়! ওঁর বাপ্-পিতেমোর মতো, সত্যজিৎ রায়ের সোনার কলমেও যে বে-পরোয়া জাদু থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

গোয়েন্দা ফেলুদার অ্যাডভেঞ্চারে তৃতীয় যে মানুষটা অপরিহার্য, তাঁর নাম লালমোহন গাঙ্গুলি—'জটায়ু' ছদ্মনামে তিনি লোম-খাড়া-করা রহস্য-উপন্যাস লেখেন। তাঁর মজাদার হাবভাব আর বোকামি-ভরা সরস কথাবার্তার মধ্যেও, সোনার মতো ঝক্‌ঝকে একটা সরল মন দিব্যি প্রকাশ হয়ে পড়ে। আহা, মাটির পৃথিবীতে এমন খাঁটি বন্ধু ক'জনের জোটে?

গল্পের রাজ্যে সত্যি-মিথ্যে বলে কিছু নেই। যদিও মন-গড়া জিনিস যতটা নিখুঁৎ হয়, বাস্তবে সেটা মুশকিল! তবু ফেলুচাঁদের সব বানানো গল্পই সত্যি। পুরোপুরি কাল্পনিক, এমনকি বাস্তবে মোটেও ঘটে না

—এমন সব বিষয়বস্তুকেও সত্যজিৎ তাঁর উপস্থাপনার গুণে, কেমন একটা বিশ্বাসযোগ্য আর বাস্তবানুগ রূপ দিয়েছেন। অবিশ্যি দুনিয়ার সব বানানো গল্পই সত্যি। আমার গল্পেও যা-কিছু পড়েছিস, তারমধ্যে কিছু ঘটেছে, কিছু হয়তো ঘটেনি। কিন্তু ঘটতেই পারে। না ঘটলেও, কিচ্ছু এসে যায় না!

ফেলুদার গল্প-উপন্যাসে যে-সব অকুস্থলে রহস্য পেকে উঠেছে, সে-সমস্ত জায়গার বর্ণনা নিখুঁৎ। কোথাও কোনও ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞানের এতটুকু ভুল-চুক চোখে পড়ে না। সব-বয়েসের পাঠকরাই ফেলুচাঁদের পাঠশালায় শেখা যাবতীয় বিদ্যে-বুদ্ধি সটাং বই থেকে তুলে, নিজের জীবনে যেমন খুশি কাজে লাগাতে পারে। বরং না-লাগালেই ঠকতে হবে। ওরে, ফেলুদার গল্পে কোথাও কোনও আলগা ভাব নেই, বাহুল্য নেই। সব ক'টা চরিত্র ন্যায্য কারণে এসেছে। ছেঁটে ফেললে কিছু যায়-আসে না—এমন একটাও দৃশ্য নেই কোথাও। বাড়তি একটা শব্দ খুঁজতে হলেও, সেই গোলমেলে কেস্‌টা ফেলুদাকেই দিতে হবে।

ফেলুদার গল্পগুলো কাল্পনিক এবং মৌলিক। কোথাও একটুও বাড়াবাড়ি নেই। বিদেশী হেঁসেল থেকে কিছু হাতানো হয়নি। জোর করে পাঠকদের ওপর কিছু চাপিয়ে দেবার চেষ্টা নেই। মেকি জিনিস বা গোঁজামিল নেই। চালাকি নেই। পাঠকদের চম্‌কে দেবার কোনও উদ্দেশ্য চোখে পড়ে না। এমনকি সব ঘটনাই মনে হয় স্বাভাবিক। হয়তো মাঝে-মধ্যে কিছু দৈব ঘটনা আছে, কিন্তু সে-সব তো যে-কোনও লোকের জীবনে ঘটতেই পারে!

অবিশ্যি গোয়েন্দা ফেলু মিত্তির ও তাঁর সহকারীকে মাঝে মাঝে যেন একটু অন্য জগতের লোক বলে মালুম হয়। পৌরাণিক কাহিনীর নায়কদের মতোই ফেলুচাঁদ সর্বদা স্ব-মহিমায় হাজির! তাঁর সেই দৈব প্রশান্তি কখনোই টস্‌কায় না, কিছুতেই হারিয়ে যেতে দেখি না। গল্পের গোড়ায় মাঝে মাঝে তিনি নিজেকেই একটা জমজমাট রহস্যের আড়ালে লুকিয়ে রাখলেও, শেষকালে অবশ্যই সাফল্যের ঝল্‌মলে মুকুট পরে 'জয় বাবা ফেলুনাথ' হয়ে ওঠেন। আবার কখনো ফেলুচাঁদের রকম-সকমের রহস্যময়তা যেন খোদ্‌ অপরাধীর চাল-চলনকেও ছাপিয়ে যায়। সাংঘাতিক সেই প্যাঁচে পড়ে, দুষ্কৃতকারীর খোঁজ পাবার জন্য হা-পিত্যেশ উত্তেজনায় ছট্‌ফট্‌ করে সব-বয়েসি পাঠক! চুল-টুল খাড়া, গায়ের রক্ত হিম, দম্‌ আটকে আসে! ব্যস, চান-খাওয়া মাথায় উঠল!

এমনকি স্রেফ মৌনতা দিয়ে নিজের সন্দেহজনক আচরণের দিকে আমাদের নজর ঘুরিয়ে রেখে, অবশেষে ফেলুদা যথেষ্ট বিশ্বাসজনকভাবে ফাঁস করে দেন যাবতীয় রহস্য-জাল। তাঁর সব তদন্তের গলিঘুঁচি, চড়াই-উৎরাই বা গোলকধাঁধা পেরিয়ে, ফেলুদা সব-সময়েই (একমাত্র চন্দননগরের সেই জোড়া-খুনের কেস্‌টা বাদে) পৌঁছে গেছেন সফলতার গন্তব্যে। কোনো কিছুতেই ফেলুদাকে ক্লান্ত হতে দেখি না। কোনও বাধাই ফেলুদার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় না। দিলেই-বা, খচ্‌মচ্‌ করে সেটা টপ্‌কাতে কতক্ষণ! মূল বাংলা ও ইংরিজিতে লেখা, কিম্বা এই দুই ভাষার জানলা দিয়ে এখনকার পৃথিবীর আরও যে-সব ভাষার গোয়েন্দাদের দেখা পেয়েছি, নিশ্চিন্তে বলতে পারি—ফেলুচাঁদকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার সাধ্যি কারো নেই!

ফেলুদার একমাত্র খুঁৎ হচ্ছে থেকে থেকেই সিগারেট ধরানো! সারাক্ষণ অমন চারমিনার ফুঁকতে দেখলে, মাঝে মাঝে আমি ভারি চটে যাই। অবিশ্যি আরও বিট্‌কেল নেশা ছিল বিলেতের সেই মস্তো গোয়েন্দা শার্লক হোমস্‌-এর—ছ্যা-ছ্যা, ইঞ্জেক্‌শনের সূঁচ! ফেলুদার সঙ্গে হোমস্‌-এর আবছা একটা মিলও দেখতে পাই।

দু'জনেরি চরিত্রের মধ্যে কোনও দুর্বলতা বা অহমিকা নেই। কখনও নিজেদের জাহির করার চেষ্টা করেনি। দু'জনেরি এতটুকু দোষ চোখে পড়ে না, যা কিংবদন্তীর নায়কদেরও বেমালুম পতন ডেকে আনে। লালমোহনবাবু পরম বন্ধু বলেই, নানা ব্যাপারে তাঁকে টিট্‌কিরি দেন ফেলুদা, বারে বারে তাঁর ভুল শুধ্‌রে দেন—ওটা কিছু দোষের জিনিস নয়, খুব স্বাভাবিক। ওটা খাঁটি বন্ধুত্বের টান! লালমোহনবাবুকে আড়ালে টিট্‌কিরি দিলে বুঝতাম, ফেলুদা লোকটা কিঞ্চিৎ ইয়ে!

তবে ফেলুদার উপাখ্যানে এন্তার গুণ থাকা সত্ত্বেও, এমন কিছু অবাস্তবতা আছে—যেমন দেখা যায় গড়ে-তোলা কোনও শিল্প-কর্মে। বাস্তব জগৎ আর রোজকার জীবনের ঢিলে-ঢালা ভাব এবং ভুল-চুককে বেমালুম এড়ানো হয়েছে বলে, ফেলুদার গল্পে কোথাও কোথাও অবাস্তব না-লেগে উপায় কী! ফেলুচাঁদ সারাক্ষণ বড় বেশি ফিট্‌ফাট্, বড্ড (একেবারে শতকরা ১০০ ভাগ) সচেতন লোক! ৩৫টা গল্প-উপন্যাসে ফেলুদার গোটা গোয়েন্দা-জীবন জুড়ে, কোথাও লোকটার এক ঝিলিক বোকামিরও আঁচ খুঁজে পাই না। এক অতিমানবের মতোই তিনি চির-অপরাজেয়! এমনকি তোপ্‌সেও আমার চেনা-জানা আর-পাঁচজন ওই বয়েসের চৌকোস্ ছেলের চাইতে একদম আলাদা। একটু বেশি বিজ্ঞ, একটু বেশি সংযত। অমন কাঁচা বয়েসে যে চাপল্য বা উচ্ছ্বাস থাকার কথা, সেটা একটুও দেখতে পাই না কেন? এক যদি না জিবে-জল-আনা খাবারের থালা সামনে এসে পড়ে!

ফেলুচাঁদের গল্প-উপন্যাসে আর-একটা ব্যাপারও কেমন যেন ঠেকে! হ্যাঁ-গা, গোয়েন্দা ও তাঁর সহকারীর আত্মীয়-পরিজনদের দেখি না কেন? এমনকি খলনায়কদের বাড়িতেও চাকর-বাকর ছাড়া কেউ নেই! ফেলুদা ও তোপ্‌সের আত্মীয়-বন্ধুরা ওঁদের চারপাশে ঘিরে থাকলে, পাঠকদের বেজায় আহ্লাদ হতো,

এমনকি তাতে গোয়েন্দাগিরিরও সুখ-সুবিধে ঢের বেড়ে যেতো। অথচ গল্পের আসল মজা বা টই-টম্বুর রসটা, মোটেই টস্‌কে যাবার সুযোগ নেই! ফেলুদা না-হয় ছোটবেলায় বাপ্‌-মা হারিয়েছে, তোপ্‌সের মা-বাবারা গেল কোথায়? দু'জনেরি ঠাম্মু-দিদু, মামা-কাকা, মাসি-পিসি কেউ নেই?

আমাদের রোজকার জীবনের চেনা-জানা মানুষদের মতো দুর্বলতা, অহংভাব আর দোষে-গুণে মেশানো একজন দারুণ মানুষকে ফেলুদা-কাহিনীতে পেলে, আমরা অবিশ্যি গলে যাই! তিনি হলেন রহস্য-রোমাঞ্চ গল্প-লেখক, ফেলুদার একমাত্র বন্ধু, ওঁদের প্রায় সব তদন্তের কাজে নিত্যসঙ্গী লালমোহন গাঙ্গুলি বা জটায়ু। রহস্যের ঘনঘটা ও মগজের ব্যায়ামের ফাঁকে ফাঁকে, অনাবিল হাসি ও সরসতার আশ্চর্য স্প্রিং-দরজাটা খুলে দেয় লালমোহনবাবুর অতি সাবলীল উপস্থিতি! জটায়ু যতই বাস্তব-চরিত্র হোক্‌-না-কেন, আমাদের চারপাশের ঝল্‌মলে জীবনে ফেলুদা বা তোপ্‌সের চাইতেও বিরল মানুষ তিনি। লালমোহনবাবুর মতো মানুষ যত বাড়বে, পৃথিবীটা তত বেশি বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। অমন অননুকরণীয় বাচনভঙ্গি, চাঁচাছোলা মেলামেশার প্যাটার্ন, ওরকম খাঁটি বন্ধুত্ব—আমাদের পান্‌সে জীবনে নুন মিশিয়ে দেয়। মনে রাখিস, খাবার-দাবারে যেমন, তেম্‌নি পার্থিব জীবনে বেঁচে-থাকাটাও স্রেফ আলুনী হয়ে গেলে মহা মুশকিল! ব্যাপারটা মোটেই সুখের নয়। নুনের চেষ্টা করো।

আর-একটা কথা। সরসতা মানে খেলো ঠাট্টা বা ছেঁদো রসিকতা নয়। সরসতা গভীর জিনিস। তারি মধ্যে গোটা জীবন-দর্শন ধরা থাকে। হাসি হচ্ছে দুনিয়া দেখার একটা ঢঙ। রঙ্গরস করতে গেলে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়। রোজকার জীবনের তলায় তলায় সরসতা বা হাসির যে স্রোত বইছে; পাথরটা সরিয়ে, তার মুখটা খুলে দিতে হয়। ভুলে যাস্‌ না, বাস্তব জগতে হাসির জিনিস বলে কিছু নেই। হাসি থাকে মানুষের চোখে, মনে, বুকের ভেতরে। আর কোত্থাও না। কী জন্যে কোন্‌ মানুষ হাসে, তাই দেখে ওই লোকটার মনের যতটা নাগাল পাওয়া যায়, আর-কোনও তদন্তে সেটা সম্ভব না। মোট কথা, তেড়ে-ফুড়ে লাগলে আকাট মুখ্যু ছেলেও মহা পণ্ডিত হতে পারে। কিন্তু সরসতা কাউকে শেখানো যায় না। সত্যজিতের মতো খাঁটি রসের ভাণ্ডটা নিয়ে জন্মাতে হয়।

ও-হ্যাঁ, বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম, স্রেফ বেয়ারা ও মোটর-গাড়ির ড্রাইভার ছাড়া, লালমোহনবাবুর জীবনেও আর-কেউ নেই কেন? ভাগ্যিস ফেলুদা ও তোপ্‌সের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক গজালো, না-হলে লালমোহনবাবুর মতো ফুর্তিবাজ মানুষেরো বেঁচে-থাকাটা আলুনী হয়ে যেতো!

জয় বাবা ফেলুনাথ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

জেলের ঘানির তেল ঢেলে দুই নাকে
পুলিশ ঘুমিয়ে আছে ব্যারাকে-ব্যারাকে।
ওদিকে যে সিন্দুক হয়ে গেল ফাঁক!
ডাক তবে সব্বাই ফেলুদাকে ডাক।

এসো ফেলু মিত্তির নিয়ে তোপ্‌সেকে,
ব্যাপারটা একবার শুধু যাও দেখে।
মাথায় ফন্দি থাক্ যতই না যার,
তোমার কাছে তো কারও নেই নিস্তার।

ওই তো ফেলুদা আসে, তোপ্‌সেও আসে।
আসে বুড়ো সিধুজ্যাঠা জটায়ুর পাশে।
তাই দেখে দূর থেকে নাকে দিয়ে খত্
খোঁজে যত নচ্ছার পালাবার পথ।

ঘন্টা বেজেছে আজ মরণকালের
এমনকী মেঘরাজ মগনলালের।
দেয়ালে ঠেকিয়ে পিঠ সেও তাই কয় ঃ
জয় বাবা ফেলুনাথ, জয় তব জয়।

ফেলুদার দিদি-দাদারা

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

শার্লক হোমস্, মেগ্রে, মিস মার্পল এবং অ্যার্কিউল পোয়ারো — সবাই-ই বেশ পরিণত বয়সের, পরিণত মগজের লোক। তুলনায় আমাদের ফেলুদা একেবারে এই সেদিনকার ছোকরা! অথচ অদ্ভুত একটা মেজাজ এবং মগজ আছে ওর। বয়সের তুলনায় বেশ পাকা ছেলে ফেলুদা এবং কলকাতায় তার পরিবেশ এবং যুগের তুলনায় বেশ সংযত, পরিশীলিত। নানা বিষয়ে এত তুখোড় ছেলেরা সাধারণত খুব ভালো চিত্র-পরিচালক হয়, যেমন হয়েছিলেন তার স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়। কিন্তু ফেলুদা কেন সখের গোয়েন্দার মতো একটা রহস্যময়, বিপজ্জনক পেশায় গেল, এটা ভাববার বিষয়।

এর প্রথম ও প্রধান কারণ অবশ্যই এই যে, সত্যজিৎ রায় চাননি যে তাঁর একটা রাতের ঘুম-কাড়া প্রতিদ্বন্দ্বী আসুক বাজারে, যদিও এতদিনে 'অপু'-ত্রয়ী থেকে 'চারুলতা' অবধি— তাঁর ধরা-ছোঁয়ার বাইরের ছবিগুলো করা হয়ে গেছে। কন্যান ডয়েল যেমন তাঁর শার্লক হোমস্ সৃষ্টির সময় কতকগুলো ব্যাপারে রীতিমতো কার্পণ্য দেখিয়েছেন, হোমসের মগজে এমন সব জ্ঞানের অভাব তৈরি করেছেন, যা কোমলহৃদয় সত্যজিৎ কখনোই করতে পারতেন না তাঁর প্রিয় ফেলুদার চরিত্রে। হোমসের অক্ষমতার তালিকা তৈরি করতে গিয়ে ওয়াটসন যেমন লিখছে ঃ

১। সাহিত্যের জ্ঞান — শূন্য।

২। দর্শনের জ্ঞান — শূন্য।

৩। জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান — শূন্য।

৪। রাজনীতির জ্ঞান — দুর্বল।

৫। উদ্ভিদবিদ্যাব জ্ঞান— চলে যায়। তবে বেলাডোনা, আফিম এবং বিষের ব্যাপারে টনটনে জ্ঞান। বাগানচর্চা বিষয়ে অবিশ্যি কিস্যু জানে না।

৬। ভূতত্ত্বের জ্ঞান — সীমিত, তবে বাস্তবোচিত। এক নজরে জমির চেহারা-চরিত্রের তফাত বলে দিতে পারে। বেড়িয়ে আসার পর লন্ডনের কোন্ পাড়ার কাদা লেগে আছে পাতলুনে, তা দিব্যি বলে দেয়।

৭। রসায়ণের জ্ঞান — প্রগাঢ়।

৮। শারীরবিদ্যার জ্ঞান — নিখুঁত, তবে খাপছাড়া।

৯। চাঞ্চল্যকর খবরের জ্ঞান — বিপুল। শতাব্দীর যে-কোনও ভয়ঙ্কর ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান ধারণ করে লোকটা।

১০। বেহালাটা ভালোই বাজায়।

১১। তুখোড় সিঙ্গলস্টিক খেলোয়াড়, মুষ্টিক এবং তরবারি যোদ্ধা।

১২। ব্রিটিশ আইনের বেশ ভালো জ্ঞান ধরে।

তালিকা থেকেই পরিষ্কার যে দুঁদে গোয়েন্দা না-হলে হোমস্কে মনে রাখা বেশ কঠিনই হতো। ওয়াটসন নিজেও বেশ অবাক হয়েছিল হোমস্ লেখক টমাস কার্লাইলের নাম জানে না দেখে। আর একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল— যখন দেখল গোয়েন্দা কোপার্নিকসের সৌরতত্ত্ব সম্পর্কেও বিলকুল অজ্ঞ। কিন্তু এর পরেও হোমস্ হোমস্। কোপার্নিকাসের থিওরিটা জেনে নিয়েই সে বলে বসল, এখন যখন জেনেই গেলাম ব্যাপারটা, ওটা ভোলার চেষ্টা করব।

আশ্চর্য হয়ে ওয়াটসন জিজ্ঞেস করল, ভুলে যাবে!

হোমস্ বোঝালেন যে মানুষের মগজটা চিলেকোঠার ঘরের মতোই, খাঁ-খাঁ। সেখানে প্রয়োজনীয় বিদ্যে না-ঢুকিয়ে, হাবিজাবি জ্ঞানে ভরাট করলে কাজের অসুবিধে। যথাকালে আসল জিনিসটা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কাজেই পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ না-করে চাঁদের চারদিকে

ঘুরপাক খেলে, তার অর্থাৎ হোমসের কাজের কী হেরফের হবে!

ওয়াটসন কবুল করেছে হোমসের অজ্ঞতা তার জ্ঞানের মতোই অসাধারণ। সত্যজিৎ কিন্তু ফেলুদার মগজের চিলেকোঠায় এত সাফসুতরো ব্যাপার রাখেননি। নিজের মগজেও যেমন দুনিয়ার তাবৎ জ্ঞানকে স্বচ্ছন্দে জায়গা করে দিয়েছেন, ফেলুদার ক্ষেত্রেও প্রায় সেটাই করেছেন। অথচ— আর এটাই সবিশেষ লক্ষ্যণীয়— তাকে অহেতুক মথাভারী করেননি!

ফেলুদা স্মৃতিধর বুদ্ধিমান হকিন্সের মতো ঠেকে চেয়ার-টেবিলে বসে মনে মনে বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড চষে বেড়াচ্ছেন। হকিন্সের শরীর অপটু, তিনি তাঁর চেয়ার থেকে মুক্ত হতে পারেননা। সত্যজিতের মোটেই সে-দশা নয়। তিনি তাঁর কাজের চেয়ার-টেবিলে স্বেচ্ছাবন্দি। তাঁর সেই বন্দিসত্তাই যেন একটা মুক্তিসফরে যায় ফেলুদাকে ভর করে। ফেলুদা গোয়েন্দা না-হয়ে চিত্র-পরিচালক হলে, স্রষ্টার এই মুক্তি সম্ভব হত না, আর এত নির্ভয়ে, অকাতরে স্নেহ ও বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে তাকে গড়ে তোলাও যেত না। আমরা প্রায়ই অবাক হয়ে লক্ষ্য করি— সত্যজিৎ কীরকম অনায়াসে তাঁর অনুরাগ, অনুভূতি, পর্যবেক্ষণ— নিজের অজান্তেই সরবরাহ করে যান ফেলুকে।

সব গোয়েন্দা-লেখকই তাঁদের নায়ক বা নায়িকা-গোয়েন্দার মারফত নিজের নিজের যুক্তি ও তত্ত্ব ব্যক্ত করেন, কিন্তু সত্যজিৎ আরেকটু বেশি দূর যান। তিনি তাঁর অল্পবয়সী পাঠক-পাঠিকাদের কথা স্মরণে রেখে, ফেলুর মাধ্যমে একজন শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। ফলে ফেলুকে একটা স্বাধীন চরিত্র হিসেবে নিছক গোয়েন্দাগিরিতে ডুবিয়ে রাখেন না। আজকের দিনে যাকে বলে role model — আদর্শ, অনেকটা তেমন কিছু করে তুলতে চান ফেলুকে। যা করতে হলে আবেগ, অনুভূতি ও সুখ-দুঃখ মিশে যাবেই চরিত্রে।

হোমস্, মার্পল বা পোয়ারোর মতো অবিশ্যি ফেলুদার বয়স, চেহারা-চরিত্র বা জীবনদর্শন বদলায়নি। যা ঘটেছে বেলজিয়ান লেখক জর্জ সিমেনোর নায়ক মেগ্রে-র বেলায়। লেখক যখন ফরাসি পুলিশ বাহিনীর এক তরুণ কমিশনারের নাম (এখন এই পদটিকে বলা হয় ওফিসিয়ে দ্য পোলিস অর্থাৎ পুলিশ অফিসার) রেখেছিলেন মেগ্রে, তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি কালে কালে কত বিচিত্রভাবে গড়ে উঠবে এই মানুষটি তাঁর কলমে, কত স্নিগ্ধভাবে বয়স্ক এবং পরিণত হবেন।

এই প্রসঙ্গে এ-কথাও জানিয়ে রাখা দরকার যে, সমস্ত বিশ্বখ্যাত গোয়েন্দা-কাহিনীর মধ্যে সিমেনোর মেগ্রে-কাহিনীগুলোই সিরিয়াস উপন্যাসের কাছাকাছি আসে। কারণ গোয়েন্দা-কাহিনী হিসেবে লেখা হলেও, সিমেনোর চেষ্টাই ছিল যাতে জীবনের জটিলতা, মনস্তাত্বিক সমস্যা, সমাজের চেহারা ইত্যাদির পর্যাপ্ত প্রতিফলন ঘটানো। শুধু বয়স নয়, ফেলুদার সঙ্গে মেগ্রের তফাত বলতে গেলে একশো একটা, সর্বত্র। আবার একটা অন্তত জায়গায় ওরা বেশ কাছাকাছি; একটু সেই আলোচনায় গেলে মন্দ হয় না। কারণ বড় হয়ে ফেলুদার কিশোর-কিশোরী ভক্তরা অবশ্যই সিমেনোর ওই অপূর্ব উপন্যাসগুলো পড়বে, নচেৎ ফেলুদা কষ্ট পাবে।

ফেলুদার মতো মেগ্রেও পকেটে অস্ত্র নিয়ে ঘোরে না। ফেলুদার মতোই মেগ্রে চিন্তা করে, চিন্তা করে সব জেনে যায়। তবে এই চিন্তার পদ্ধতিতেও ফেলুদা এবং অন্য সব গোয়েন্দাদের থেকে ভীষণরকম আলাদা মেগ্রে। অপরাধীর চিন্তা ও অনুভূতি, এক কথায় সেন্টিমেন্ট নিয়ে অকাতরে চিন্তা করে যায় মেগ্রে। একটা শব্দ বা কথা, একটা চাহনি, একটা মুভমেন্ট নিয়ে পাতার পর পাতা চলে মেগ্রের কাহিনীতে, কারণ ওটাই হচ্ছে গোয়েন্দার চিন্তার বিষয় ও ধারা। আর এতসব চিন্তার পর মেগ্রে পৌঁছে যায় অপরাধের স্থানে এবং ক্রমে সম্ভাব্য অপরাধীর বাস ও বিচরণভূমিতে। তারপর মন দিয়ে লক্ষ্য করতে থাকে তার চালচলন, গুণাগুণ, দোষত্রুটি কিংবা খেয়াল-খুশি। শেষ পৃষ্ঠায় দোষী খুঁজে বার করার ধরণ নয় মেগ্রের স্রষ্টা সিমেনোর। প্রায়শ মেগ্রে তার অপরাধীর জন্য মনে মনে ব্যথা অনুভব করে, তাকে বিচারের কক্ষে দাঁড় করিয়ে দিলেও তার জন্য সহানুভূতি হারায় না।

ফেলুদার স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় লেখক ও চিত্র-পরিচালক না হয়ে, সত্যিকারের গোয়েন্দা হলে কিন্তু 'ফেলুদা' হতেন না, 'মেগ্রে' হতেন। কারণ মানুষের চরিত্রের জটিলতা, মানুষের অপরাধ-প্রবণতার কারণ ও পরিস্থিতি এবং মানুষের প্রতি তাঁর সম্মান ও সহানুভূতি তাঁকে মেগ্রে করে তুলত। ফেলুদাকে মেগ্রের মতো করলে কিন্তু তাঁর কাহিনীগুলো আর 'সন্দেশ'-এর জন্য লেখা যেত না এবং ফেলুদা-কাহিনী আর কিশোর-সাহিত্য থাকত না। তবে ফেলুদাকে সত্যজিৎ চেহারা-চরিত্রে মেগ্রের মতোই স্বাভাবিক করেছেন, হোমস্ বা পোয়ারোর মতো উদ্ভট চেহারা, স্বভাব বা কায়দা-কানুনের লোক করেননি। মেগ্রের মতোই ফেলুদাতেও নৈতিকতা, সমবেদনা, মানবিকতা প্রচুর। মেগ্রের মতোই ফেলুদা অনায়াসেই জনস্রোতে মিশে যেতে পারেন, যেমন পারেন অবিশ্যি মিস জেন মার্পলও।

অ্যার্কিউল পোয়ারোর ওই অদ্ভুত চেহারা, বাচনভঙ্গি ও বুদ্ধির খেলার সূত্রপাত কীভাবে জানলে, গোয়েন্দা-সৃষ্টির যৌগিক, মানসিক পদ্ধতিটা বুঝতে সুবিধে হয়। আগাথা ক্রিস্টি তাঁর যৌবনকালে যখন পোয়ারোকে নিয়ে ডিটেকটিভ কাহিনী লেখা শুরু করলেন, তখন কিন্তু তাঁর মন, মেজাজ, চরিত্র সবই আদর্শ ছিল একটা রোম্যান্টিক উপন্যাস লেখার পক্ষে। ওঁর আত্মজীবনীতে

ওই বয়সের যে-সব অভিজ্ঞতা ও ঘটনার কথা বলা আছে, তা সে-সময়ের ধনীর দুলালিদের জীবনের সঙ্গে টায়েটায়ে মিলে যায়। অথচ একদিন ট্রামে যেতে যেতে একজন দাড়িঅলা লোককে দেখে ওঁর মাথায় সেই গোয়েন্দা-কাহিনীর চিন্তাটা সহসা নড়েচড়ে উঠল। কিন্তু এই দাড়িঅলা লোকটা পোয়ারোর সূত্র নয়, সেই প্রথম রহস্যোপন্যাস 'দ্য মিস্টেরিয়স অ্যাফেয়ার অ্যাট স্টাইলজ'-এর বিশিষ্ট চরিত্র আলফ্রেড ইঙ্গলথর্পের অনুপ্রেরণা। এভাবে জীবনে দেখা মানুষদের আদল থেকে টুক টুক করে তরুণী আগাথা ক্রমশ ভরিয়ে তুলছিলেন তাঁর উপন্যাসের চরিত্রচিত্রশালা। শেষে একেবারে গোঁত্তা খেয়ে পড়লেন একটা যুৎসই গোয়েন্দা তৈরি করতে গিয়ে। কাহিনী-সৃষ্টির চেয়েও গোয়েন্দা-সৃষ্টি যে কত জটিল ব্যাপার, সে কে আর প্রথমে বোঝে!

চোখের সামনে অবশ্যই ছিল শার্লক হোমস্। কিন্তু আগাথা বুঝেছিলেন যে ওরকম একটা অতুলনীয় চরিত্রকে নকল করে কিছু করা অসম্ভব, সেটা মূর্খামির পর্যায়ে পড়বে। ছিল আর্সেন লুপিন, আগাথার স্পষ্ট ধারণাও ছিল না লোকটি গোয়েন্দা না অপরাধী।

এভাবে মগজ তোলপাড় করেও যখন একটা গোয়েন্দার চেহারায় পৌঁছতে পারছেন না, তখন হঠাৎ করে মনে পড়ল ইংল্যান্ডের টর অঞ্চলে দেখা এক দল বেলিজিয়ান উদ্বাস্তুর কথা। যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের করাল কবল থেকে পালিয়ে বাঁচতে ওখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। স্থানীয় ইংরেজরা সব রকম চেষ্টাও করেছিল ওদের এই উদ্বাস্তু জীবনকে কিছুটা সহনীয়, আনন্দময় করার জন্য। তো এরকম একজন বেলজিয়ান রিফিউজিকে গোয়েন্দা খাড়া করলে কেমন হয়? ভাবতে বসলেন আগাথা।

তারপর ভাবলেন— সেই বেলজিয়ান উদ্বাস্তুকে হতে হবে একজন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার, ফলে যথেষ্ট পরিণত-বয়সি। তবে পুলিশ অফিসার ছিল বলে বেলজিয়ান গোয়েন্দার অপরাধ-বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানটাও বেশ জোরালো দেখানো গেল। আর নিজের ঘরদোর পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি রাখার বাতিকটাও চালান করে দিলেন লেখিকা তাঁর ডিটেকটিভের মধ্যে। ফলে সে গোয়েন্দা সারাক্ষণ জিনিস গুছোচ্ছে, জোড়া-জোড়া জিনিস তার পছন্দ, গোল জিনিসের চেয়ে চৌকো বস্তুর ওপর দুর্বলতা। আর সবচেয়ে বড় কথা, সে ধুরন্ধর বুদ্ধিমান। সারাক্ষণ তার নিজের ঘিলু, grey cells নিয়ে গর্ব। এবং ছোটখাটো মানুষটাকে বেশ বড়সড় নাটকীয় নাম দিতে গিয়ে, ফের অনুপ্রেরণা হিসেবে উদিত হল কন্যান ডয়েলের বিচিত্রনামধারী নায়ক শার্লক হোমস্। যার ভাইয়ের নামও তথৈব চ— মাইক্রফট্ হোমস্।

যেহেতু ছোট্টখাট্ট লোক, তাই প্রকান্ডদেহী শক্তিমান হারকিউলিস নামটাই মনে এলো। যা ফরাসিতে অ্যার্কিউল। তারপর পোয়ারো পদবিটা এলো সংবাদপত্রের একটা কাটিং থেকে। ব্যস্, একেবারে অ্যার্কিউল পোয়ারো মাথায় এসে যেতে আগাথা ভাবতে বসলেন— কাহিনীর প্লটে কীভাবে তাকে ঢুকিয়ে আনা যায়। আর একবার ঢুকে পড়ার পরে, তাকে বার করে কার সাধ্যি! বস্তুত কাহিনীতে যার মাধ্যমে পোয়ারোর প্রবেশ, সেই ক্যাপ্টেন হেস্টিংসকেই শত চেষ্টাতেও পরে আর পোয়ারো-কাহিনী থেকে তাড়াতে পারেননি ভদ্রমহিলা। 'মার্ডার অন দ্য লিঙ্কস' উপন্যাসে হেস্টিংসকে বান্ধবীও জুটিয়ে দেওয়া গেল, যাতে বিয়ে দিয়ে বিদেয় করা যায়। কিন্তু কিস্যু হল না।

হল যে না, তারও একটা কারণ ছিল। জীবনের প্রথম দিকের লেখাগুলোয় আগাথা ক্রিস্টির মাথায় ভর করে ছিলেন আর্থার কন্যান ডয়েল। আরও সরাসরি বললে শার্লক হোমস্ ও তার সহচর ডক্টর ওয়াটসন। একে আগাথা বলেছেন শার্লক হোমস্ ট্রাডিশন— পাগলাটে ডিটেকটিভ, তার কিঞ্চিৎ গবেট শাগরেদ, একটা সাদামাটা, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ইন্সপেক্টর। হোমসের ছিল ওয়াটসন, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর লেস্ট্রেড আর পোয়ারোর সেখানে হেস্টিংস, ইন্সপেক্টর জ্যাপ এবং কখনো-সখনো ফরাসি পুলিশ বাহিনীর ইন্সপেক্টর জিরো। এই জিরো আবার দু'চক্ষে দেখতে পারে না পোয়ারোকে। বলে, 'ও একটা বুড়ো হাবড়া, ওর পদ্ধতি দেখতে পাসে।' পাসে অর্থাৎ সেকেলে, গত। যদিও প্রতিবার টেক্কা দেয় পোয়ারো, আর জিরো zero হয়ে, মাথা গরম করে (হেঁট তো করবে না) বিদেয় হয়।

সত্যজিৎ ছিলেন আজীবন শার্লক হোমস্ মুগ্ধ। ছিলেন পোয়ারো আর মার্পলের স্রষ্টা আগাথা ক্রিস্টির তন্নিষ্ঠ অনুরাগী। শেষবারের মতো নার্সিং হোমে ভর্তি হওয়ার দু'দিন আগে, আমাকে এক শেষ সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, কন্যান ডয়েল ও আগাথা ক্রিস্টি ওঁর হৃদয়ের এক বিশেষ জায়গা অধিকার করে আছে। টলস্টয়, দস্তেয়েভস্কি, স্তাঁধাল, টমাস মান, অলব্যের কামু তাঁর প্রিয় লেখকদের ক'জন, আর তার পাশাপাশি এক ভিন্ন ধারার প্রিয় পাঠ হল কন্যান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি। গোয়েন্দা-উপন্যাস রচনার সময় তাই হোমস-ওয়াটসন, পোয়ারো-হেস্টিংস জুটির ধারায় তিনি ফেলুদা-তোপ্‌সে জুটি বানিয়েছিলেন। কিন্তু তোপ্‌সেকে অযথা বোকা-হাবা বানাতে প্রাণে বেধেছিল। হাজার হোক তোপ্‌সেই তো ফেলুদার ডায়েরিস্ট, যার বয়ানে পাঠক জানবে ফেলুদার কীর্তিকাহিনী। কাজেই এই ছোক্‌রাকে যদি অহেতুক হেনস্থা করা হয়, ঠাট্টার শিকার করা হয়, তা পরোক্ষে ফেলুদার অল্পবয়সি পাঠক-পাঠিকাদের মনে গিয়ে বিঁধবে। তাই সুযোগ-মতো কাহিনীধারায় প্রবেশ লালমোহনবাবুর, যিনি ওয়াটসন, হেস্টিংস, জ্যাপ, লেস্ট্রেড ও জিরোর এক মিলিত ফসল। তিনি নিজেও অকহতব্য গোয়েন্দা-উপাখ্যান লেখেন, অপরাধ সম্পর্কে গোলমেলে পর্যবেক্ষণ ও বিদ্যা জাহির করে ফেলুদাকে ব্যতিব্যস্ত করেন, আর কাহিনীকে চমৎকার রসাল করেন। 'টিনটিন'-কমিক্সের ক্যাপ্টেন হ্যাডক এবং টমসনদ্বয়ের মতো বিপদে পড়ার এবং বিপদ ডেকে আনার প্রতিভা আছে তাঁরও। তবে ওয়াটসন, হেস্টিংস, হ্যাডক এবং টমসন জুটির মতো লালমোহনবাবুর সেরা অবদান হল ডিটেকটিভ ও ডিটেকশনের ক্ষুরধার যুক্তির বিন্যাসে টান টান হয়ে ওঠা বুদ্ধির খেলাকে প্রয়োজনীয় কমিক রিলিফ বা রগুড়ে বিরতি দেওয়া। আর এই রসের ব্যাপারগুলো বলতে নেই, গোয়েন্দা-কাহিনীগুলোকে এমন এক সহজ লাবণ্য দেয়, যে কিছুদিন বাদে বাদেই এ-বইগুলো পড়তে আমাদের রীতিমতো টান তৈরি হয়।

ফেলুদার সঙ্গে কোনোদিক থেকেই বলতে গেলে মিল পাওয়া যায় না আগাথা ক্রিস্টির দ্বিতীয় অমর সৃষ্টি মিস জেন মার্পলের। প্রথমত একজন নারী, একজন পুরুষ। দ্বিতীয়ত মার্পলের একটাই অস্ত্র — মানুষের চরিত্রজ্ঞান। ফেলুদার মতো অগুন্তি বিষয়ে তাঁর অধিকার বা আগ্রহ নেই। তৃতীয়ত ফেলুদা, হোমস্ বা পোয়ারোর মতো শহুরে লোক তিনি নন। 'অ্যাট বার্ট্রামজ হোটেল' জাতীয় কিছু গল্পে তিনি লন্ডনে এসেছেন বা তাঁর নিজের গন্ডগ্রাম সেন্ট মেরি'জ মিড-এর বাইরে গিয়ে কাজ করেছেন। তবে ফেলুদা কিংবা সব সার্থক গোয়েন্দার মতো তাঁরও একটা অকল্পনীয় স্মৃতিশক্তি আছে অপরাধের ঘটনা সম্পর্কে। আর সেই স্মৃতির বলেই তিনি যে-কোনও অপরাধের ঘটনার একটি সমান্তরাল নমুনা অনায়াসেই বার করে ফেলতে পারেন। পরে সেই নমুনা — village parallel-কে কাজে লাগিয়ে তিনি চমৎকার ফল আদায় করেন। ফেলুদাকে কেউ কোনোদিন যদি তাঁর প্রিয় গোয়েন্দার নাম করতে বলত, আমার ধারণা, সে এই জেন মার্পলের নাম করত। কারণ ফেলুদা যা-যা করে, করতে ভালোবাসে, করে অপরাধী শিকার করে, তার কোনও কিছুই করেন না মার্পল। শুধু

মার্পল

মগজ খাটানো, মাঝে-সাঝে অকুস্থলে পৌঁছনো আর সন্দেহভাজনদের গতিবিধি লক্ষ্য করা ছাড়া। ইংরেজিতে যাকে বলে 'নোটস্ এক্সচেঞ্জ'— শলা বিনিময়— সেটা মার্পলের সঙ্গে করে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি পেত ফেলুদা।

মার্পলের ঢঙেরই লোক মেগ্রে, তবে সে সত্যজিতকে অনেক কিছু বলতে পারত, ফেলুদা ও মার্পলের whodunit অবসেশন এবং কিছুটা ঘরের খেয়ে পরের মোষ তাড়ানোর স্বভাব ওদেরকে বেশ কাছাকাছি এনে ফেলে। ফেলুদা বিলেতে জন্মালে অনায়াসেই মার্পলের ভাগ্নে রেমন্ড ওয়েস্ট হতে পারত, যে মাসির কীর্তিকলাপ নিয়ে বই লিখে পয়সা ও নাম করেছে। তবে রেমন্ডের চেয়ে ফেলুদার বুদ্ধি অনেক, অনেক বেশি। সে মাসির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তদন্তে নামত এবং একটা ভিন্ন পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করে ঠিক-ঠিক দোষীকে বার করে ফেলত এবং মাসির সঙ্গে সন্ধ্যেবেলায় নোটস্ এক্সচেঞ্জ করত। তবে তা যে হয়নি, তাতে ভালোই হয়েছে। না-হলে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ইত্যাদি ছায়াছবি শেষ করার পর, বেচারি সত্যজিৎ কাকে নিয়ে সময় কাটাতেন! প্রোফেসর শঙ্কু ঠিক আছেন, তাবলে ফেলুর না-থাকলে চলে? মিস মার্পলের মতো সত্যজিতও তো কম ঘরকুনো নন!

ফেলুদা থাকলে সত্যজিতের কত সুবিধে! ওকে ভর করে যেখানে খুশি বেড়িয়ে আসছেন। বিশেষত সেই-সব জায়গা, যেখানে বাল্য-কৈশোর-যৌবনে গিয়ে খুব আনন্দ পেয়েছেন। লখনৌ, পুরী, দার্জিলিং, কাঠমাণ্ডু, বারাণসী। মিস মার্পলকে দিয়ে হবেনা দেখে, দেশ-দুনিয়া বেড়াবার জন্য আগাথা ক্রিস্টি হাতে রেখেছিলেন পোয়ারোকে। সত্যজিতের মতো প্রাচীন, ঐতিহাসিক দেশ-টেশের প্রতি অনুরাগ ছিল আগাথা ক্রিস্টির। স্বামী স্যর ম্যাক্স ম্যালোয়ান তো ছিলেন পুরাতত্ত্ববিদ; তাঁর সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের সুন্দর সুন্দর সব জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে ঘোরাঘুরি করেছিলেন তিনি। যার সুফল বর্তেছিল 'ডেথ অন দ্য নাইল', 'মার্ডার ইন মেসোপটেমিয়া' 'ইভিল আন্ডার দ্য সান', 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাট সামারা' বা 'আফটার দ্য ফিউনেরাল' ইত্যাদি কাহিনীতে। সত্যজিতের ভ্রমণাদি ফেলুদা-কাহিনীকে দিয়েছে 'গ্যাংটকে গন্ডগোল', 'যত কান্ড কাঠমাণ্ডুতে', 'হত্যাপুরী', 'টিনটোরেটোর যীশু', 'সোনার কেল্লা', 'জয় বাবা ফেলুনাথ' এ তালিকা শেষ করতে গেলে, ফেলুদা-সাহিত্যই শেষ হয়ে যাবে!

'গোরস্থানে সাবধান!'- এর মতো কলকাতা-ভিত্তিক কাহিনীও এক অর্থে ভ্রমণকাহিনী, কারণ পাঠক এর রহস্যময় মহানগরীকেই আবিষ্কার করে ফেলে ফেলুদার পায়ে পায়ে হেঁটে। পাহাড়, সমুদ্র ও জঙ্গল ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে, সত্যজিৎ ফেলুকে এক দুর্মর কলকাতাপ্রীতি অর্পণ করেছিলেন। ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে তাই আমরা প্রায়শই ঘুরে বেড়াই সত্যজিৎ রায়ের ব্যাপক, বিস্তীর্ণ মানসভূগোলে। এই ভূগোলে ইতিহাস ছেয়ে থাকে, পাহাড়-উপত্যকায় যেমন অধরা চাদরের মতো ছড়িয়ে ছড়িয়ে থাকে মেঘ। আর মেঘ মানে অস্পষ্টতা, কুয়াশা, ধোঁয়াশা, রোমান্টিকতা, রহস্য। ইতিহাসও রহস্যের আলো-অন্ধকার ছড়ায় লখনৌয়ে, দিল্লিতে, কলকাতায়। পোয়ারো ও ফেলুদার সঙ্গে বেড়ানো যে কত সুখের, তা বর্ণনা করার চেষ্টাও করব না। একটু আগে উল্লেখ করা যে-কোনও একটি উপন্যাসের বিশ-ত্রিশ পাতা ওল্টালেই, আমরা সেই স্বপ্নের স্বর্গে পৌঁছে যেতে পারি

মিস মার্পল কাহিনীতে আমরা সেন্ট মেরি মিডে আবদ্ধ থাকি ঠিকই, কিন্তু বর্ণনার মাধ্যমে ওই ছোট্ট এক চিল্‌তে গ্রামকেই কিন্তু আগাথা ক্রিস্টি একটা অধরা, রোম্যান্টিক জগতে পরিণত করেন। আলস্যে ঘুমিয়ে থাকা একটা গ্রামকেই ছোট ছোট ডিটেলে এত প্রাণবন্ত, শৌখিন করে তোলেন লেখিকা যে ওই মেজাজি, আমেজি গদ্যের মাধ্যমে আমরা সেখানে বসবাস শুরু করে দিই। সিমেনো যেমন মেগ্রেকে দিয়ে ছোট ছোট গ্রামকেও কত রঙিন, জীবনে ভরপুর করে দেখান। ভালো রহস্য-কাহিনীতে পটভূমি যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা এই ভিন্ন ভিন্ন লেখকের হাতে আমরা ক্রমাগত শিখি, বুঝি, অনুভব করি।

প্রকৃতির বর্ণনাকে একটা শিল্পের পর্যায়ে তুলে নিয়ে যান কন্যান ডয়েল। 'দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস্'-এ ডেভনশায়ারের গ্রাম-দৃশ্যের বর্ণনা একটু একটু করে

মেগ্রে

যেন আমাদের তৈরি করে দেয় একটা আকস্মিক ছন্দপতনের জন্য। একটা মনোরম পটভূমিতে একটা রহস্য কীভাবে একটু একটু করে দানা বাঁধে, তার দুটি উজ্জ্বল উদাহরণ ' বাস্কারভিলস্' ও 'দ্য ভ্যালি অফ ফিয়ার' উপন্যাস। বাস্কারভিল হল-এ প্রথম যাবার পথে ওয়াটসন যে বর্ণনা রেখেছে ধাপে ধাপে, তাতে বাড়ি অবধি পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই আমরা পাঠকরা জায়গাটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই। সেই বিস্তীর্ণ বিবরণের একটু-আধটু তুলে ধরার লোভ সামলাতে পারছি না। (এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি যে মাটির রঙ, আকাশের রঙ, সূর্যাস্তের আভা, আর সেই আভায় গাছ-গাছালির বর্ণময়তা ওয়াটসনের বর্ণনায় খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। কচি ছেলে তোপ্সেও কিন্তু জায়গাবিশেষে এমন সুযোগ ছাড়ে না, যদিও এত বিস্তৃতভাবে করার বয়স ওর হয়নি এবং তেমন সুযোগও ঠিক পায়নি। ওর কাজের নমুনাতেও আমরা খানিক পরে আসব।)

স্যর হেনরি বাস্কারভিলের বাড়ির দিকে রওনা হয়েছেন গৃহকর্তা, হোমস্ এবং ওয়াটসন। ওয়াটসন লিখছে

The coachman, a hard-faced, gnarled little fellow, saluted Sir Henry Baskerville, and in a few minutes we were flying swiftly down the broad, white road. Rolling pasture bands carried upward on either side of us, and old gabled houses peeped out from amid the thick green foliage, but behind the peaceful and sunlit countryside there rose ever, dark against the evening sky, the long, gloomy curve of the moor, broken by the jagged and sinister hills....'

এর অনেক পরে আবার ওরকম এক প্রকৃতির স্তব্ধতায় আমরা খুঁজে পাই ওয়াটসনকে, যখন সে নিজেই পায়ে পায়ে উঠে এসেছে ওই পাহাড়ের চুড়োয় এবং এই সুন্দর মুহূর্তেও দুরুদুরু বক্ষে ঘ্রাণ নিচ্ছে ঘনিয়ে ওঠা রহস্যের। আর লিখছে:

The sun was already sinking when I reached the summit of the hill, and the long slopes beneath me were all golden-green on one side and gray shadow on the other. A haze lay low upon the farthest sky-line, out of which jutted the fantastic shapes of Belliver and Vixen Tor. Over the wide expanse there was no sound and no movement. One great gray bird, a gull or curlew soared aloft in the blue heaven. He and I seemed to be the only living things between the huge arch of the sky and the desert beneath it. The barren scene, the sense of loneliness, and the mystery and urgency of my task all struck a chill into my heart...'

'হত্যাপুরী' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে পুরী নয়, বিবরণ আছে নেপালের নিসর্গের। যার নামকরণ হয়েছে 'ডুংরুর কথা'। সেখানেও একটা ছোট্ট, সংক্ষিপ্ত পাহাড়ের

বর্ণনা আছে, যা খুব দ্রুত পোঁচে আঁকা একটা ছবির মতো। পুরীর সমুদ্রতটে কাহিনীর নেমে আসার আগে এটা একটা পূর্বরাগের মতো। বর্ণনাটা এরকম

ডুংরু গলা ছাড়ল। সামনে ভুট্টা খেতের ওপর দুটো মোষ আর কয়েকটা ছাগল ছাড়া কাছে-পিঠে কেউ নেই। ডুংরুর ঠিক সামনে ডুংরুর বসার ঢিবি। ওই যে দূরে ইটের তৈরি ছাতওয়ালা দোতলা বাড়ি, ওটা ডুংরুদের বাড়ি। ভুট্টার খেতটাও ওদের। উত্তরে কুয়াশায় আবছা পাহাড়ের পিছনে তিনটে বরফে-ঢাকা পাহাড়ের মধ্যে যেটার চুড়ো মাছের লেজের মতো দু'ভাগে হয়ে গেছে, যেটার নাম মাচ্ছাপুছরে, সেটার ডগা এখন গোলাপী।

প্রথম দুটো লাইন গাইবার পর তিনের মাথায় যেখানে সুরটা চড়ে, সেখানে আসতেই আকাশ ভাঙল। গুড় গুড় শব্দটা শুনেই ডুংরু এক লাফে পাঁচ হাত পাশে সরে গিয়েছিল, নইলে ওই হাতির মাথার মতো পাথরটা বাজনাটার সঙ্গে সঙ্গে ওকেও থেঁতলে দিত।

ওরে বাব্বা! ওটা কী?— বাদামগাছটার মাথা ফুঁড়ে সেটাকে তছনছ করে একরাশ ডালপালা খুবলে নিয়ে মাটিতে এসে মুখ থুবড়ে পড়ল ওটা কী?

একটা মানুষ।

না, একটা বাবু।'

পাহাড়ের এই দৃশ্যেরই যেন এক 'কাউন্টারপয়েন্ট', পাল্টা মূর্চ্ছনা পুরীর সৈকতের প্রথম বর্ণনা। তোপ্‌সে লিখছে ঃ

নিচে এসে দেখি খাঁ খাঁ। এই দিনে এত সকালে কে আর আসবে? দূরে জলে দু'তিনটে নুলিয়াদের নৌকো দেখা যাচ্ছে। তবে কালকের সেই নুলিয়া বাচ্চাগুলো নেই। তার বদলে কয়েকটা কাক রয়েছে, ঢেউয়ের জল সরে গেলেই তিড়িং তিড়িং করে এগিয়ে গিয়ে ফেনায় ঠোকর দিয়ে কী যেন খাচ্ছে, আবার ঢেউ এলেই তিড়িং তিড়িং করে পিছিয়ে আসছে।

দুজনে ভিজে বালির উপর দিয়ে হাঁটছি, এমন সময় লালমোহনবাবু বললেন, 'স্নী-বীচে শুয়ে রোদ পোয়ানোর বাতিক আছে সাহেব-মেমদের এটা শুনিচি, কিন্তু মেঘ-পোয়ানোর কথা ত শুনিনি!'

পোয়ারো

আমি জানি কথাটা কেন বললেন ভদ্রলোক। একজন চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বালির উপর হাত পঞ্চাশেক দূরে। বাঁয়ে যেখানে বীচ শেষ হয়ে পাড় উঠে গেছে, সেই দিকটায়। আরেকটু বাঁয়ে শুলেই লোকটা একটা ঝোপড়ার আড়ালে পড়ে যেত।

'কেমন ইয়ে মনে হচ্ছে না?'

আমি জবাব না দিয়ে পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম। খটকা লেগেছে আমারও।

দশ হাত দূরে থেকেও মনে হয় লোকটা ঘুমোচ্ছে, কিন্তু আরেকটু এগোতে বুঝলাম তার চোখ দুটো খোলা আর মাথার কোঁকড়ানো ঘন চুলের পাশে বালির উপর চাপ-বাঁধা রক্ত।'

সিমেনোর নায়ক মেগ্রের বিচরণ তার শহরে, আবার প্রয়োজন পড়লে গ্রামাঞ্চলে বা ছোটখাটো উপনগরীতে। কিন্তু ওই প্যারিস কি ওই-সব ছোটখাটো নগর কি গ্রামকে এক অপূর্ব কবির দৃষ্টিতে, ঔপন্যাসিকের মনস্তাত্ত্বিক ভাষায় তুলে ধরেন সিমেনো। তখন পটভূমিই হয়ে ওঠে মানব-মনের ছবি ও প্রতীক। এরকম একটি-দুটি উদাহরণ দিলে, রহস্য-কাহিনীর এই অনুপম শিল্পীর কাজের ধারাটা বোঝা সহজ হবে। আমরা বেছে নিতে পারি ১৯৪০ সালে লেখা সিমেনোর এক রহস্যঘন করুণ উপন্যাস 'মেগ্রে ইন এগজাইল' বা 'নির্বাসনে মেগ্রে'।

করুণ, কারণ এই উপন্যাসের শুরুতে দেখা যাচ্ছে গোয়েন্দাকে একটা শাস্তিমূলক পদবদলের বলি করা হয়েছে। তাকে লুসঁ অঞ্চলে ডিভিশনাল সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে বদলি করা হয়েছে। স্বভাবতই তার মন ভার, সে কাহিনীর শুরুতে উদাস নয়নে কাফেতে বিলিয়ার্ডস টেবিলে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে এবং আনমনে খেলার স্কোর গুণে যাচ্ছে   একষট্টি... বাষট্টি... তেষট্টি...

'... He glanced briefly out onto the square. The lower halves of the windows of the Cafe Francais were of frosted glass. Through the clear glass at the top there was nothing to see but the bare branches of trees, and rain and yet more rain.

'Eighty-three, eightly-four

There he stood, holding his billiard cue, seeing himself reflected to the multiple mirrors on the walls of the cafe ...'

উপন্যাসের শেষে অপরাধী শনাক্ত করার পরও, মেগ্রের মনের মেঘ কাটেনি। কারণ খুনি একজন প্রবীণ, সম্ভ্রান্ত বিচারক— যিনি নিজেও এক পরিস্থিতির বলি। অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে মেগ্রে মানুষটির মধ্যে অনেক সৌন্দর্য ও অসহায়তাও আবিষ্কার করেছে। লেখক সিমেনো তাই রহস্যোদঘাটনের পর (আশা করা যায় যে-কীর্তির বলে গোয়েন্দা তার হৃতসম্মান ফিরে পেতেও পারে), মেগ্রেকে আরেক উদাস, বিষণ্ণ মেজাজে আঁকেন অন্তিম দৃশ্যে।

He went out, lit his pipe, and walked slowly down to the harbour. He could hear the patter of footsteps behind him. The tide was rising. The beams from two lighthouses intersected in the sky. The moon had just risen, and the judge's house stood out against the night sky, all white, a harsh, glaring, unreal white.

মেগ্রের পাইপ ধরানোয় মনে পড়ল যে ফেলুদাও একটা রহস্যের কিনারা করতে পারলে, একটা চারমিনার ধরিয়ে প্রাণভরে সুখটান দেয়। ফেলুদার চরিত্রে যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন, সত্যজিতের চলচ্চিত্রে তিনিও বেশ ঘটা করে সিগারেট ঠোকাঠুকি করে, তবেই তাতে আগুনের ছোঁয়া দিয়েছেন বরাবর। শার্লক হোমসের কড়া তামাক আর পাইপ ছাড়াও নেশা ছিল কোকেনের, যদিও পরের দিকের রচনাবলিতে কোকেনের মাত্রা কমতে কমতে লুপ্তই হয়ে গিয়েছিল। এর কারণ হোমস্ কোকেন-সেবন ত্যাগ করল, না কন্যান ডয়েল আর অতশত নেশা-ভাঙ দেখিয়ে পারছিলেন না, বলতে পারব না।

পোয়ারো নিজের টেকো মাথায় আঙুল ঠুকে গ্রে সেল-এর বড়াই করেই বেশ তরতাজা বোধ করত। ওর আবার ফিটফাট থাকার বাতিক, একেবারে যাকে বলে ড্যান্ডি ; গোঁফে তা দিতেও কদাচ ভুলে গেছে সে। আর এই সমস্ত নেশা-টেশা এবং শখ-শৌখিনতা থেকে দিব্যি মুক্ত বৃদ্ধা জেন মার্পল। কর্মহীনতার সময়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য তাঁর ছিল অকাতরে উল বুলে যাওয়া। কার জন্য যে ছাই সারা বছর বুনতেন, ভাগবান জানে!

পাইপ এবং নেশার কথায় কথায় আমরা একটু সরে এসেছিলাম 'মেগ্রে ইন এগজাইল'-এর শেষ দৃশ্য থেকে। যেখানে বিচারকের অপরাধ শনাক্ত করে, নিজেই মনমরা হয়ে পড়েছেন মেগ্রে। অপরাধীর জন্য ফেলুদা ও মিস মার্পলের উন্মনা হওয়ার সুন্দর দৃশ্য আছে 'গোলোকধাম রহস্য' ও 'দ্য মিরর ক্র্যাকড্ ফ্রম সাইড টু সাইড' কাহিনীতে। আগাথা ক্রিস্টির কাহিনীতে এক বিখ্যাত নায়িকা সেন্ট মেরি মিডে ছবির শুটিং করতে এসে, ক্ষণিকের প্রতিশোধ স্পৃহায় খুন করে বসলেন। জর্মান মিজলস হয়ে নায়িকার গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। পরে আর মা হতে পারেননি নায়িকা। সেন্ট মেরি মিডে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে এলেন এক মহিলা, যাঁর মাধ্যমে মিজলসের বলি হয়েছিলেন তিনি। এটা জানামাত্র তাঁর অতৃপ্ত মাতৃসত্তা জিঘাংসার তাড়নায় উন্মাদ হয়ে, তাঁকে খুন করতে বাধ্য করল। রহস্যের শেষ প্রান্তে এসে মিস মার্পল এই মা হতে-না-পারা মানুষটির জন্য দুর্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর খুনের দায় জনগণের থেকে আগলে রেখে, তাঁকে সম্ভ্রান্ত আত্মহত্যার সুযোগ দিলেন।

ফেলুদাকে অবিশ্যি ততটাও করতে হয়নি, কারণ তাঁর নায়ক অন্ধ বিজ্ঞানী নীহাররঞ্জন দত্ত ছিলেন মৃত্যুশয্যায়। নিছক জিঘাংসা তাঁকে বাঁচিয়ে

রেখেছিল দীর্ঘকাল। সেই প্রতিশোধ নেওয়া সাঙ্গ হতে, তাঁর বেঁচে থাকাও অমূলক হয়ে পড়েছিল। ফেলুদার দ্বারা রহস্যোদঘাটনের পর আর মাত্র সতেরো দিন তিনি বেঁচেছিলেন। ফেলুদার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখাটা বড় বিষণ্ণ, অপরাধী আবিষ্কারের কোনও আনন্দই সেখানে নেই। তোপ্‌সে তার বর্ণনা দিয়েছে এইভাবে

সুবীরবাবুর পিছন পিছন আমরা নীহারবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।'

'আপনারা এসেছেন?' চেয়ারে শোয়া অবস্থায় প্রশ্ন করলেন নীহারবাবু।

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বলল ফেলুদা। 'আপনার গবেষণার কাগজপত্রগুলো ফেরত পেয়ে নিশ্চয়ই খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছেন?'

'ওগুলোর আর বিশেষ কোনো মূল্য নেই আমার কাছে।', নিচু গলায় ক্লান্তভাবে বললেন নীহারবাবু। একদিনে একজন মানুষ এত ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে সেটা আমার ধারণাই ছিল না। কালকেও দেখে মনে হয়েছে ভদ্রলোক রীতিমতো শক্ত

'আপনার কাছে মূল্য না থাকলেও আমাদের কাছে আছে,' বলল ফেলুদা। 'বিশ্বের অনেক বৈজ্ঞানিকের কাছে আছে।'

'সে আপনারা বুঝবেন।'

'আপনাকে শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই। কথা দিচ্ছি এর পরে আর বিরক্ত করব না।'

নীহারবাবুর ঠোঁটের কোণে একটা ম্লান হাসি দেখা দিল। বললেন, 'বিরক্ত আর করবেন কী করে? বিরক্তির অনেক ঊর্ধ্বে চলে গেছি যে আমি!'
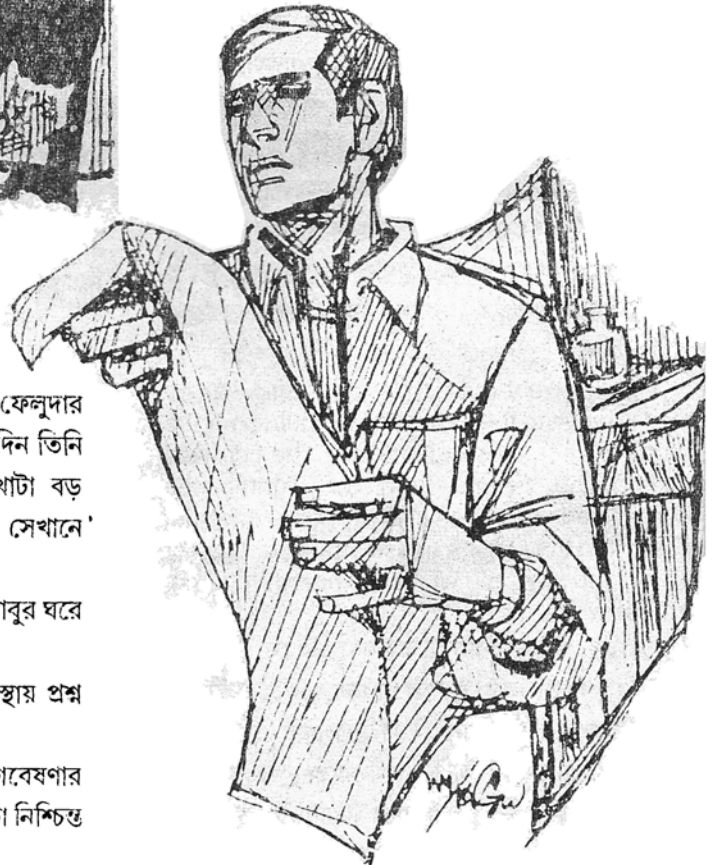
'তাহলে বলি শুনুন। কাল টেবিলের উপর দেখেছিলাম ঘুমের ট্যাবলেট দশটা। আজও দেখছি দশটা। আপনি কি কাল তাহলে ঘুমের ওষুধ খাননি?'

'না, খাইনি। আজ খাব।'

'তাহলে আসি আমরা!'

'দাঁড়ান।'

নীহারবাবু তাঁর ডান হাতটা ফেলুদার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। দু'জনের হাত মিলল। ভদ্রলোক ফেলুদার হাত বেশ ভালো করে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি বুঝবেন। আপনার দৃষ্টি আছে।'

একজন বিচক্ষণ কিন্তু অন্ধ মানুষের তরফ থেকে ফেলুদার পর্যবেক্ষণের প্রশংসা, ফেলুদার মতো পাঠককেও একই সঙ্গে আনন্দিত এবং বিষণ্ণ করে। যেমনটি আমরা বিষণ্ণ হই 'দ্য মিরর্‌ ক্র্যাকড্‌'-এর নিষ্পত্তি লগ্নে, কারণ নায়িকার আহত মাতৃত্বের জন্য অবিবাহিতা, নিঃসন্তান মিস মার্পলের

সমবেদনা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। তাঁর পানীয়ে বিষ ঢেলে, নিজের সেরা পোশাকে নায়িকা যখন জগতকে বিদায় জানিয়ে চলে যান, আমাদের বুকের ভেতরটা ক্রমাগত মুচড়োতে থাকে।

মানুষ সম্পর্কে আগাথা ক্রিস্টির এই যে সহানুভূতি, তা তিনি তাঁর 'দ্য থার্টিন প্রবলেমজ' গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'দ্য টুয়েজডে নাইট ক্লাব'-এ মিস মার্পলের বয়ানেই শুনিয়ে দিয়েছেন। ভাগ্নে রেমন্ড ওয়েস্ট প্রশ্ন তুলেছিল—

ঠিক কোন্ জাতের মগজ রহস্যোদঘাটনে সবচেয়ে বেশি সফল হয়। সাধারণ পুলিশের তো কল্পনাশক্তি বলতেই কিছু নেই। তারপর নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর জুগিয়ে বলল যে, লেখক যারা তাদের একটা ক্ষমতা থাকে মানুষের মতিগতি অনুসরণ করার। এটা লেখার শিল্প থেকেই পেয়ে যায় লেখক। ভাগ্নের এই কথায় বাদ সেধে মাসি মার্পল বললেন, তাবলে তুমি যেভাবে তোমার গল্পগাছায় মানুষকে অপ্রীতিকর করে দেখাও, তারা কি সত্যিই তেমন? আমার তো অধিকাংশ মানুষকেই খারাপ বা ভালো কিছুই মনে হয় না। কেবল মনে হয় ওদের মধ্যে কিছু বোকামি আছে।

'বোকামি'—এই কথাটাই আসল। 'মানুষের বোকামি নিয়েই, স্খলন নিয়েই রহস্য-কাহিনীকারের কাজ। অপরাধ অন্বেষণে মগজের কাজ রইল, কিন্তু অহেতুক ঘৃণা রইল না মানুষের প্রতি। রহস্য-কাহিনী মানুষ পড়ে মনের আরামের জন্য, অকারণ বিভৎসতা ও ঘৃণার জোগান তার লক্ষ্য ব্যর্থই করবে। আমাদের ফেলুদা-কাহিনীতে ফেলুদার কৌতূহলী মন, তার সদর্থক চিন্তা-ভাবনা, চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সাহস, এবং সর্বোপরি, অত্যুন্নত মানের সহবত তার গল্পগুলোকে সুন্দর মানবিকতা উপহার দেয়। রাজনীতি বা দর্শন না-থাকলেও, তাতে সমসাময়িক ঘটনার এত নিটোল প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় যে তাদের একটা অনির্দিষ্ট সময় ও প্রদেশের কথা বলে কখনোই মনে হয় না। বরঞ্চ কলকাতার লোডশেডিং, স্কাইল্যাব ভেঙে পড়ার আশঙ্কা ইত্যাদির মতো প্রসঙ্গ কল্পিত-কাহিনীকে একেবারে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়।

ফেলুদা ওরফে সত্যজিতের রঙের পছন্দ-অপছন্দও সুন্দর বেরিয়ে আসে লালমোহনবাবুর অ্যাম্বাসাডরের সবুজ রঙের প্রতি ফেলুদার তাচ্ছিল্য ভাব থেকে। এ গাড়ির 'সা-রে-গা-মা' হর্নটিও প্রয়োজনীয় বিদ্রুপের বিষয় হয়। যা দেখেশুনে ফেলুদা-কাহিনীর তন্নিষ্ঠ ভক্ত একটা সময় জেনেই যায় যে একটা বিশেষ স্তরে ফেলুদা-কাহিনী শুধু তোপ্‌সেরই নয়, স্বয়ং সত্যজিৎ রায়েরও ডায়েরি। অনেকটা প্রচ্ছন্ন, এই যা।

আবেগের তাড়না না-থাকলে যেটা এতখানি সফল হয়ে এভাবে প্রকাশ হওয়ার কথা না। যদিও সত্যজিৎ বলেছেন যে তিনি পাকেচক্রে লেখক। তাঁর ঠাকুর্দা ও পিতার প্রিয় 'সন্দেশ' পত্রিকাকে নতুন করে চালু করে তাকে জিইয়ে রাখার জন্যই, তাঁকে কলম ধরতে হয়েছিল। আমরা শুধু বলব যে, ফুস্চন্দন পড়ুক সেই সমস্যা ও পরিস্থিতির মুখে, যা সত্যজিতকে ফেলুদা-কাহিনী লিখতে বাধ্য করেছিল। ক্রিস্টোফার মর্লে যেমন ধন্য ধন্য করেছেন সেই-সব চোখের অসুখের রোগীদের, যারা লন্ডনের হার্লে স্ট্রিট পাড়ায় ২নং ডেভনশায়ার প্লেসের চোখের ডাক্তার আর্থার কন্যান ডয়েলকে চোখ দেখাতে যাননি। ফলে ডাক্তারিতে ব্যর্থ হয়ে কন্যান ডয়েল গোয়েন্দা-গপ্পো ফাঁদতে বসলেন। এবং জন্ম হল শার্লক হোমসের। মর্লের নিজের ভাষাতেই কথাটা তুলে ধরার লোভ সামলাতে পারছি না

A blessing then, on those opthalmic citizens who did not go to that office at 2. Devonshire Place, near Harley Street, where in 1891 Dr. A. Conan Doyle set up consulting rooms as an eye specialist. It was there, waiting for the patients who never came, that he began to see the possibilities in Sherlock Holmes. ...'

তবে শুধু ডাক্তারই নন, কন্যান ডয়েল ছিলেন ভালো অ্যাথলিট, তিনি শিকারি, ব্যবসায়ী, নাট্যকার, ঐতিহাসিক, যুদ্ধ সংবাদদাতা, পরলোকতত্ত্ববিদ এবং একজন infracaninophile, অর্থাৎ দুঃস্থ মানুষের বন্ধু। ডক্টর জোসেফ বেল নামের এক বন্ধুর আদলে হোমস্‌কে গড়েছেন বলে জানিয়েছিলেন কন্যান ডয়েল। তবে ডয়েলের জীবনীচর্চা করে জানা যাচ্ছে যে এডিনবরার সেই হাসপাতালের ডাঃ বেল ছাড়াও নিজের মতিগতি, চরিত্র, শখ-আহ্লাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক কিছুই তিনি ঢেলেছেন হোমসের অমর সত্তায়। নানা গুণ ও শিল্পের মানুষ সত্যজিৎ যা করেছেন প্রদোষ মিত্র ওরফে ফেলুদার মধ্যে।

সবশেষে জানাই যে ফেলুদা (যেটুকু যা চিনেছি তাকে অ্যাদ্দিনে) রীতিমতো বিব্রত হবে হোমস্‌,

মেগ্রে, মার্পল বা পোয়ারোর সঙ্গে তাকে একই নিবন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে দেখে। এটা ফেলুদার স্বভাব। তবে কলকাতার এই ব্রিলিয়ান্ট যুবক সম্পর্কে জানলে ওই বিশ্রুত কীর্তিমানরা কিন্তু একেবারেই কুণ্ঠিত হবেন না। জটিল রহস্যের তদন্তকর্মে এমন এক পরিচ্ছন্ন মেধা ও পদ্ধতি ফেলুদা দেখিয়েছে, যা ওঁদের সমীহ আদায় না-করে ছাড়বে না। ওঁদের প্রত্যেকেরই যৌবনস্মৃতির উদ্রেক হবে এবং ওঁরা আরও বেশি মুগ্ধ হবেন জেনে যে বিশ্ব-জুড়ে প্রযুক্তির ভয়াল বিস্তার হওয়া সত্ত্বেও, সুদূর এক শহরে বসে এক যুবক গোয়েন্দার মাথার ঘিলুর প্রাধান্য অটুট রেখে চলেছে হাসিমুখে।

রা জ শ্রী রা হা

কলম বা পেনসিল নিয়ে 'সন্দেশী'রা তৈরি আছো? এবারের বিষয় তোমাদের ফেলুদাদা — প্রদোষচন্দ্র মিত্তির, এ.বি.সি.ডি। উঠে-পড়ে লাগো দেখি, কে কত ঝট্‌পট্‌ সব ক'টা ফাঁকা ঘর ভরতে পারো! সমাধান আগামী সংখ্যায়।
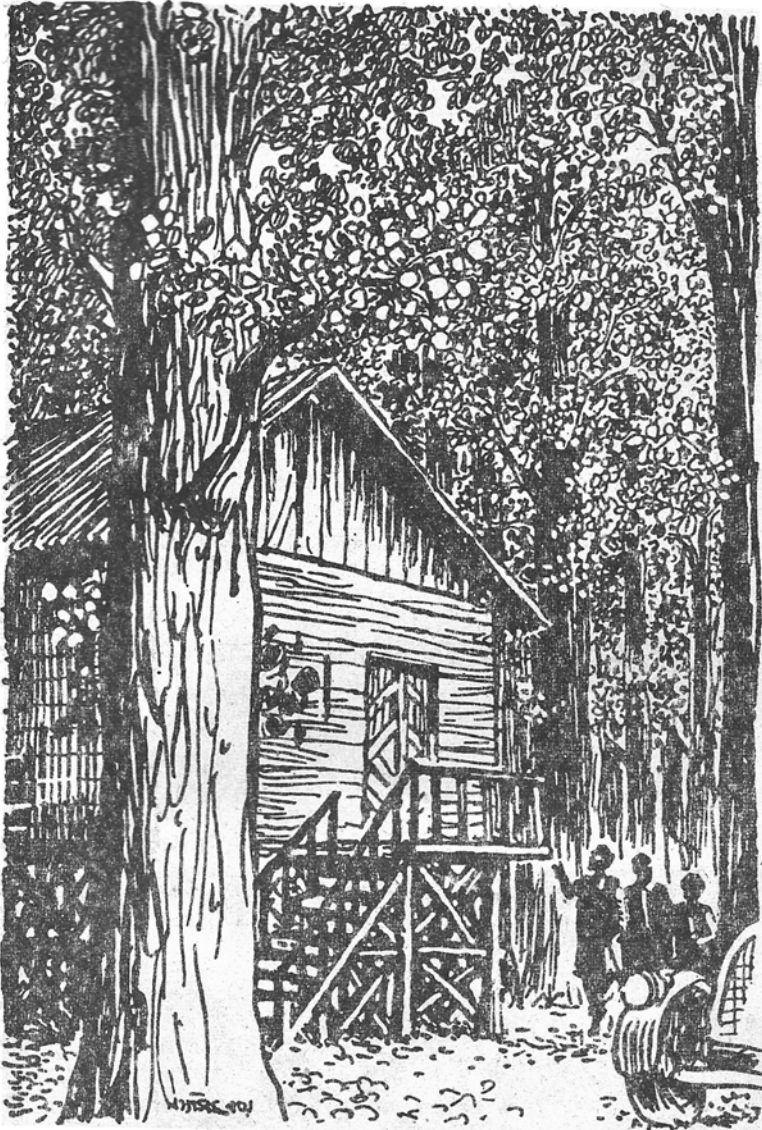
সূত্র ❑ পাশাপাশি

(১) অমিয়নাথ বর্মনের অন্য পরিচয়। (৭) ঘোষাল-বাড়ির গণেশটা যে-ব্যাটা হাতাতে চেয়েছিল। (৯) ফেলুদারা যখন গ্যাংটকে, তখন যেখানে লামা-ডান্স হয়েছিল। (১১) 'জেট বাহাদুর' সিনেমার প্রযোজক। (১৩) স্যাটারডে ক্লাবের মেম্বার, ফেলুদার বন্ধু। (১৬) যে বাঘটাকে নাম ধরে ডাকা হতো। (১৭) ফেলুদাকে যিনি উপাধি দিয়েছিলেন 'এ.বি.সি.ডি'। (১৮) শশীবাবুকে খুন করেছিল যে। (১৯) যে যন্ত্র হাতে নিয়ে মন্ত্র-পাঠ করা হয় তিব্বতে। (২০) 'জোড়া মৌমাছি'। (২১) সিনেমায় লালমোহনবাবুর নাম। (২২) কাশীতে মুন্সীর ঘাটের পাশের ঘাট। (২৬) বিলাস মজুমদারের সঙ্গে ফেলুদার যেখানে দেখা হয়েছিল। (২৭) ফেলুদা বম্বেতে যার সঙ্গে কুং-ফু লড়েছিল। (২৮) সার্কাসের বাঘের ট্রেনার। (৩০) গ্যাংটকে হোটেল স্নো ভিউ-এর ম্যানেজার। (৩১) লালমোহনবাবুর ছোটকাকা। (৩২) আচার্য-পরিবারের আদরের মেয়ে। (৩৩) ট্যাঙ্গানাইকায় যিনি নেকড়ে মেরেছিলেন। (৩৫) গ্যাংটকে জিপের ড্রাইভার। (৩৬) 'টিনটোরেটোর যীশু'তে যে হিন্দি সিনেমার উল্লেখ আছে। (৩৮) সোনার কেল্লায় যে বাচ্চা ছেলেটার বাড়ি ছিল। (৪১) সিংহরায় বাড়ির ব্যাপারে দাদা। (৪২) যার চন্দনা হারিয়েছিল, সেই ছোট্ট ছেলে অনিরুদ্ধ যে-বাড়িতে থাকত। (৪৩) সিমলার আপেল-বাগিচার মালিক।

সূত্র ❑ ওপর-নীচ

(২) 'সমাদ্দারের চাবি'তে উল্লেখিত বাজনা। (৩) দীননাথ লাহিড়ীর সহ-যাত্রীদের একজন। (৪) জীবনলাল মল্লিকের বাবা। (৫) কেদারনাথে যে লকেট নিয়ে গোলমাল। (৬) পিয়ারীলাল শেঠের মৃত্যুর আগে শেষ কথা। (৮) শশধর বোসের পার্টনার। (১০) 'জেট বাহাদুর' সিনেমার ভিলেন। (১২) পুরীতে যে পুঁথি-সংগ্রাহকের সঙ্গে ফেলুদার দেখা হয়েছিল, তাঁর পদবি। (১৪) লালমোহনবাবুর গল্প থেকে তৈরি সিনেমার পরিচালক। (১৫) লখনৌতে জীবজন্তুর ব্যবসা করতেন যিনি। (২২) সিনেমার নায়ক, আসলে ভিলেন। (২৩) মছলিবাবার আসল নাম। (২৪) 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' গল্প থেকে তৈরি হিন্দি সিনেমা। (২৫) ফেলুদার খুড়তুতো ভাই। (২৭) নিয়োগী-বাড়ির কুকুর ঠুমরীকে নিয়ে যে বেড়াতে যায়। (২৯) 'যত কাণ্ড ——তে'। (৩০) শশীবাবুর কাছ থেকে সোনার গণেশটা পেয়েছিল যে। (৩৪) 'ক্যাপ্টেন স্পার্ক'। (৩৭) 'নেপোলিয়নের চিঠি'তে যিনি দুটো নাম ব্যবহার করেছিলেন। (৩৯) 'গোরস্থানে সাবধান!' উপন্যাসের গোড়ায় ফেলুদা যাঁর সমাধি দেখতে গিয়েছিল। (৪০) উল্টিয়ে — ফেলুদার পদবি।

ফেলুদার গান

সু ম ন চ ট্টো পা ধ্যা য়

বুদ্ধি আমার শানিয়ে নেওয়া
কিছুই দৃষ্টি এড়ায় না
এদিক ওদিক বেড়ায় তবু
ভুলের পাড়া বেড়ায় না।

দার্জিলিং-এ রাজস্থানে
গন্ডগোলের গ্যাংটকে —
খুনখারাবি মূর্তিচুরি
লোভীর লালা লক্‌লকে!

গল্পে আমি দিব্যি ছিলাম
গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ শীত
আমার গল্প সঙ্গে নিয়ে
চলেই গেলেন সত্যজিৎ।

তপেশ আমার সঙ্গী ছিল
সঙ্গী ছিলেন লালমোহন
বয়স একটু বাড়তি হলেও
কম ছিল না টাটকা মন।

উটের পিঠে সওয়ার হয়ে
নাস্তানাবুদ হলেন খুব
লালমোহনের কলমখানাও
অনেক লিখে এখন চুপ।

গল্পে তিনি ভালোই ছিলেন
গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ শীত
জটায়ুকে একলা ফেলে
চলেই গেলেন সত্যজিৎ!

অনেক দেখা অনেক জানা
অনেক কিছু করার পর
স্মৃতির মধ্যে থমকে থাকা
আমার পক্ষে কষ্টকর।

জটায়ু আর তোপ্‌সেটারও
একই দশা দেখতে পাই
ইচ্ছে করে সবাই মিলে
নতুন কিছু করতে যাই।

তখন আবার গল্প হবে
রহস্যতেই ভর করে
ছুটবে আবার কল্পনাটা
সত্যজিতের পথ ধরে ।।

ফেলুদা ফাইল

দে বা শি স মু খো পা ধ্যা য়

'সন্দেশ' পত্রিকায় ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় ফেলুদার আবির্ভাব। প্রথম গল্প 'ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি'। তিন সংখ্যায় সমাপ্ত। ১৯৬৬-৬৭তে 'বাদশাহী আংটি'। ধারাবাহিক। 'সন্দেশ' পত্রিকাতেই। ফেলুদা গোড়া থেকেই বেশ সিরিয়াস। আবির্ভাবের পর কেটে গেল ৩০ বছর। গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে কাহিনীর সংখ্যা ৩৫, সেইসঙ্গে একটি অসমাপ্ত কাহিনী। এখানে ফেলুদা-কাহিনীর একটি তালিকা দেওয়া হল। কবে কোন্ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত এবং ফেলুদার গল্পগুলি কোন্ বইতে পাওয়া যাবে, তারও উল্লেখ করা হল। বন্ধনির অন্তর্ভুক্ত সাল—গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশকাল।

১।	ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি	১৯৬৫-৬৬	সন্দেশ। ডিসেম্বর—ফেব্রুয়ারি [এক ডজন গপ্পো, ১৯৭০]
২।	বাদশাহী আংটি	১৯৬৬-৬৭	সন্দেশ। মে—মে [১৯৬৯]
৩।	কৈলাস চৌধুরীর পাথর	১৯৬৭	সন্দেশ। শারদীয়া [এক ডজন গপ্পো, ১৯৭০]
৪।	শেয়াল-দেবতা রহস্য	১৯৭০	সন্দেশ। গ্রীষ্ম সংখ্যা, মে-জুন [আরো এক ডজন, ১৯৭৬]
৫।	গ্যাংটকে গণ্ডগোল	১৯৭০	দেশ। শারদীয়া [১৯৭১]
৬।	সোনার কেল্লা	১৯৭১	দেশ। শারদীয়া [১৯৭১]
৭।	বাক্স-রহস্য	১৯৭২	দেশ। শারদীয়া [১৯৭৩]
৮।	কৈলাসে কেলেঙ্কারি	১৯৭৩	দেশ। শারদীয়া [১৯৭৪]
৯।	সমাদ্দারের চাবি	১৯৭৩	সন্দেশ। শারদীয়া [আরো এক ডজন, ১৯৭৬]
১০।	রয়েল বেঙ্গল রহস্য	১৯৭৪	দেশ। শারদীয়া [১৯৭৫]
১১।	ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা	১৯৭৫	সন্দেশ। শারদীয়া [আরো এক ডজন, ১৯৭৬]
১২।	জয় বাবা ফেলুনাথ	১৯৭৫	দেশ। শারদীয়া [১৯৭৬]
১৩।	বোম্বাইয়ের বোম্বেটে	১৯৭৬	দেশ। শারদীয়া [ফেলুদা এণ্ড কোং, ১৯৭৭]
১৪।	গোঁসাইপুর সরগরম	১৯৭৬	সন্দেশ। শারদীয়া [ফেলুদা এণ্ড কোং, ১৯৭৭]
১৫।	গোরস্থানে সাবধান!	১৯৭৭	দেশ। শারদীয়া [১৯৭৯]
১৬।	ছিন্নমস্তার অভিশাপ	১৯৭৮	দেশ। শারদীয়া [১৯৮১]
১৭।	হত্যাপুরী	১৯৭৯	সন্দেশ। শারদীয়া [১৯৮১]
১৮।	গোলোকধাম রহস্য	১৯৮০	সন্দেশ। মে—আগস্ট [আরো বারো, ১৯৮১]
১৯।	যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে	১৯৮০	দেশ। শারদীয়া [১৯৮২]
২০।	নেপোলিয়নের চিঠি	১৯৮১	সন্দেশ। শারদীয়া [ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু, ১৯৮৫]
২১।	টিনটোরেটোর যীশু	১৯৮২	দেশ। শারদীয়া [১৯৮৩]
২২।	অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য	১৯৮৩	আনন্দমেলা। ৪মে—১৫জুন [এবারো বারো, ১৯৮৪]
২৩।	জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা	১৯৮৩	সন্দেশ। শারদীয়া [এবারো বারো, ১৯৮৪]
২৪।	এবার কাণ্ড কেদারনাথে	১৯৮৪	দেশ। শারদীয়া [ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু, ১৯৮৫]

২৫।	বোসপুকুরে খুনখারাপি	১৯৮৫	সন্দেশ। শারদীয়া [একের পিঠে দুই, ১৯৮৮]
২৬।	দার্জিলিং জমজমাট	১৯৮৬	দেশ। শারদীয়া [১৯৮৭]
২৭।	অপ্সরা থিয়েটারের মামলা	১৯৮৭	সন্দেশ। শারদীয়া [ডবল ফেলুদা, ১৯৮৯]
২৮।	ভূস্বর্গ ভয়ংকর	১৯৮৭	দেশ। শারদীয়া [ডবল ফেলুদা, ১৯৮৯]
২৯।	শকুন্তলার কণ্ঠহার	১৯৮৮	দেশ। শারদীয়া [আরো সত্যজিৎ, ১৯৯৩]
৩০।	লন্ডনে ফেলুদা	১৯৮৯	দেশ। শারদীয়া [ফেলুদা প্লাস ফেলুদা, ১৯৯২]
৩১।	গোলাপী মুক্তা রহস্য	১৯৮৯	সন্দেশ। শারদীয়া [ফেলুদা প্লাস ফেলুদা, ১৯৯২]
৩২।	ডাঃ মুনসীর ডায়রি	১৯৯০	সন্দেশ। শারদীয়া [বাঃ! বারো, ১৯৯৪]
৩৩।	নয়ন রহস্য	১৯৯০	দেশ। শারদীয়া [১৯৯১]
৩৪।	রবার্টসনের রুবি	১৯৯২	দেশ। শারদীয়া [১৯৯৪]
৩৫।	ইন্দ্রজাল রহস্য	১৯৯৫	সন্দেশ। ডিসেম্বর থেকে ধারাবাহিক
৩৬।	ফেলুদা	১৯৯৫	সন্দেশ। শারদীয়া (অসম্পূর্ণ, অগ্রন্থিত)

এবারে ফেলুদা-বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া হল।

ভালোনাম প্রদোষচন্দ্র মিত্র।
(ফেলুদা নামটা ঠিক থাকলেও, ভালোনামের ক্ষেত্রে লেখক প্রথমদিকে মনস্থির করতে পারেননি। নাম দিয়েছিলেন প্রদোষচন্দ্র দত্ত। মিত্র অথবা দত্ত দুই-ই কায়স্থ পদবি।)
জটায়ুর ভাষায় প্রদোষচন্দ্রের অর্থ 'প্র' হচ্ছে প্রফেশন্যাল, 'দোষ' হচ্ছে ক্রাইম, আর 'সি' হচ্ছে টু-সি অর্থাৎ দেখা অর্থাৎ ইন্‌ভেস্টিগেট।

ডাকনাম ফেলু। সকলেরি ফেলুদা। সিধুজ্যাঠা বলেন ফেলুচাঁদ।

পিতার নাম জয়কৃষ্ণ মিত্র।
ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের অঙ্ক আর সংস্কৃতের শিক্ষক।
মুগুর-ভাঁজা শরীর। ফুটবল, ক্রিকেট, সাঁতার, কুস্তি—সব ব্যাপারে দুর্দান্ত।
দুঃসাহসী। শেয়ালের গর্তে হাত ঢুকিয়ে, শেয়ালের বাচ্চা চুরি করতেন।
অল্প বয়সে মারা যান। ফেলুদার বয়স তখন ন' বছর।

পারিবারিক পরিচিতি ফেলুদার বাবারা তিন ভাই। বড়ভাই ভালো ঠুংরি গাইয়ে ছিলেন, মাত্র ২৩ বছর বয়সে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান। আর ফেরেননি।
মেজভাই ফেলুদার বাবা জয়কৃষ্ণ। ছোটভাই তোপ্‌সের বাবা, বড়দাদার সঙ্গে বয়সের তফাৎ ২৫ বছরের।
অল্প বয়সে বাবা-মা মারা যাওয়ায়, ফেলুদা কাকার বাড়িতে মানুষ।
('নায়ক' ছবির চিত্রনাট্য এবং 'ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি' প্রায় একই সময় লেখা। বোধহয় এই কারণেই গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র এবং চলচ্চিত্র-নায়ক

অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে আশ্চর্য চারিত্রিক মিল পাওয়া যায়। দু'জনেরই অল্প বয়সে বাবা-মা মারা যাওয়ায়, কাকার বাড়িতে মানুষ। দু'জনেই বিশেষভাবে আত্ম-সচেতন।)

শারীরিক বর্ণনা

উচ্চতা ৬ ফুট ২ ইঞ্চি। ছাতি ৪২ ইঞ্চি। সুদর্শন। বম্বের হিন্দি ছবির পরিচালক পুলক ঘোষাল সিনেমার হিরো করতে চেয়েছিলেন।
আগে বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলের নোখ বড় রাখত।
প্রখর দৃষ্টি। অন্ধকারে সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি দেখতে পায়।

শরীরী ভাষা

ভ্রুকুটি থেকেই বোঝা যায় বিরক্ত।
চিন্তা করার সময় কপালে চারটে ঢেউ-খেলানো দাগ ফুটে ওঠে।
ভাবনার সময় ঘনঘন পায়চারি করে বা সিলিং-এর দিকে চেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে।
চাপা উত্তেজনার সময় বাঁ-হাতের তেলোর চাপে ডানহাতের আঙুল মট্‌কাতে দেখা যায়।
মুখ দেখে মনের অবস্থা বোঝা যায় না।
একবার দাড়ি-গোঁফ রাখবে বলে সাতদিন শেভিং বন্ধ করে, আট দিনের দিন আয়নায় নিজের মুখ দেখে মত পাল্টায়।

ঘুম

অনেক রাত করে ঘুমোলেও, সূর্য ওঠার আগেই উঠে পড়ে। পাতলা ঘুম। একবার আলতো কনুইয়ের খোঁচা বা এক-ডাকেই উঠে পড়ে।

খাওয়া - দাওয়া

খাদ্যরসিক। সব-রকম খাওয়াতে অভ্যস্ত। তবে বাঙালি-খানাই পছন্দ।
এরমধ্যে বাড়িতে সোনা-মুগের ডাল, পাঁপড়, দই, কড়া-পাকের সন্দেশ।
বর্ষাকালের দুপুরে খিচুড়ি ও ডিম-ভাজা। জলখাবারে চা, সঙ্গে ডালমুট বা চানাচুর।
চায়ের ব্যাপারে খুঁতখুঁতে, কার্সিয়াঙের মকাইবাড়ি টি এস্টেট-এর চা পছন্দ।
ডালমুট আসে নিউমার্কেটের কলিমুদ্দির দোকান থেকে। রাত্রে রুটি।
সপ্তাহে একবার সবাই মিলে রেস্তোরাঁয় খেতে যায়। তবে শৌখিন খাওয়া খুব-একটা পছন্দ নয়।
বাইরে গেলে স্থানীয় খাবার অবশ্যই চেখে দেখা চাই।
খাওয়ার ব্যাপারে লোভ না-থাকলেও, নতুন গুড়ের সন্দেশ এবং খুব ভালো মিহিদানা দেখলে, সংযম মানে না।

পোশাক

ট্রাউজার্স, শার্ট। জিনস্ পছন্দ। বাড়িতে পাজামা-পাঞ্জাবি। কখনোবা ট্রাউজার্স, পাঞ্জাবি। মাঝে-মধ্যে ধুতি-পাঞ্জাবি।

বেড়াতে যাওয়ার সময় পায়ে থাকে হান্টিং বুট।
এককালে পোশাকের শখ ছিল, পরে আর তেমন দেখা যায়নি।

নেশা — সিগারেট, একটাই ব্র্যান্ড—চারমিনার। প্রয়োজনে অনায়াসে ১০-১২ ঘন্টা সিগারেট না-খেয়ে থাকতে পারে। আগে দিনে লাগতো কুড়িটা সিগারেট, কমে দশ, পরে আরও কমে যায়।
প্রথমদিকে মাদ্রাজি সুপুরি খেতো।
খাবার পর খয়ের ছাড়া মিঠে-পান।

অসুখ-বিসুখ — আগে সকালে উঠে এক্সারসাইজ করতো। পরে এক্সারসাইজ ছেড়ে আধঘন্টা করে যোগব্যায়াম শুরু করায়, শরীর সবসময় ফিট্। একদিনের জন্যেও শরীর খারাপ হয়নি।

শখ — পুরনো দুষ্প্রাপ্য বই আর পুরনো পেন্টিং-এর প্রিন্ট সংগ্রহ।
এককালে ডাকটিকিট জমানো এবং ম্যাজিকের শখ ছিল।

জ্ঞানের পরিধি — ইংরেজি থেকে বাংলায় বই অনুবাদ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর দু'জন বিখ্যাত পর্যটকের ভ্রমণ-কাহিনীর অনুবাদ বই হয়ে বেরিয়েছে।
বাস্তুশিল্প সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান। বাড়ি দেখে বাড়ির বয়স আন্দাজ করতে পারে।
গাছ চেনে।
চেনে কুকুরের জাত।
ধারণা আছে পুরনো আসবাব এবং পুরনো পোর্সিলিন সম্বন্ধে।
বাংলা-ইংরেজি দু'ধরনের টাইপোগ্রাফিতে ভালোরকম জ্ঞান।
গন্ধ শুঁকে পারফিউমের নাম বলতে পারে।
আওয়াজ শুনে গাড়ির নাম বলে দেয়।
এটিমোলজি বা শব্দের ইতিহাস বিষয়ে ওয়াকিবহাল।
বাংলা স্বরলিপি এবং সব রাগ-রাগিনীর নাম জানে। একটু-আধটু হারমোনিয়াম বাজাতে জানে।
আঁকার হাত ভালো। একবার দেখেই, পেনসিল দিয়ে সেই ব্যক্তির পোর্ট্রেট আঁকতে পারে।

বই — নিজের বাড়িতে তাক-ভর্তি দুষ্প্রাপ্য বই। যত্ন আছে। অন্য লোকের বই নিয়ে এলে, পড়ার আগে মলাট দিয়ে নেয়।
অন্যতম প্রিয় বই রামায়ণ-মহাভারত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'। ইংরেজিতে আর্থার কন্যান ডয়েল-এর শার্লক হোমস্ সমগ্র, থর

হাইয়ারডাল-এর 'আকু আকু', পৃথিবীর নানা দেশের রান্না-বিষয়ক বই এবং জিম করবেট ও কেনেথ অ্যান্ডারসন-এর রচনা-সমগ্র।
এছাড়াও যে-সব বই ফেলুদাকে পড়তে দেখা গিয়েছে এরিক ফন দানিকেন-এর 'চ্যারিয়েট অব্ দ্য গডস্', মহাকাশ-ভ্রমণ বিষয়ক বই, তাকলামাকান মরুভূমি, প্ল্যানচেট, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ক্রিমিন্যাল ইন্‌ভেস্টিগেশন-এর ইতিহাস, ডক্টর ম্যাট্রিক্স সম্বন্ধে সংখ্যাতত্ত্বের বই।
প্যারাসাইকলজি বিষয়ে পেলিক্যান পাবলিশার্স-এর দুটি বই, প্যারাসাইকলজি সোসাইটির তিনটি জার্নাল।
নিজের সংগ্রহে বাংলা-ইংরেজিতে লেখা অনেক হেঁয়ালির বই ছাড়াও, আছে 'বিদগ্ধমুখমণ্ডনম্' নামে একটি সংস্কৃত-হেঁয়ালির বই।
বিশ্বাস না-করলেও পড়তে দেখা গিয়েছে প্ল্যানচেট এবং পামিস্ট্রি-বিষয়ক বই। রেভারেন্ড প্রিচার্ড নামে এক পাদ্রীর লেখা 'লাইফ অ্যান্ড ওয়র্ক ইন্ বীরভূম' এবং 'ব্ল্যাক মার্কেট মেডিসিন'—দু'টি পৃথক ঘটনায় তদন্তের কাজে সাহায্য করে।
বিশ্বখ্যাত কমিকস্ অ্যার্জে বা জর্জ রেমির 'টিনটিন' খুবই প্রিয়।
ফেলুদার মতে, 'কোথাও বেড়াতে যাবার আগে জায়গাটার সম্বন্ধে বই পড়ে ফেলা অবশ্য কর্তব্য। কোনও নতুন জায়গায় যাবার আগে এ-জিনিসটা করে না-নিলে, সে জায়গাটা দূরেই থেকে যায়।' এই প্রয়োজনেই পড়েছে টড-এর 'রাজস্থান', 'গাইড টু ইন্ডিয়া,পাকিস্তান, বার্মা অ্যান্ড সিলোন', 'এ গাইড টু দ্য এলোরা কেভ্‌স্' ইত্যাদি।

পত্র-পত্রিকা

সবচেয়ে প্রিয় সংবাদপত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। ইংরেজিতে আগে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড', পরে 'দ্য স্টেটস্‌ম্যান'।
বাড়িতে নানা ধরনের পত্রিকা আসে ডাক-মারফৎ, তার বেশিরভাগটাই যায় বাজে কাগজের ঝুড়িতে!

সঙ্গীত

গলায় সুর আছে। মেজাজ ভালো থাকলে, হাঁটার সময় গুন-গুন করে সুর ভাঁজে, এমনকি হিন্দি সিনেমার গানও।
গাইতে শোনা গিয়েছে ওয়াজেদ আলি শা-র গান, শ্যামাসঙ্গীত এবং একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত 'আলোকের এই ঝর্ণাধারায়...'।
একটু-আধটু হারমোনিয়াম বাজাতে পারে। জানে সব রাগ-রাগিনীর নাম ও বাংলা স্বরলিপি।

সিনেমা, টি-ভি

মাঝে-মধ্যে সিনেমা দেখতে যায়। যেমন, ১। 'এন্‌টার দ্য ড্রাগন', ২। 'এপ অ্যান্ড সুপার এপ', ৩। 'টারজান', ৪। 'অভিযান'। এছাড়া দু'টি বাংলা, একটা হিন্দি ও পাঁচটা বিদেশী ছবি দেখেছে বলে জানা যায়।
'জঞ্জীর' ও 'রফু চক্কর'—এই হিন্দি ছবি দু'টি দেখবে বলে ভেবেছিল,

কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা হয়ে ওঠেনি।
টি-ভি সিরিয়ালের মধ্যে বি.বি.সি-র শার্লক হোমস্-এর সব-ক'টি এপিসোড দেখে মুগ্ধ। দূরদর্শনে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'-এর দু'-একটা পর্ব দেখেই বিরক্ত!

খেলাধুলো	সবচেয়ে প্রিয় ক্রিকেট। স্লো-স্পিন বোলার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে একবার লখ্‌নৌ, আর-একবার হিন্দু ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে খেলতে বেনারসে গেছে। তিন মাসে শিখে রাইফেল কম্পিটিশনে ফার্স্ট। দুর্দান্ত টিপ্ রিভলভারে। ১০০ রকম ইন্‌ডোর গেমস্ জানে। তাসের ম্যাজিক জানে। 'গ্রেট গেমস্ অব্ চেস' বই দেখে দাবা খেলে। জানে যুযুৎসু ও ক্যারাটে।
প্রথম কেস	২৭ বছর বয়সে, দার্জিলিঙে। অ্যাডভোকেট রাজেন মজুমদারকে কেউ ভয় দেখাচ্ছিল, তার সমাধান।
কাজের পদ্ধতি	দিশি-বিলিতি যে-কেসে যেমন দরকার।
নোট্ রাখার পদ্ধতি	সাধারণত নীল রঙের, মাঝে-মধ্যে সবুজ রঙের খাতায় ইংরেজি ভাষায় গ্রীক অক্ষরে নোট্ রাখে। কখনও বাংলাতেও। ঝর্ণা-কলম পছন্দ করলেও, ব্যবহার করে ডট-পেন। শেষদিকে মাঝে মাঝে সোনি কোম্পানির ক্যাসেট-রেকর্ডার ব্যবহার করতো।
রিভলবার	কোল্ট পয়েন্ট থ্রি টু।
পারিশ্রমিক	প্রথম ছিল আগাম ৫০০ টাকা, পরে আরও ৫০০। তারপর অ্যাডভান্স এক হাজার, সফল হলে আরও এক। শেষদিকে থোক্ পাঁচ হাজার।
নিজের কাজ সম্বন্ধে ধারণা	নিজেকে 'একটা মেনি-পয়েন্টেড স্টার বা জ্যোতিষ্ক' বলে মনে করে। গুরু মানে শার্লক হোমস্‌কে। ফেলুদা বলে, 'শার্লক হোমস্ বলে গেছেন, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা না থাকলে ডিটেকটিভ হবার কোন মানে হয় না। আমাদের কাজ শুধু তাঁকে ফলো করা।' আধা-খ্যাঁচড়াভাবে কোনও সমস্যার সমাধান করে না। মনের মতো হয়নি বলে, বেশ কয়েকটি কেস নেয়নি। মনের মতো মানে—যাতে বুদ্ধিটা শানিয়ে নেওয়া যায়।

মোট কেসের সংখ্যা	সম্পূর্ণ লেখা হয়েছে ৩৫টি। প্রকাশিত হয়েছে একটি অসম্পূর্ণ লেখাও। তপেশ লেখেনি, এমন কেসের সংখ্যাও কম নয়! যেমন, হিজলী খুনের রহস্য,পাইকপাড়ার সাধন চক্রবর্তীর কেস, রাজগড়ের খুন, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ধরণী মুখার্জির কেস, লখাইপুরের জোড়া-খুন, এলাহাবাদে সুখতঙ্কর খুন, পাটনার জাল উইল, ধলভূমগড়ে জোড়া-খুন, ব্যারাকপুরে কেদার সরকারের রহস্যজনক খুন, ক্যামাক স্ট্রিটের দীনেশ চৌধুরীর কেস, রাউরকেলায় একটা কেস, কোডার্মায় সর্বেশ্বর সহায়-এর একটা তদন্তের ব্যাপার, খড়গপুরের জোড়া-খুন, কর্নেল দালাল-এর জালিয়াতির মামলা, কলকাতার ফরডাইস লেনের খুন, হ্যাপি-গো-লাকি নামে একটা রেসের ঘোড়াকে বিষ খাইয়ে মারার রহস্য-সমাধান, ফ্যান্সি লেনে খুনের তদন্ত।
অসফল কেস	একমাত্র চন্দননগরে জোড়া-খুনের তদন্তে।
ভ্রমণ	কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও তাঁকে যেতে হয়েছে দার্জিলিং, লখ্‌নৌ, গ্যাংটক, পাটনা, রাজস্থান, দিল্লি, সিমলা, বেনারস, হাজারিবাগ, বম্বে, কাঠমাণ্ডু, আওরঙ্গবাদ, রাঁচি, পুরী, ভুবনেশ্বর, হরিদ্বার, কেদারনাথ, কাশ্মীর, মাদ্রাজ। কলকাতার কাছে পানিহাটি ও বামুনগাছি, পলাশির ঘুরঘুটিয়া, বারাসাত ছাড়িয়ে সিদিকপুর, বোলপুর-শান্তিনিকেতন, কাটোয়া থেকে সাত মাইল দূরে গোঁসাইপুর, দীঘা, সোনাহাটি, জলপাইগুড়ি হয়ে তরাইয়ের জঙ্গল বা লক্ষ্মণবাড়ি অঞ্চল, বীরভূম। বিদেশে গেছে দু'বার, হংকং আর লন্ডনে।
যানবাহন	কলকাতার মধ্যে যাতায়াতের জন্যে ট্যাক্সি, কখনোবা লালমোহনবাবুর সবুজ অ্যাম্বাসাডার। যদিও ট্রাম পছন্দ করে। কাছাকাছির মধ্যে হলে ট্রেন বা লালমোহনবাবুর গাড়ি। ভারতের মধ্যে হলেও গ্যাংটক ও দার্জিলিং, বম্বে হয়ে আওরঙ্গাবাদ, কিম্বা দিল্লি হয়ে শ্রীনগর গেছে বিমানে। হংকং ও লন্ডন অবশ্যই বিমানে গিয়েছে। নিজে গাড়ি চালাতে পারে।
পরিচিত মহল	কলকাতার পুলিশ-মহলে ফেলুদাকে চেনে না, এমন লোক নেই। কলকাতার বাইরেও কাজের সূত্রে অনেক পুলিশের লোকের সঙ্গে পরিচয় আছে। গ্র্যান্ড হোটেল-এর রিসেপসনিস্ট, খবরের কাগজে বেশ কিছু চেনা লোক আছে। রেলে প্রচুর জানাশোনা, বুকিং-এ সুবিধা হয়।

কলেজের সহপাঠীদের মধ্যে অনুতোষ বটব্যাল, সুহৃদ সেনগুপ্ত, সোমেশ্বর সাহার নাম জানা যায়। এক বন্ধু বম্বেতে গ্ল্যাক্সো কোম্পানিতে কাজ করে।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

আত্ম-সচেতন। বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভালবাসে। সহজে ঘাবড়াবার পাত্র নয়।

রসবোধ আছে। তীক্ষ্ণধী। নির্লোভ ও সৎ। সময়নিষ্ঠ। পায়ে হাত দিয়ে কেউ প্রণাম করলে, বিব্রত বোধ করে। কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না।

প্রমাণ ছাড়া কোনো জিনিস বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করাটা বোকামি বলে মনে করে। ফেলুদার ধারণা, 'মনটা খোলা না রাখলে মানুষকে বোকা বনতে হয়।' কাঁদুনে বা ভীতু লোককে বরদাস্ত করতে পারে না।

কখনও কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যায়নি।

রবিবার বা ছুটির দিনেও কোনও বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারেনি।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য

এয়ার কন্ডিশনিং পছন্দ করে না।

দু'হাতে লিখতে পারে।

নিজের দেশ ও সংস্কৃতি বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। রাস্তার নাম পাল্টানো, শহীদ মিনারের চুড়োয় লাল রঙ করা বা নিউমার্কেট ভেঙে ফেলে মাল্টি-স্টোরি সুপার মার্কেট হওয়ায় তীব্র আপত্তি।

ঠিকানা

বরাবর দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা। আগে থাকতো তারা রোডে। পরে ২৭ রজনী সেন রোড, কলকাতা ৭০০০২৯। 'সন্দেশ'-আপিসের কাছেই। কাকার বাড়ি। ফোন আছে নিজের নামে।

পুরস্কার ও সম্মান

এলাহাবাদে সুখতঙ্কর খুনের কেসে 'নর্দান ইন্ডিয়া পত্রিকা'য় ছবিসহ সংবাদ প্রকাশিত।

বাংলা কাগজে সাক্ষাৎকার, সঙ্গে চারমিনার-হাতে ছবি।

ওষুধের চোরা-কারবার, সেইসঙ্গে জাল নোটের কারবার ধরে দেওয়ার জন্য নেপাল সরকার কর্তৃক সম্মানিত।

সোনাহাটি রিক্রিয়েশন ক্লাব সংবর্ধনা জানায়।

জটায়ুর দেওয়া উপাধি 'এ বি সি ডি—এশিয়াজ বেস্ট ক্রাইম ডিটেক্টর'।

ফেলুদা-কাহিনীর লেখক

তপেশরঞ্জন মিত্র। ডাকনাম তপেশ, ফেলুদা ডাকে তোপ্‌সে বলে। ফেলুদার ছোটকাকার ছেলে, সাড়ে তেরো বছর বয়সে স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ফেলুদার সহকারী। বুদ্ধিমান, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আছে। বই পড়তে ভালোবাসে। ভালো ইংরেজি জানে। ক্রিকেট ছাড়াও, তোপ্‌সে বেশ কিছু ইন্‌ডোর গেমস্‌ জানে।

অচেনা চেনা ফেলুদা

জীবন সর্দার

ফেলুদাকে কখনও সামনা-সামনি দেখিনি। কিন্তু তাকে অনেককাল আগে থেকে চিনি। গ্রাম-সুবাদে নাম-সুবাদে চেনা। ফেলুদাদের দেশের বাড়ি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার সোনাদীঘি গ্রামে। সেখানকার মিত্রদের খুব নামডাক। যেমন বিদ্যায়, তেমনি বুদ্ধিতে। ফেলুদা সেই বংশেরই ছেলে। বড় হয়ে সে যে খুব নামটাম করবে, ছোটবেলাতেই তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তার আগে ফেলুদার বাবার কথা একটু না-বললে, ছেলের চরিত্রের গুণের উৎস কোথায় বোঝা যাবে না।

ফেলুদার বাবা ছিলেন অঙ্কের মাস্টারমশাই। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়াতেন। খেলাধুলোর জন্য ছাত্রদের তিনি খুব প্রিয় ছিলেন। সাহস, বুদ্ধি আর শক্তির জন্য আরও প্রিয় ছিলেন বিক্রমপুরের বিপ্লবীদের কাছে। বিশেষ করে, রাউৎভোগ বালিগাঁর বসুরা তাঁকে বোমা বানানো, পিস্তল ছোঁড়ার শিক্ষাগুরু বলে মান্য করতেন। তাঁর ঢাকার বাসায়, গেণ্ডারিয়াতে পুলিশ বহুবার তল্লাশি চালিয়েও, তাঁর কাজকর্মের টিকিটিও বুঝতে বা ধরতে পারেনি। কিন্তু কী এক অজানা রোগে তিনি যখন চোখ বুজলেন, ফেলুদার তখন ন'বছর মাত্র বয়স। সে তার আগেই মা-হারা। তাই কলকাতার এক কাকা এসে তাকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই শিশু-বয়সেই তার বাবার সাহস, বুদ্ধি আর সব সৎ গুণের বীজ তার মধ্যে বোনা হয়ে গিয়েছিল।

সোনাদীঘির মিত্ররা দেশভাগের আগেই এপার বাংলায় চলে আসেন। লোহাজঙ থেকে আমরা আসি দেশভাগের পর। তাই পাশের গ্রামের শিশুদের প্রিয় ডানপিটে সর্দার ফেলুদার খোঁজ পেতে বহু বছর পার হয়ে গিয়েছিল। আমরা তখন জলপাইগুড়ির কাছে একটা ছোট্ট শহরে থাকি। একদিন হাটের মেলায় একটা বাঘ শিকারের খবর লোকের মুখে মুখে শুনতে পেলাম। বাঘটা নাকি মানুষ-খেকো। সিংহরায়দের স্টেটে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। কলকাতার এক ছোক্‌রা শিকারী, প্রদোষ মিত্র যার নাম, মাটিতে দাঁড়িয়েই এক গুলিতে, নাকি কেউ কেউ বলল দুই গুলিতে, তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিয়েছে।

মাটিতে দাঁড়িয়ে, সোজা দাঁড়িয়ে শিকার করতেন সুন্দরবনের আর্জান সর্দার, কুমায়ুনের করবেট আর দক্ষিণ ভারতে অ্যান্ডারসন। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্যাটারসনও দাঁড়িয়েই সিংহ শিকার করতেন। এতে বিশেষ এলেম দরকার। খবরের কাগজে ঘটনার বিবরণ পড়ে প্রদোষ মিত্রই যে ফেলুদা, সোনাদীঘি গ্রামের ফেলুদা, জানতে পেরে চিঠিতে যোগাযোগ করি। উত্তর এলো তোপ্‌সের কাছ থেকে।...

সে লিখল দরকার পড়েছিল বলে ফেলুদা বাঘটিকে মেরেছে। তবে তার মনে পশুপাখির জন্য দরদ একটুও কমেনি, বরং বেড়েছে। ফেলুদা বলে, জানোয়ারের মতি-গতি বোঝা মানুষের চেয়ে অনেক সহজ। কারণ জানোয়ারের মতো জট-পাকানো নয়। মানুষের মন মানুষের যে সবচেয়ে বেশি সাদাসিধে, তারও মন একটা বাঘের মনের চেয়ে অনেক বেশি প্যাঁচালো। তাই একজন অপরাধীকে সায়েস্তা করাটা বাঘ মারার চেয়ে কম কৃতিত্ব নয়...

শেষ লাইনে তোপ্‌সে বোঝাতে চেয়েছিল—ফেলুদার পেশা আসলে কি। কেন না আমার চিঠিতে শিকার শিকার খেলা ছেড়ে প্রাণীদের হাব-ভাব স্বভাব

জানাটা যে এখন বেশি জরুরি, তার একটু ইঙ্গিত ছিল।

সেই শুরু তারপর প্রায়ই তোপ্‌সের কাছে চিঠি লিখে ওদের খবরাখবর নিতাম। তোপ্‌সে জেনে গিয়েছিল আমার ইন্টারেস্ট কোন বিষয়ে। তাই তার চিঠিতে ফেলুদার জ্ঞান, পর্যবেক্ষণের ফলাফল, আর কাজের ধারা একটু-না-একটু লিখে জানাতে ভুল হত না। বিশেষ করে নতুন জায়গায় গেলে তার বিবরণ থাকতই। আমি না-জানিয়ে প্রায়ই ওদের অনুসরণ করতাম। তবে ভিন্ন পথে, এবং আমার বিষয়ের খোঁজ খবর নেবার তাগিদেই। পশ্চিম বাংলা এই করেই আমার দেখা হয়ে গেছে। আসলে এই দেখার 'কিউ' পেয়েছিলাম তোপ্‌সের এক চিঠিতে।

সে লিখেছিল '...ফেলুদা বলে যে বাংলা ভারতবর্ষের কটিদেশে হওয়াতে এখানে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। বাংলার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এটা ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশে নেই। এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট অফ জিয়োগ্রাফি। এত বৈচিত্র্য আর কোনও প্রদেশে পাবি না।'

ফেলুদা যদিও চিঠি লিখত না, কিন্তু তোপ্‌সের চিঠিতেই তার ভাষাজ্ঞানের পরিচয় ছড়ানো ছিল। বাংলাদেশ সম্পর্কেই ফেলুদার মন্তব্য তোপ্‌সের চিঠিতে আরও ছিল। 'শস্য শ্যামলাও পাবি, রুক্ষতাও পাবি, সুন্দরবনের মতো জঙ্গল পাবি, গঙ্গা পদ্মা মেঘনার মতো নদী পাবি, সমুদ্র পাবি, আবার উত্তরে হিমালয় আর কাঞ্চনজঙ্ঘাও পাবি।'

ফেলুদার ভাষা তোপ্‌সে যেমন লিখেছে, হুবহু তুলে দিলাম। আমি জানি, ফেলুদা নদী-সমুদ্র-পাহাড়-বন কোথাও ঘুরতে বাকি রাখেনি। তোপ্‌সে শুধু সেই সেই জায়গার কথাই লিখেছে যেখানে ফেলুদা, মানুষের মনের অন্ধকার দিকটা একটানে খুলে দেখিয়েছে।

ফেলুদা যেমন পড়তে ভালোবাসে, তেমনি জঙ্গল দেখতেও। সে সুন্দরবনে একবার গিয়েছিল, সঙ্গে ইংরেজ বন্ধু ছিল বলে। সে একজন লেখক। তার লেখা বইতে মাঝে মাঝে ফেলুদা আর তোপ্‌সের কথাও থাকে। তার নাম অ্যান্ড্রু। নৌকোয় সে গিয়েছিল সুন্দরবন দেখতে। তোপ্‌সে হয়ত যায়নি বলে সে বিবরণ আমি পাইনি। শুনেছি, চোরাগাজির খালে একটা কুমির হেঁতাল গাছের মাথা থেকে ওদের নৌকোয় ঝাঁপ দিয়েছিল। সেই ইংরেজ ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন, বোটের শব্দে চম্‌কে উঠে জলে ঝাঁপ দিতে গিয়ে, টাল সামলাতে না-পেরে নৌকোয় পড়েই জলে ঝাঁপায়। থ্রিল ছিল এতে। যাক্‌, তোপ্‌সের কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নিতে হবে।

এই ঘটনার সামান্য উল্লেখ দরকার ছিল। কেন না প্রকৃতির সব কিছুতেই ফেলুদার আগ্রহ সমান। কি গুবরে পোকা কিংবা প্রজাপতি, ফ্লাইক্যাচার কিংবা যাযাবর পাখি, মরুভূমির উট কিংবা হিমালয়ের ভালুক— ফেলুদা বিশেষ সময় করে তাদের বিষয়ে

পালকি ও ফেলুদা

বনের কাছেই রাস্তায় বাঘের মুখোমুখি ফেলুদার সঙ্গীরা

যেমন পড়ত, তেমনি সুযোগ পেলেই ঘুরে দেখত। গাছ চেনা, পাখি চেনা ছিল তার বিশেষ শখ। তবে সে-সম্পর্কে বর্ণনা দেবার তার নিজস্ব একটা ধারা ছিল।

তোপ্‌সেই আমাকে লিখেছিল '...ফেলুদা বলে, গাদাগুচ্ছের মর্চে-ধরা বিশেষণ আর তথাকথিত লোম খাড়া করা শব্দ ব্যবহার না করে চোখে যা দেখলি সেইটে ঠিকঠিক সোজাসুজি বলে গেলে কাজ দেবে ঢের বেশি।...'

কোনও কিছুর বর্ণনার এই রীতি মানতে পারলে যে লাভ হয়, পরিশ্রম কমে, সেটা বুঝে গেছি।

তোপ্‌সে তার লেখায় এই রীতি খুব মেনে চলে। প্লেন থেকে হিমালয় দেখার শৃঙ্গগুলোর বর্ণনা খুব অল্প কথায় আমাকে জানিয়েছিল। সেটা বোধহয় কাঠমাণ্ডু যাবার সময়। কক্‌পিটে ফেলুদার পিছনে দাঁড়িয়ে, গলা বাড়িয়ে যা দেখেছিল, সে লিখেছিল, তাই যথেষ্ট ঃ

'পরপর চুড়োর লাইন ডানদিক থেকে এসে বাঁয়ে ঘুরে যেদিকে প্লেন যাচ্ছে সেদিকে একটা প্রাচীর সৃষ্টি করছে। দূরত্ব যতই কমে আসছে, শৃঙ্গগুলো ততই ফুলে-ফেঁপে চাঙ্গিয়ে চিতিয়ে উঠছে। কো-পাইলট চিনিয়ে দিল পরপর চুড়োগুলো। কাঞ্চনজঙ্ঘার পরই মাকালু, আর তার দুটো চুড়োর পরেই এভারেস্ট। বাকিগুলো হল গৌরীশঙ্কর, অন্নপূর্ণা আর ধবলগিরি।'

ব্যস্, চোখ বুজে আমিও যেন এই দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছি। মনে হয় না— আমি প্লেনে কাঠমাণ্ডু যাইনি!

কাঠমাণ্ডু, বেনারস, লখ্‌নৌ— ফেলুদার বিশেষ কারণে ভালো লাগত যেমন ভালো লাগে পুরনো বই কিনতে। আসলে প্রাচীন ঐতিহ্য ফেলুদাকে বোধহয় খুব আকর্ষণ করে। বেনারস না-বলে ফেলুদা কাশী বলত। যখন সে কলেজের ছাত্র, তখন প্রথমবার সেখানে

গিয়েছিল ক্রিকেট খেলতে। কাশীর বিশেষত্ব তার বিশেষ গন্ধে। সব শহরেরই অবশ্য আলাদা গন্ধ। কাশী সম্পর্কে গন্ধ-বিশেষের কথা ফেলুদা জটায়ুকে যা বলেছিল, তোপ্‌সে হুবহু আমাকে জানিয়েছিল 'বিশ্বনাথের গলিতে ধূপ ধুনো গোবর শ্যাওলা লোকের ঘাম মেশানো গন্ধ, আবার গলি ছেড়ে বাইরে এসে কিছুক্ষণ প্রায় একটা নিউট্রাল গন্ধহীন অবস্থা। আবার ঘাটের সিঁড়ি যেই শুরু হলো, অমনি একটা উগ্র গন্ধ ক্রমে বেড়ে গিয়ে প্রায় পেটের ভাত উলটে আসার অবস্থা...। তারপর একটা গন্ধ যাতে জল মাটি তেল ঘি

শান্তিনিকেতনের কাছেই সাঁওতাল গ্রামে ফেলুদা

ফুল চন্দন ধূপ ধুনো সব একসঙ্গে মিশে রয়েছে।'

এই কথাগুলি ফেলুদা এমনি এমনি বলেনি। সে আবহাওয়ার পল্যুশন নিয়ে খুব ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে। যেটা শহরের মানুষ স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে, সেটা স্বাভাবিক হলেও যে স্বাস্থ্যকর নয়, ফেলুদার চিন্তায় তা স্থান পেয়েছিল। কলকাতা সম্পর্কে তার ধারণা খুলে না বললেও চলবে। শহরগুলি যে ধীরে ধীরে 'মরণপুরী' হয়ে উঠছে, ফেলুদার কথায় তার ইশারা রয়েছে — এ কথাই আমার মনে হচ্ছে।

আবহাওয়া দূষণ আর পরিবেশ সংরক্ষণের কথা নিয়ে ফেলুদাকে একটি চিঠি লিখেছিলাম। উত্তর যথারীতি তোপ্‌সে দিয়েছিল। এ ব্যাপারে ফেলুদাও নানা সংস্থার সঙ্গে কথা বলেছে। অর্থাৎ, তার উৎসাহ আছে এবং পরামর্শ পাব। তোপ্‌সে চিঠির শেষে লিখেছিল, ওরা শান্তিনিকেতন যাচ্ছে বেড়াতে। সেখানে বা বক্রেশ্বরের ট্যুরিস্ট লজে ক'দিন থাকবে। আমি যেন খুব শিগ্‌গিরি সেখানে হাজির হই। এতদিন বাদে তার দেখা পাব, এই আনন্দে আমি আমার কাজ সারতে ভরতপুর চলে গেলাম।

ভরতপুর আগ্রার কাছে। সেখানে কেওলা-দেবী খানা পাখিরালয়ে সাইবেরিয়ার সারস নিয়ে একটা গবেষণা হচ্ছিল। আমার ইচ্ছে ছিল ওটা দেখার। আগ্রার আবহাওয়াও কলকাতার মতো মলিন হয়ে উঠেছে। ভরতপুরে তার প্রভাব পড়েছে। পখিরালয়ে ভিন্ দেশি পাখির আসা খুব কমে গেছে। এটা দেখে আমি আলোয়ার, ডিগ, সিলিসের, বিকানীর হয়ে জয়সলমীরের পথে পাড়ি দিলাম। ইচ্ছে ভারতের মরুভূমি দেখা। তোপ্‌সেরা অনেক আগেই জয়সলমীর ঘুরে গেছে— এ-খবর সে একটা চিঠিতে লিখেছিল। সে বলেছিল, আমি যেন ও-জায়গাটা দেখে আসি। আর ভারতের ময়ূর ও উটের বিশেষ কী লক্ষণ, তা দেখে তাকে যেন জানাই।

ওরা, মানে ফেলুদা-তোপ্‌সে-জটায়ু যে-পথে সোনার কেল্লা দেখতে জয়সলমীর গিয়েছিলেন, আমি তার উল্টো পথে গেলাম। অর্থাৎ, বিকানীর থেকে মরুর বুক চিরে, বাসে। বিকানীর যাবার কারণ উটের ফার্ম দেখা। আসলে ভারতবর্ষ, আরব এবং অন্য অঞ্চলের উটের তফাৎ অবশ্যই আছে। যেমন, বর্মা সিংহল এবং ভারতের ময়ূরের গলার নীল-সবুজ রঙের হেরফের রয়েছে।

জয়সলমীর গিয়ে অবাক হলাম। মনে হল, বিদেশী ভ্রমণকারীদের জন্য মরুশহর নতুন করে গড়ে উঠেছে। তোপ্‌সে যেমনটা বলেছিল, তেমনটা আর নেই। অনেক সুখ-সুবিধে হয়েছে, হচ্ছে। কিন্তু মরু-প্রকৃতি বিদায় নিচ্ছে। যদিও রাতের আলোয় অসংখ্য পোকার দেখা পেয়ে, আমার নতুন কাজের ইশারা পেলাম।

ফেলুদার সঙ্গে দেখা হবে প্রথম এই উত্তেজনায় আমি টানটান হয়েছিলাম। জয়সলমীর থেকে হাওড়া এসেই শান্তিনিকেতনের ট্রেন ধরলাম। সেখানে পৌঁছে ট্যুরিস্ট লজে খোঁজ নিয়ে শুনলাম, দু'জন বিদেশীর সঙ্গে, ফেলুদা আর তার দুই সঙ্গী বক্রেশ্বর গিয়েছে। তার সঙ্গী দু'জন কে কে, চিনতে অসুবিধা হল না, কিন্তু বিদেশীরা কারা বা কেন, বুঝলাম না। দেরি না করে আমিও বক্রেশ্বর চলে গেলাম। বাস থেকে নেমে, উষ্ণ প্রস্রবণের ঠিক উলটো দিকের পথ ধরে বক্রেশ্বরের ট্যুরিস্ট লজে এসে হতাশ হলাম। ওরা সেই সকালে বেরিয়েছে। হয়তো কেন্দুশিল্প যাবে। ফিরতে দেরি হবে। তোপ্‌সের কথা মনে পড়ল, সে লিখেছিল, ফেলুদা বলে, 'জীবনটাই জিয়োমেট্রি'।

আমার মনে হল, আমি সৌরজগতের জিয়োমেট্রির ফাঁদ বা আকর্ষণে বাঁধা পড়েছি। যে তলে ওরা ঘুরছে, আমার তল তা থেকে আলাদা বলে, কিছুতেই ছুঁতে পারছি না। তোপ্‌সে যে বলেছিল, ফেলুদা একটা মেনি-পয়েন্টেড স্টার বা জ্যোতিষ্ক, আর সে সেই জ্যোতিষ্কের স্যাটিলাইট, এ-কথাটা খুব খাঁটি বলে মনে হল।

আমি এখন কী করি! আর-একটা স্যাটিলাইট্ হয়ে ঘুরতে থাকব, নাকি রকেটে চেপে অ্যাসট্রোনট্ হয়ে 'ফেলুদা জ্যোতিষ্ক'কে পর্যবেক্ষণ করব! ভেবে ঠিক করতে না-পেরে, মহাজ্ঞানী যে পথে গিয়েছে, সে পথ ধরলাম।

তোপ্‌সের ইচ্ছে

অনিতা অগ্নিহোত্রী

আমি প্রথম 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' পড়ি ১৯৬৫-তে যখন আমি ক্লাস ফোর-এর মেয়ে। কীভাবে যে তিরিশটা বছর পেরিয়ে এসেছি, এতদিন খেয়াল হয়নি। এই এক্ষুণি মনে পড়ল। ফেলুদার, জটায়ুর বা তোপ্‌সের যদি বয়স না বেড়ে থাকে, আমার বয়সই বা কেন বাড়বে? 'শেষটায় বুড়ো হয়ে মরি আর কি?" তখনও যেভাবে 'সন্দেশ'টা দু'হাত দিয়ে নাকের কাছে এনে কাগজের গন্ধ শুঁকতাম, ঠিক এক্ষুণিই 'ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু' বইটার ঘ্রাণ সেই ভাবেই নিলাম। তার মানে বদলাইনি। যারা খুব কাছাকাছি থাকে, মাঝে মাঝে একটু দূরে তাদের রেখে, ঘুরে ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে না?

আজকে সেই রকম একটা ইচ্ছে হচ্ছে। অক্ষর পরিচয়ের আজে মা যখন খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে বই থেকে পড়ে শোনাতো, আমি মায়ের আওয়াজ শুনতাম, মিষ্টি সুরেলা গলা, আর কিল্‌বিলে অক্ষরগুলোকে ঐ শব্দের সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে একটা ছবি তৈরি করতাম। সেই বইগুলো আমার খুব কাছের মানুষের মতন হয়ে গেছে। কারণ তারা তো আর শুধু মলাটে বাঁধানো অক্ষরের রেলগাড়ি নয়, ছোটবেলার দিনগুলোর উত্তাপ, রোদ, লেপের নরম ছোঁওয়া—সব কিছু মিলে-মিশে গেছে তাদের মধ্যে। কলকাতা থেকে বেশ দূরে বসে, গাছপালার বৃষ্টিভেজা দুলুনি দেখতে দেখতে, আমি যখন দুটো ছটফটে ছেলে-মেয়েকে 'এক ডজন গপ্‌পো' থেকে পড়ে শোনাই — অন্য কয়েকটা ভাষা শিখে গেলেও যাদের সবে বাংলায় অক্ষর পরিচয় হয়েছে, তখন মনে হয়, আজ থেকে অনেক বছর পর এই বইটি তাদের কত ঘনিষ্ঠ প্রিয় বন্ধুর মতন গা ঘেঁষে থাকবে! আসলে 'সন্দেশ'-এ লিখে যাদের হাতেখড়ি, সত্যজিৎ রায়ের লেখা, আঁকা এমনকি গলার স্বর, তাকানোর ভঙ্গি তাদের রক্তের মধ্যে ছোট্টবেলা থেকে মিশে গেছে নিজেদের অজান্তে। ওটা যেন আমাদের সবার একটা কমন বাড়ি ছিল, আর কলকাতা এবং তামাম পশ্চিমবঙ্গের নানান জায়গায় থেকে আমরা সেই বাড়ির বাসিন্দা হয়ে গেছিলাম। এই ভাবেই ফেলুদা আমাদের খুড়তুতো ভাই হয়ে গেছিল। কিংবা পাশের বাড়ির ছেলে। আজ একটু দূরে দাঁড়িয়ে ঐ মিলে মিশে যাবার ব্যাপারটা দেখে নিতে ইচ্ছে করে।

আজ কিন্তু তোপ্‌সের কথা খুব মনে হচ্ছে। কেন বলো দেখি? লিখতে ভালো লাগে বলে? এই তিরিশ বছর ধরে যে ছেলেটা অগুন্তি ঝরঝরে ফেলুদার গল্প লিখে লিখে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে, তার ইচ্ছের কথা জানতে মন চাইবে না! জামিয়ে লেখা গল্প, গল্পের মধ্যে ছবি তোলা। সেই যে কবে 'তপেশরঞ্জন'কে তোপ্‌সে বানিয়ে নিয়েছে ফেলুদা, তোপ্‌সে আর নিজের সাবেকী নাম ফিরে পাওয়ার জন্য ট্যাঁ-ফোঁ করেনি! আসলে ওর মধ্যে একটা এমন সহজ, হাসিখুশি, সব ঝুটঝামেলায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়া সাহসী ছেলে আছে, যাকে দারুণ ভালো লেগে যায়। অথচ সেই ছেলেটা ভিড় ঠেলেঠুলে সামনে এগিয়ে এসে, ক্যামেরার সামনে কক্ষণো দাঁড়াবে না।

ছোটোবেলায় অতটা বুঝতাম না, আজ বুঝি, তোপ্‌সের মধ্যে আছে দারুণ সংযম আর আশ্চর্য টীম স্পিরিট। ভালো খেলোয়াড়ের দুই প্রধান গুণ। অমন দুই ব্যক্তিত্ব দু'পাশে—আকাশ ছোঁয়া ফেলুদা আর রঙীন, দারুণ পপুলার জটায়ু, তাতে তোপ্‌সের আত্মবিশ্বাস একচুল কমেনি, আবার আগ বাড়িয়ে সমাধানের খোঁজে কোনো বেফাঁস কাজও করেনি ও। যা কিনা কৌতূহলী,

জীবনের প্রথম রহস্যের ঘটনায়,
দার্জিলিং-এর রাস্তায় তোপ্‌সে।
তখন ওর বয়স তেরো।

লম্বা নাক, ওর বয়সের অন্য কোনো ছেলে বা মেয়ে করে ফেলতে পারত।

ন্যারেটিভে তোপ্‌সের হাত একেবারে পাকা, আর ওর টুক্ করে এক্‌ঝলক দেখে নিয়ে দ্রুত স্কেচ করে ফেলার ক্ষমতা দারুণ। কয়েকটা উদাহরণ না দিয়ে থাকতে পারছি না।

(১) পেস্টনজী আর ফেলুদার কথাবার্তা ('নেপোলিয়নের চিঠি')

'সেণ্ট হেলেনায় তার শেষ নির্বাসনের কথা জান ত?'

'তা জানি।'

'কোন্ সালে সেটা হয়েছিল মনে আছে?'

'১৮১৫।'

ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে বুঝলাম তিনি ইম্‌প্রেস্‌ড্‌ হয়েছেন।

(২) ফেলুদার সঙ্গে পাখির অরিজিন্যাল মালিক হাল ফ্যাশানের তরুণ ঃ (ঐ একই গল্প)

'ইয়ে, বিজ্ঞাপন দেখে বুঝতে পারিনি এটা আপনার ঝাড়ি।'

'সেটা না বোঝারই কথা।'

'আপনাকে মীট করে খুব ইয়ে হলাম।'

(৩) রবিবার লোডশেডিং নেই বলে আমাদের পাখাটা খুব দাপটের সঙ্গে ঘুরছে। ('এবার কাণ্ড কেদারনাথে')

(৪) লালমোহনবাবু তাঁর অ্যালার্ম ক্লকের চাবিটায় একটা মোচড় দিয়ে চোখে একটা হিংস্র উন্মাদ ভাব এনে বললেন, পোপোক্যাটাপেটাপেটোপুলটিশ।'

(৫) রানওয়ে দিয়ে যখন প্লেন কান-ফাটানো শব্দ করে ছুটে চলেছে, লালমোহনবাবুর চোখ তখন বন্ধ। ঠোঁটটা একবার নড়ে উঠল, আর বুঝলাম যে উনি বললেন, 'দুগ্গা দুগ্গা।'

('লণ্ডনে ফেলুদা')

এমন আরও কত অজস্র ছবির টুকরো। এগুলোর এইজন্যে উল্লেখ করলাম, আমি লক্ষ করেছি, ন্যারেশন বা বর্ণনার মধ্যে তোপ্‌সের স্কোপ কিন্তু বেশ কম। ফেলুদার কথা, জটায়ুর কথাবার্তা, অন্যদের সঙ্গে কথোপথন ও নিছক পটভূমি অথবা সিচুয়েশনের বর্ণনা —এর ফাঁকে অল্প স্বল্প ঝলসে ওঠা ছাড়া ওর বিশেষ সুযোগ নেই। কিন্তু ওরই মধ্য তোপ্‌সে খুব সপ্রতিভ ভঙ্গীতে নিজের হাতের একটা ছাপ রেখে যায়। এটা ওর বয়সের পক্ষে কম কথা নয়!

আমার যেটা খুব ভালো লাগে সেটা হচ্ছে, যখনই টান টান উত্তেজনা একটু শান্ত হয়ে আসে, গল্পের

আরও বড়ও হয়েও তোপ্‌সে নিজেকে কখনো সামনে ঠেলে দেয় না। ওই যে, সবার পিছনে দঁাড়িয়ে তোপ্‌সে হাসছে।

মাঝখানে অথবা শেষে, তোপ্‌সে একটুখানি প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে নেয়। লেখার কাগজের ব্যাকগ্রাউণ্ডে যেন হাল্‌কা জলরঙের ছবি। এটাও ওর একটা দুর্দান্ত স্টাইলে : 'নেপোলিয়নের চিঠি'তে ইঁটের পাঁজায় মাঝরাতে দাঁড়ানোর সময়, শব্দ — মানে ঝিঁঝি, ট্রেন, সাইকেল রিক্সা, কুকুর আর তার সঙ্গে অন্ধকারের সুন্দর ব্লেণ্ড হয়ে যাওয়া।

মন্দাকিনীর ওপর তক্তা ফেলা সেতু পেরোতে গিয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গের গোলাপী আভা লক্ষ করা — গুহার গায়ে রোদ, নাটকের মতন সন্ন্যাসী বেরিয়ে এলেন গুহা থেকে। ('এবার কাণ্ড কেদারনাথে') 'তাঁর দৃষ্টি সোজা পুব দিকে। যেন নতুন ওঠা সূর্যকে স্বাগত জানাচ্ছেন।'

'গোলাপী মুক্তা রহস্য'তে খুব অল্প কয়েক মুহূর্তে, কয়েক আঁচড়ে কাশীর থমথমে রাত, টিমটিমে গলির আলো, চাপা টেনশান, শেষ-করা চারমিনার পায়ের তলায় ফেলে চাপ দেওয়া।...

আর 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'তে একেবারে শেষে : 'চা শেষ করে যখন শহরে ফেরার তোড়জোড় চলছে, সূর্যটা পাহাড়ের পিছনে নেমে যাওয়ায় হঠাৎ ঠাণ্ডা বেড়ে মাঝে মাঝে বেশ কাঁপুনি লাগিয়ে দিচ্ছে, তখন দেখি পুলকবাবু আমাদের দিকে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসছেন।'

এই কাঁপুনিটা কিন্তু শেষ লাইনের শিহরণটাই, অন্যভাবে।

'নকলটাই আসল ভাই'—একগাল হেসে বললেন লালমোহনবাবু, 'বানান হবে জে এ টি এ ওয়াই ইউ।'

আমি ছোটবেলায় খুব স্কুলকাতুরে ছিলাম। একদিন স্কুলে কোনো কারণে না যেতে পারলে আমার পৃথিবী ওলট পালট! তাই বোধহয় প্রথম দিকে দু'একবার ভেবেছি, তোপ্‌সের স্কুলের কী হবে, হাফ ইয়ারলি, অ্যানুয়াল-এর কী হবে; এত যে টই-টই করে ঘুরছে পড়া মেক-অ্যাপ করবে কী করে? ক্লাস নাইন-টেনে পড়ার সময় এই চিন্তাটা আর মনে আসত না।

মাঝখানের এই এতগুলো বছর তোপ্‌সে তার চেয়ে একটু বড় আর বেশ বড় এই দুই মানুষের সঙ্গী হয়ে কাটিয়ে দিল। ওর মুখে কখনো নিজের বয়সী স্কুলের বা পাড়ার বন্ধুদের কথা শুনলাম না তো! এই জায়গায় আমার একটু খট্‌কা লেগেই থাকে।

গোড়ায় তোপ্‌সের সংযম কিংবা টীম ওয়ার্কের কথা বলছিলাম। আমি একবারই মাত্র ওকে গণ্ডী পেরোতে দেখেছি, 'গোলাপী মুক্তা রহস্যে'— লালমোহনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে আসল মুক্তোটা যখন সরিয়ে রাখল। এই গল্পে ফেলুদা আগাগোড়াই নাস্তানাবুদ, ঘটনাচক্রে। শেষটায় ফেলুদাকে বলতে শোনা গেছে, 'আপনাদের পক্ষে এতটা মাথা খাটানো সম্ভব সেটা ভাবতে পারিনি। আসলে আপনারা যে ফেলু মিত্তিরের এত কাছে থাকেন ভুলে গিয়েছিলাম।'

ফেলু মিত্তিরের এই ভুলে যাওয়াটাই আসলে তোপ্‌সের নিঃশব্দ মনে করানো। ওর বুদ্ধি কখনো নিজের ঢাক পেটায় না। তোপ্‌সের ইচ্ছে কী? সে কী হতে চায়? গল্পের পর গল্প, ঘটনার পর ঘটনা পেরিয়ে, নানা দেশ-ঘাট ঘুরে তার কি ইচ্ছে করে ফেলুদার মতো কিছু হয়ে উঠতে? তোপ্‌সে তা কাউকেই জানতে দিতে চায় না।

অনেকে ফেলুদার মধ্যেই সত্যজিৎ রায়কে দেখেছেন। ক্ষুরধার বুদ্ধি, হাইট, উইট, দেশ-বিদেশে ঘোরা। প্রণবেশ চক্রবর্তীর একটি নতুন বইতে ('টুকলো গোয়েন্দা') দেখছিলাম, উনি লিখছেন, সত্যজিৎ রায় যেমন শুধু স্টুডিওতে বসে নকল ছবি আঁকেননি, যেখানে যেখানে যেমন, জীবন ও প্রকৃতির টানে সেখানেই ছুটে গেছেন, ফেলুদাও তাই। সত্যজিতের চোখ দিয়ে আমরা একই সঙ্গে ইতিহাস ও ভূগোল দেখেছি, ফেলুদার সঙ্গে বেরিয়েও তাই। শেষে লিখছেন, 'হলফ করে বলতে পারি, সত্যজিৎ রায়ের তুলনায় ফেলুদা কোনও দিক থেকেই কম নয়।'

তাই কি? আমার তো কেন জানি না, উল্টোটাই মনে হয়। সত্যজিৎ রায় তো ঘটনার ন্যারেটের হিসেবে ফেলুদাকে রাখতে পারতেন, অথবা জটায়ুকে। তাতে কিন্তু স্টাইলটা ওঁর নিজের স্বভাবসিদ্ধ হতো না। সেই জন্য গল্পগুলো তোপ্‌সের লেখা আর বলা। 'সেপ্টোপাসের খিদে', 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' 'অনাথবাবুর ভয়' অথবা 'দুই ম্যাজিশিয়ান'-এর ঝক্‌ঝকে, পল-কাটা

ছোট গল্পকার সত্যজিৎ রায় — যাঁর গল্পে এক ছটাক বাড়তি মেদ কখনো খুঁজে পাওয়া যায় না, তোপ্‌সের মধ্যে সত্যজিৎ রায় সেই নিজেকেই রেখেছেন, নিজের লেখক-সত্ত্বাকে। আর সেই সঙ্গে হয়তো চিরন্তন কৈশোরের একখানি পোর্ট্রেটকে — চারিদিকের চক্রান্ত, ঘোরপ্যাঁচ, বিশ্বাসঘাত ইত্যাদির মধ্যেও যে বড় হয় না, বদলায় না।

গোয়েন্দা-গল্পের নায়ক ফেলুদা। জটায়ু সেই গল্পের চালচিত্তিরে রং ধরান। খুদে পাঠকদের কিন্তু টেনে রেখেছে ঐ তপেশরঞ্জনই, ওর মধ্যে নিজেদের ছায়া দেখার জন্য ছোটরা সর্বদা উঁকিঝুঁকি মারছেই। ফেলুদা তো সবাই হতে পারবে না, কিন্তু ফেলুদার সঙ্গী হতে কে না চায়? এই রকম একটা বয়সে! তোপ্‌সে হলো হাজার হাজার খুদে পাঠকদের সেই ইচ্ছেটা!

এই ইচ্ছে সব-দেশের :ঘর পেরিয়ে চিরজীবি হোক!

নানা বিপদের ঘটনায় তোপ্‌সের মধ্যে একটা সাহসী ছেলেকে আমরা পাই। যেমন, প্রিটোরিয়া স্ট্রিটে নির্জন রাতে একবার দারুণ বিপদে পড়েছিল তোপ্‌সে

আসল আলো নকল আলো

সৌমেন্দু রায়

ফেলুদার কোনও গল্প নিয়ে ছবি হলে আমিই যে তার সিনেমাটোগ্রাফার হব, সেটা স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছিলাম। ফেলুদা যে-সময় থেকে গোয়েন্দা হিসেবে বিখ্যাত হতে শুরু করেছে, আমিই তখন সত্যজিৎ রায়ের সব ছবিতে নিয়মিত ক্যামেরার কাজ করি। (এই সুযোগে তোমাদের বলে রাখি, মুভি ক্যামেরায় সিনেমার জন্য যাঁরা ফোটোগ্রাফি করেন, তাঁদেরই বলা হয় সিনেমাটোগ্রাফার।)

মনে আছে, 'সন্দেশ' পত্রিকায় মাসে মাসে কী আগ্রহ নিয়ে পড়তাম 'ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি' কিম্বা 'বাদশাহী আংটি'র মতো দুর্দান্ত উপন্যাস। দেখতে দেখতে ফেলুদা হয়ে উঠল বাংলা কিশোর-সাহিত্যের চিরকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র। চিত্রশিল্পী ও চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় লেখক হিসেবেও দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তাই নিজেরই কলমে সৃষ্টি করা অমন চরিত্রকে সিনেমায় জীবন্ত করে তোলার দাবি তাঁর কাছে নিয়মিত আসতে লাগল।

খুব বেশি দিন এই দাবি উপেক্ষা করে থাকার ইচ্ছে যে তাঁর ছিল না, সেটা বুঝতে পারলাম আমার অতি প্রিয় উপন্যাস 'সোনার কেল্লা'র চিত্রনাট্য হাতে পেয়ে। শুটিং-এর অনেক আগেই আমাকে চিত্রনাট্য দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। সেটা ১৯৭৩। চিত্রনাট্য খুঁটিয়ে পড়ে বুঝতে পারলাম, ছবিতে আউটডোর শুটিং-এর ঘটনা প্রচুর থাকবে। তার মানে কলকাতা ছেড়ে আমাদের ছবি-তৈরির দলকে হিল্লি-দিল্লি ঘুরে বেড়াতে হবে। আবার দিল্লি ছাড়িয়ে চলে যেতে হবে সুদূর পশ্চিম রাজস্থানের মরু-শহর জয়সলমির পর্যন্ত। (অনেক সময় গল্প-উপন্যাসের কাঠামোটা সিনেমায় বেমালুম পাল্টে যায়, সেটা জানো তো?)

চিত্রনাট্যে ছিল ছ'বছরের ছোট্ট ছেলে মুকুল সোনার কেল্লা নামে একটা আশ্চর্য কেল্লা খুঁজে বেড়াচ্ছে! বেশ কয়েকটা কেল্লা দেখা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, সোনার কেল্লা খুঁজে পাচ্ছে না। মুকুলের এই খুঁজে বেড়ানো বোঝাবার জন্য, ছবিতে বেশ ক'টা কেল্লা দেখানো দরকার ছিল। না-হলে ঠিক বোঝা যেত না, মুকুল একের পর এক কেল্লা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর পর পর বাতিলও করে চলেছে। মুকুলের এই খোঁজাটা বোঝানোর জন্য, শুটিং-এর অনেক আগেই আমরা নিজেরাও দিল্লি থেকে জয়সলমির পর্যন্ত অনেকগুলো কেল্লা খুঁজে বেড়িয়েছিলাম। যাতে সিনেমার কোন্ ঘটনার বাঁকে কোন্ কেল্লাটা মুকুল বাতিল করবে — সেটা সম্পর্কে শুটিং-এর অনেক আগে থেকেই আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকে। এইভাবে পরিচালকের সঙ্গে অনেক ঘোরাঘুরি করে, আমরা পাঁচটা কেল্লাকে বেছে নিলাম, যেগুলোর প্রত্যেকটার সামনেই মুকুল এসে দাঁড়াবে, আর শেষ পর্যন্ত পাঁচ নম্বর কেল্লাটাকেই মেনে নেবে সোনার কেল্লা হিসেবে।

লোকেশন দেখতে গিয়ে আমরা বেছে নিয়েছিলাম পাঁচটা আলাদা রঙের কেল্লাকে। তার মধ্যে দিল্লির লালকেল্লার রঙ লাল, জয়পুরের নাহাড়গড় কেল্লার রঙে কেমন যেন শ্যাওলাধরা মাটি-মাটি ভাব। যোধপুরের কেল্লার রঙ লালচে, বিকানিরের দুর্গে সাদা রঙটাই প্রধান। আর জয়সলমিরের কেল্লা কাঁচা সোনার মতো হলুদ! তাই তো মুকুল সেটার নাম দিয়েছিল সোনার কেল্লা। রঙের তফাত থাকার ফলে, একটা কেল্লার সঙ্গে অন্য কেল্লা গুলিয়ে যায়নি। ছবিতে যে একের পর এক

নতুন কেল্লা আসছে, সেটা বুঝতেও দর্শকদের কোনও অসুবিধে হয়নি।

এত দূরে এত বেশি বেড়ানোর ছবি — সত্যজিৎ রায় প্রায় করেননি বললেই চলে, এক 'হীরক রাজার দেশে' ছাড়া। বেশি দূরে দূরে যাওয়ার ফলেই নানারকম মজার ঘটনা ঘটত 'সোনার কেল্লা' ছবির শুটিংয়ে। একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে 'সোনার কেল্লা'র মতো ছবির শুটিং করতে কেমন কষ্ট হয়, আর কী ধরনের আনন্দ হয়।

একবার মনে আছে, জয়পুর থেকে সবাই মিলে ট্রেনে করে পশ্চিম দিকে চলেছি, অনেক দূরের কোনও মরু-শহরে। পুরো ফিল্ম-ইউনিট নিয়ে এ-শহর থেকে ও-শহরে যাওয়ার সময় আমরা সাধারণত ট্রেনের একটা আস্ত কামরা ভাড়া করে নিতাম। তাতেই পরিচালক থেকে নানা চরিত্রের অভিনেতা পর্যন্ত একসঙ্গে চড়ে যাতায়াত করতেন। এইভাবেই আমরা মরুভূমির মধ্যে দিয়ে চলেছি, যেতে যেতে আমাদের সবারই খাবার ফুরিয়ে গেল! কিছুই করার নেই, গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে তখনও অনেক দেরি।

অথচ একটা জিনিস ভাবলেই আমাদের একটু দুঃখ হচ্ছিল! আমাদের ঠিক পাশেই একটা আস্ত কামরা ভাড়া করে চলেছে এক বিয়ে-বাড়ির দল! তারা হৈচৈ করতে করতে চলেছে, আর প্রচুর খাওয়া-দাওয়া করছে। কোনও স্টেশনে ট্রেন থামলেই, আমরা পাশের কামরা থেকেও সবই টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু কিছুই করার নেই বুঝতে পেরে, চুপ করে বসেছিলাম। পাশের সেই বিয়ের উৎসবে তো আর আমাদের নেমন্তন্ন হয়নি যে ওরা আমাদের খাবার পাঠিয়ে দেবে! কিন্তু এমন একজন লোক ছিলেন আমাদের সঙ্গে, যিনি অত সহজে দমে যাওয়ার পাত্র নন। তিনি হলেন কামু মুখোপাধ্যায়। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, 'সোনার কেল্লা' ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন দুর্ধর্ষ ভিলেন মন্দার বোসের ভূমিকায়।

একটা ছোট স্টেশনে ট্রেন থামতেই, পাশের কামরার সেই বরযাত্রীর দল হৈচৈ বাধিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে এল, অমনি কামুবাবুও আমাদের কামরা ছেড়ে সোজা গিয়ে হাজির হলেন পাশের কামরায়! আমাদের বেশ লজ্জাই করছিল। নেমন্তন্ন ছাড়া কি বরযাত্রীর দলে ঢুকে পড়া উচিত? কামুবাবু ওদের মধ্যে গিয়ে কী করলেন জানি না, একটু পরেই তিনি হাজির হলেন হাতভর্তি সেউভাজা নিয়ে। তারপর আমাদের সবার মধ্যে সেগুলো বিলি করে দিলেন।

আমাদের শুটিং-এর দলে বেশ কয়েকজন নামী লোক ছিলেন। এভাবে জলখাবার জোগাড় করার কথা তাঁরা ভাবতেই পারতেন না, পাছে তাঁদের মর্যাদার কোনও হানি ঘটে। কিন্তু কামুবাবু এ-সব কেয়ার করতেন না। তাই আমাদের জলখাবারও জুটে গেল, কিছুটা মজার খোরাকও পেলাম।

খাওয়া-দাওয়ার কথা ছেড়ে, এবার একটু শুটিং-এর গল্পে আসা যাক। এখানে মাত্র দুটো ঘটনা বলব, যাতে বোঝা যাবে 'সোনার কেল্লা'র শুটিং-এর কাজটা কত কঠিন ছিল। যতই আনন্দের মধ্যে দিয়ে

কাজটা আমরা করি-না-কেন, টেক্‌নিক্যাল দিক থেকে ছবিটা যাতে নিখুঁত হয়, সে-কথাটা আমাদের সবসময়ই মাথায় রাখতে হত।

প্রথম উদাহরণ, একটা বিকেলের দৃশ্য তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, মরুভূমির মাঝখানে ফেলুদার গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে গিয়েছিল। তাই সেখান থেকে উটের পিঠে চড়ে ওরা পৌঁছেছিল রামদেওরা নামে একটা স্টেশনে। ছবির সংলাপে স্টেশনটার নাম রামদেওরা, আসলে শুটিং হয়েছিল লাঠি নামে একটা নির্জন স্টেশনে। অনেকটা পথ উটে চড়ে ফেলুদা, তোপ্‌সে আর লালমোহনবাবু যখন এসে ওই নির্জন স্টেশনে নামলেন, তখন সন্ধ্যে নেমে গেছে। পশ্চিমদিকে মরুভূমির বালির ওপর আশ্চর্য লালচে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। এতটা পথ উটের পিঠে চড়ে লালমোহনবাবুর পিঠ কিছুটা আড়ষ্ট আর অসাড় হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি স্টেশনের খালি প্ল্যাটফর্মে হাত-পা ছুঁড়ে, কিছুটা ব্যায়াম করে নিলেন।

ছবিতে দৃশ্যটা এরকমই ছিল। কিন্তু সন্ধ্যেবেলার আলো এত তাড়াতাড়ি মুছে আসে, সেইটুকু সময়ের মধ্যে সিনেমার ছবি তোলা ভারি মুশকিল। ক্যামেরাম্যান যদি ক্যামেরা চালাতে গিয়ে সামান্য ভুলও করে ফেলেন, কিংবা অভিনেতা যদি তাঁর সংলাপের মধ্যে মাত্র একটা শব্দও ভুলে যান, তাহলেই সব পণ্ড! সমস্ত ভুল শুধরে নিয়ে আবার শুটিং শুরু করতে-না-করতেই, চারদিক অন্ধকার হয়ে যাবে।

তাই আমরা কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে, লালমোহনবাবুর এই ব্যায়ামের দৃশ্যটা তোলার জন্য বিকেলের অনেক আগেই লাঠি স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিলাম। তারপর দুপুর ফুরোতে-না-ফুরোতেই প্ল্যাটফর্মের ওপর লম্বা ট্রলি পাতা হয়ে গেল। ট্রলি হল এক ধরনের রেল-লাইন, অবিশ্যি রেল-লাইনের চেয়ে সিনেমার ট্রলি অনেক কম চওড়া হয়। এই ট্রলির ওপরেই চাকা লাগনো একটা কাঠের পাটাতন রাখা হয়, আর পাটাতনের ওপরেই বসানো হয় ক্যামেরা।
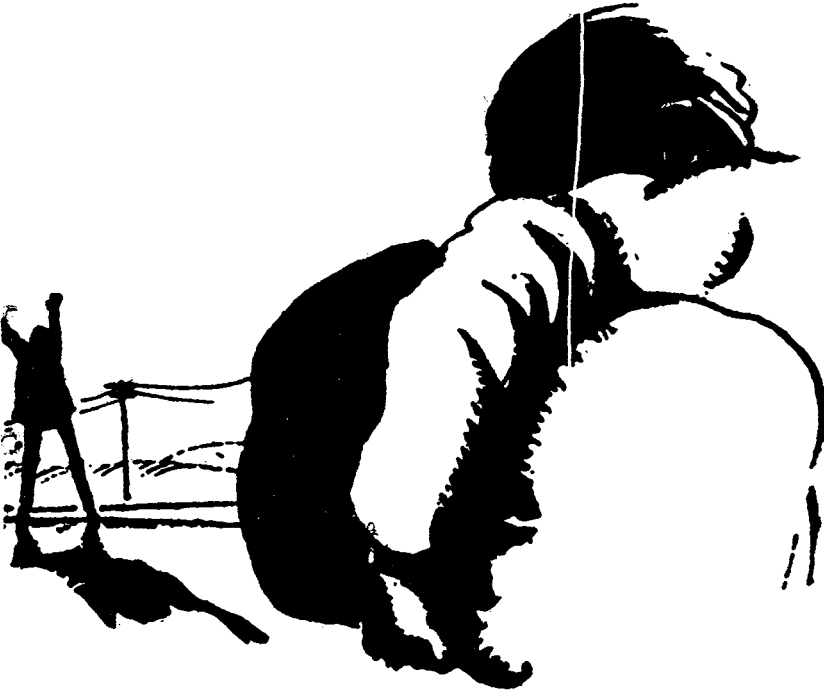
নির্জন মরুভূমিতে দৌড়ে ট্রেন থামানোর চেষ্টা করছে ফেলুদারা। ঘটনাটা সিনেমায় ছিল না।

পাটাতনটা রেলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এগোয়. ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরাও এগোতে থাকে সাধারণত সিনেমার কোনো চরিত্র যখন হেঁটে এগোয়, তখন তাকে পাশাপাশি অনুসরণ করার জন্যই, ট্রলির ওপর চেপে ক্যামেরা এগোতে থাকে তার সঙ্গে সঙ্গে।

লালমোহনবাবুর ব্যায়ামের দৃশ্যটা তোলার জন্য এরকম ট্রলি শট্-এরই ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। কারণ, ব্যায়াম করতে করতে লালমোহনবাবু প্লাটফর্মের ওপর দিয়ে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এই জাতীয় শট্-এর আয়োজন করতে বেশ সময় লাগে। অভিনেতা ঠিক কোথা থেকে হেঁটে কতটা এগোবেন, সেটা আগে থেকেই নিখুঁত হিসেব করে, মেঝেতে দাগ দিয়ে নিতে হয়। তারপর সেই দাগ মেনেই ট্রলি পাতার কাজটা করতে হয়।

এই ট্রলি পাতার কাজে যাতে কোনও ভুল না-থাকে, সেইজন্যই আমরা দুপুর থাকতেই পৌঁছে গিয়েছিলাম লাঠি স্টেশনে। সূর্য ডোবার অনেক আগেই ওই ট্রলির সঙ্গে লালমোহনবাবুর হাঁটার রিহার্সাল হয়ে গেল। সূর্যাস্তের পরে আমরা আসল শট্টা নিলাম। রিহার্সালের সময় লালমোহনবাবুর মুখ-চোখ বেশ ভালই দেখা গিয়েছিল, তখনও যে মরুভূমিতে বেশ ভালোরকমই রোদ আছে। কিন্তু ওই দৃশ্যের ছবি যখন ক্যামেরা দিয়ে তোলা হল, তখন কিন্তু লালমোহনবাবুর মুখ-চোখ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ছবিতে তিনি সূর্য-ডোবা চকচকে লাল আকাশের ব্যাকগ্রাউণ্ডে চলমান ছায়ামূর্তি!

পশ্চিম আকাশের গায়ে তখন প্রচুর আলো। কিন্তু লালমোহনবাবুর গায়ে সেই তুলনায় আলো অনেক কম। যে-কোনও ক্যামেরার ধর্মই হল — বেশি আলো আর কম আলোর ছবি একইসঙ্গে সমান ডিটেলে তোলা সম্ভব নয়। তাই আকাশের রঙটা ঠিকমতো বজায় রাখতে গিয়ে, ছবিতে লালমোহনবাবুর সারা শরীরটা ঘন কালো ছায়ামূর্তি হয়ে গেল!

তার ফলে অবিশ্যি একটা সুবিধেও হয়েছিল। জটায়ুর ঠোঁট বা চোখ দেখা যায়নি বলে, তাঁর ব্যায়ামের ভঙ্গির দিকে দর্শকরা অনেক বেশি মন দিতে পেরেছে। এখানে লালমোহনবাবুর মুখ-চোখ দেখা গেলে, দর্শকদের দৃষ্টির অনেকটাই কেড়ে নিত তাঁর চোখমুখের অদ্ভুত মজাদার হাবভাব। এই ঘটনা থেকেই আমরা বুঝতে পারছি, ঠিক সময়ের আলোয় শুটিং করার জন্য 'সোনার কেল্লা' ছবিতে আগে থেকেই কতটা সতর্ক ছিলেন ফেলুদার গল্পের লেখক, যিনি তখন তোমাদের 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদকমশাই।

এবার সকালের আলোয় শুটিং-এর একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। এই শুটিংটা হয়েছিল জয়সলমির দুর্গের মধ্যে। মুকুল এই দুর্গের নাম দিয়েছিল সোনার কেল্লা। ছবির শেষ দৃশ্যে, মুকুল এই কেল্লার সরু গলিগুলোর মধ্যে দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেড়াচ্ছে। তাকে ধরার জন্য হন্তদন্ত হয়ে তাড়া করেছেন এই ছবির দুর্দান্ত ভিলেন নকল ডাঃ হাজরা, যাঁর আসল নাম অমিয়নাথ বর্মন। দৃশ্যটা ছিল বেশ জটিল। গোটা দৃশ্যটাকে পঞ্চান্নটা টুকরো টুকরো ছবিতে ভাঙা হয়েছিল। মনে রেখো, এই এক-একটা টুকরোকেই শট্ বলে।

দৃশ্যটা তোলার আগেই আমরা একটা মুশকিলে পড়লাম। যেদিন সকালে এই দৃশ্যের শুটিং হবে, সেদিন বিকেলেই ট্রেন ধরে কলকাতার দিকে আমাদের রওনা হবার কথা। অথচ যে স্টেশন থেকে কলকাতার ট্রেন ধরতে হবে, সেখান থেকে ওই দুর্গটা অনেক দূর। তার মানে, সকালের মধ্যেই পুরো দৃশ্যটার ছবি তুলে স্টেশনের দিকে আমাদের রওনা হতে হবে। একটু ভুল হলেই মহা মুশকিল, আবার পরদিন সকালে ফিরে আসতে হবে শুটিং করার জন্য। তার ফলে সবার ট্রেনের টিকিট ক্যানসেল করতে হবে। লোক তো কম ছিল না আমাদের দলে, প্রায় একটা বরযাত্রী দলের মতো!

খুব সাহস করে আমরা শুটিং শুরু করে দিলাম। দেখতে দেখতে মাত্র ঘন্টা চারেকের মধ্যেই ওই পঞ্চান্নটা শট্ নিখুঁতভাবে ক্যামেরায় তোলা হয়ে গেল। কাজটা খুবই কঠিন ছিল সন্দেহ নেই, এই দৃশ্যে ছ' বছরের ছোট একটা ছেলেকে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়েছিল। তখনও তার পাকা অভিনেতা হয়ে ওঠার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এছাড়াও ওই দৃশ্যে একটা ময়ূরও ছিল। তাহলেই বোঝো, মাত্র চার ঘন্টার মধ্যে ওই দৃশ্যটা তুলে ফেলা ছিল কত কঠিন কাজ!

এখন বুঝতে পারি, শুধু তোমাদের খুশি করার জন্য ফেলুদাকে নিয়ে ছবি করতে গিয়ে, কতটা খাটতে হয়েছে তোমাদের মানিকদা, সত্যজিৎ রায়কে! তবে সকালের মধ্যেই গোটা দৃশ্যটা তুলে ফেলার জন্য একটা সুবিধেও হয়েছিল। সারা দৃশ্য জুড়ে আলোর উজ্জ্বলতা ছিল একই রকম। শুটিং বিকেল পর্যন্ত গড়ালে, আলোর ঝকঝকে ভাবটা এমনভাবে বজায় রাখা সম্ভব হত না।

'সোনার কেল্লা'য় আমরা যতদূর সম্ভব আসল আলোকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলাম। সকালের ঘটনায় সকালের আলো, আবার সন্ধ্যের ঘটনায় সন্ধ্যেবেলার আলো।

যে-দৃশ্যে মাত্র একটা ছোট্ট টর্চের আলোয় সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, সেই গোটা দৃশ্যটাই তোলা হয়েছিল ওই একটা মাত্র টর্চের আলোতেই। সঙ্গে আলাদা কোনও আলো যোগ করা হয়নি। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, মুকুলকে সম্মোহন করার সময় নকল ডাঃ হাজরা একটা পেন্সিল-টর্চ মুকুলের চোখের সামনে দোলাচ্ছিল। ফলে এক টুকরো ছোট্ট আলো মুকুলের এ-চোখ থেকে ও-চোখে যাওয়া-আসা করছিল। সে-যুগে এমন দৃশ্য তুলতে গেলে, টর্চের বদলে অন্য বড় আলো ব্যবহার করার রেওয়াজ ছিল। সেকালের রঙিন ফিল্ম আজকের মতো এমন সংবেদনশীল ছিল না। এই শুটিং হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ২১-২২ বছর আগে। সে-সময়ে আমরা বেশ ঝুঁকি নিয়ে, ওই খুদে টর্চের আলোতেই সম্মোহনের গোটা দৃশ্যটাই তুলেছিলাম। তোমরা সবাই তো সিনেমাটা দেখেছ নিশ্চয়ই মনে আছে, ওই খুদে আলোতেও মুকুলের দুই চোখ আর ঠোঁট কেমন ঝকঝকে স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল!

ফেলুদাকে নিয়ে পরের ছবি 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ অবিশ্যি সবসময় আসল সময়ের আসল আলোটা ব্যবহার করার সুযোগ হয়নি। যেমন ধরা যাক, কাশীর ঘাটে বিকেলের দৃশ্যের কথা। ঘাটে বসে মছলিবাবা ভজন শুনছেন। তাঁকে ঘিরে ভিড় করে বসে আছে ভক্তরা। এমন সময় ফেলুদা হেঁটে এসে দাঁড়াল মছলিবাবাকে দেখার জন্য। এই দৃশ্যের অনেকটাই কিন্তু

কাশীর ঘাটের সিঁড়িতে শুয়ে আছেন মছলীবাবা। সিনেমায় এই ঘটনাটাও ছিল না।

কাশীর ঘাটে বিকেলের নরম আলোয় তোলা সম্ভব হয়নি। শুধু যে শট্‌গুলোয় আমরা দেখছি গঙ্গার দিকে দাঁড়িয়ে ফেলুদা তোপ্‌সে আর জটায়ু মছলিবাবাকে দেখছে, সেই শট্‌গুলো আসল কাশীর ঘাটে দাঁড়িয়ে বিকেলবেলা তোলা। তার একটা বড় কারণ, নদীর জল বা বিকেলের আকাশ তো আর স্টুডিওর মধ্যে তৈরি করা যায় না।

কিন্তু মছলিবাবা এবং তাঁর ভক্তরা বসে আছে ঘাটের দিকে। সেদিকে আকাশও নেই, জলও নেই। আছে শুধু ঘাটের মেঝে আর দেওয়াল। তাই সেদিকটা কলকাতার স্টুডিওর মধ্যে তৈরি করে নেওয়া হয়েছিল। ভক্তদের ওই জমাট ভিড় নিয়ে কাশীর আসল ঘাটে শুটিং করা সম্ভব ছিল না। শুটিং দেখতে উৎসুক জনতা তাহলে অনেক আগেই শুটিং ভেস্তে দিত!

কিন্তু মজার কথাটা হল, এই যে কলকাতার স্টুডিওর মধ্যে বিরাট কাশীর ঘাট তৈরি হল, তার ওপর তো বিকেলের নরম আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। এটা যে আসল ঘাট নয়, দর্শকরা সেটা বুঝে ফেললেই সব মাটি! তখন আমরা করলাম কী, এই কৃত্রিম কাশীর ঘাটের একপাশে বিরাট উঁচু করে লম্বা-চওড়া কাপড় টান টান করে টাঙিয়ে দিলাম। কাপড়টা ছিল খুব খরখরে মোটা ও দানাদার। সেই কাপড়ের দিকে তাক্ করে অনেকগুলো জোরালো আলো ফেলা হল। সেই আলো কাপড়ে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের তৈরি কৃত্রিম ঘাটের ওপর এসে পড়ল। কিন্তু যেহেতু খরখরে কাপড় থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে, তাই আলোটা হয়ে গেল মোলায়েম। সেই আলোকে মনে হল বিকেলের আকাশ থেকে নেমে আসা হলদেটে রোদ!

পরে ছবি দেখে কেউ কখনও বলেনি যে, কাশীর ঘাট স্টুডিওর মধ্যে তৈরি বলে বোঝা যাচ্ছে। এই অভিযোগ যখন কানে আসেনি, তখন ধরেই নিতে পারি কাশীর ঘাটের নকল আলোটা বেশ ভালোই হয়েছিল।

শুটিং-এর পর ক্যামেরায় তোলা শট্‌গুলো একটু-আধটু কাটাকুটি করতে হয়। যে-শট্ পরিচালকের তেমন পছন্দ হয়নি, সিনেমার এডিটর সেটা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে দেন। এই কাজটাকেই বলে সিনেমার সম্পাদনা। ফিল্মের এই ফেলে-দেওয়া টুকরোগুলো এডিটিং-রুমে স্তূপ হয়ে পড়ে থাকে। ছবি তৈরি পুরোপুরি শেষ হয়ে যাওয়ার পর, সেগুলো ওজন দরে বিক্রি করে দেওয়া হয়। সেই ফিল্ম গলিয়ে সামান্য রুপো পাওয়া যায়। বাকি অংশটা দিয়ে মেয়েদের জন্য প্লাস্টিকের চুড়িও তৈরি হয়। তবে সব দেশেই সব অব্যবহৃত শট্ বিক্রি হয়, তা কিন্তু নয়।

আমেরিকায় একটা নতুন ছবি তৈরি হয়েছে যার নাম 'আন্‌নোন চ্যাপলিন'। মানে সোজা কথায় 'অজানা চ্যাপলিন'। ছবিটা তৈরি হয়েছে এডিটিং-এর সময় চ্যাপলিনের ফেলে দেওয়া বাতিল শট্‌গুলো জুড়ে। 'আন্‌নোন চ্যাপলিন' দেখে এ-যুগের মানুষ সত্যিই আনন্দ পাচ্ছেন। চ্যাপলিন যেন নতুন রূপে আবার ফিরে এসেছেন আমাদের সামনে। কিন্তু এই কলকাতায় বসে এভাবে 'অজানা ফেলুদা' কিংবা 'অজানা সত্যজিৎ'—এরকম কোনও ছবি তৈরি করা যাবে না। ছবিতে না-জোড়া শট্‌গুলো বহুকাল আগেই যে গলিয়ে ফেলা হয়েছে! আর সেগুলো দিয়ে যে প্লাস্টিকের চুড়ি তৈরি হয়েছিল, তা-ও বোধহয় এখন আর একটাও নেই!

সোনার কেল্লার পিছনে সমাধিক্ষেত্রে ঢোকার মুখে ফেলুদা।

সন্দেশ ফেলুদা ফিল্ম-পোস্টার ১৯৭৮

ধ্বনিতে আলোতে কলকাতা
তিনশো বছরের কলকাতার ইতিহাস
কী জীবন্ত হয়ে উঠেছে ভিক্টোরিয়ার বাগানে,
খোলা আকাশের নীচে !
প্রদর্শনীর সময় (সোমবার বন্ধ)
১ অক্টোবর — ১৪ নভেম্বর
১৬ ফেব্রুয়ারি — ৩০ জুন
বাংলা সন্ধ্যে ৭.১৫, ইংরিজি রাত ৮.১৫
১৫ নভেম্বর — ১৫ ফেব্রুয়ারি
বাংলা সন্ধ্যে ৬.৪৫, ইংরিজি ৭.৪৫
প্রবেশ মূল্য
৫ টাকা, ১০ টাকা
ছবিতে দলিলে মডেলে কলকাতা
জোব চার্নক থেকে সত্যজিৎ রায়, তিনশো বছরের
কলকাতার শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ-জীবন বা উৎসবের
আশ্চর্য ইতিহাস ফুটে উঠেছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
'ক্যালকাটা গ্যালারি'তে। এখানে ইতিহাসের রোমাঞ্চ
অনুভব করা যায় ভিডিও আর ডিয়োরামার
টাইম মেশিনেও !
প্রদর্শনীর সময় (সোমবার বন্ধ)
সকাল ১০টা — সন্ধ্যে ৫টা
প্রবেশ মূল্য
বড়দের ২ টাকা, ছোটদের ১ টাকা
ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধ
কলকাতা ৭০০০৭১
ফোন ২৪৮ - ৫১৪২/০৯৫৩

ফেলুদার খোঁজে

হিরণ্ময় কার্লেকর

সেদিন সকালে উঠে চা খাচ্ছি এমন সময় ঠিক কানের পিছন থেকে আমার নামে একটা ডাক শুনলাম। গলাটা একটু কর্কশ — মানুষের আর কাকদের গলার মাঝামাঝি একটা কিছু। খানিকটা মানুষের, আর খানিকটা কাকের মতো। বুঝে ফেললাম, এটা শ্রদ্ধেয় যজ্ঞেশ্বর মিশমিশের গলা। তিনি মানুষের ভাষায় কথা বলতে গেলেই তাঁর গলাটা এইরকম হয়ে যায়।

চোখ ঘুরিয়ে ঠিক পিছন ফিরে তাকাতেই দেখলাম, যে জানলাটা এতক্ষণ আমার পিছনে ছিল, তার তাকে যজ্ঞেশ্বর কাকু (কাকরা নিজেদের 'বাবু' বলেন না, 'কাকু' বলেন) বসে আছেন। আমি নমস্কার করে উঠে দাঁড়ালাম। উনি অযথা ভনিতা না করে সরাসরি আদেশ করলেন, 'এই! তোমাদের ফেলুদার বাড়ির টেলিফোন নম্বরটা দাও তো তাড়াতাড়ি! আমার অত্যন্ত জরুরি দরকার।'

আমি হকচকিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ফেলুদা? কোন্ ফেলুদা?'

যজ্ঞেশ্বরকাকু আমার দিকে খানিকক্ষণ কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু ধমকের স্বরে বললেন, 'কোন্ ফেলুদা? জানো না!'

আমি আরও হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, 'না তো। কোন্ ফেলুদার বাড়ির টেলিফোন নম্বর চাইছেন আপনি?'

এবার যজ্ঞেশ্বরকাকু আমাকে প্রায় ভস্ম করে দিয়ে গর্জন করে বললেন, 'কোন্ ফেলুদা? তোমাদের হয়েছে কী? দেশের কি কোনও খবর তোমরা রাখ না? খালি তাকিয়ে থাক বিলেত-অ্যামেরিকার দিকে। আমি যদি শার্লক হোমস্-এর ফোন নম্বর চাইতাম, তাহলে তুমি তৎক্ষণাৎ সেটা দিয়ে দিতে।'

আমতা আমতা করে বললাম, 'শার্লক হোমসের সময়ে টেলিফোন ছিল না!'

এবার যজ্ঞেশ্বরকাকু একটু হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, 'তুমি ঠিক জানো টেলিফোন ছিল না?'

'আমি যতদূর জানি ছিল না। তবে আমার ভুল করার পাঁচ পারসেন্ট চান্স থেকে থাকতে পারে...'

আমি কথা শেষ করার আগেই যজ্ঞেশ্বরকাকু নিজেকে সামলে নিয়ে কড়া স্বরে বললেন, 'ছিল কি ছিল না সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে যে তুমি শার্লক হোমসের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর রাখ। কিন্তু তাঁরই মতো বড় একজন বাঙালি গোয়েন্দার নাম করলে হাবার মতো জিজ্ঞেস করো, কোন্ ফেলুদা? আমি যে ফেলুদার কথা বলছি, তাঁর ভালো নাম প্রদোষ মিটার। ভারত-বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেক্টিভ!'

আমি যজ্ঞেশ্বরকাকুকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখি। তিনি প্রয়াত, ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রবাদ-কাক কাক্কেশ্বর কুচকুচের আপন বড় জ্যাঠার ভায়রা ভাইয়ের মামার বড় নাতির ছোট ছেলে। আমাদের পাড়ার কাকরা তাঁকে ভীষণ মানেন। তিনি কাকদের, মানুষদের, ময়ূরদের, শেয়ালদের এবং অন্য কয়েক জাতির প্রাণীদের ভাষা জানেন। মানুষদের ভাষার মধ্যে ইংরেজি আর বাংলায় তাঁর সমান দখল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তাঁর কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলাম। বললাম, 'কী বলছেন আপনি? ফেলুদা তো সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্ট এক কাল্পনিক চরিত্র। তাঁর টেলিফোনই নেই তো টেলিফোন নম্বর পাব কী করে?'

যজ্ঞেশ্বরকাকু আরও চড়া গলায় বললেন, 'বটে! আমার সঙ্গে ফাজলামি হচ্ছে! ফেলুদা যদি কাল্পনিক চরিত্র হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর সম্বন্ধে এত সব লেখা হবে কেন? আর তাঁর সম্বন্ধে লেখা পড়তে পড়তে মাঝেমাঝেই দেখি তাঁর ফোন বাজার কথা!'

'আপনি আবার ফেলুদার কথা কোথায় পড়লেন?'

মনে হল যজ্ঞেশ্বরকাকু আরও গরম হয়ে গিয়েছেন, 'কোথায় পড়লাম? কোথায় আবার! তোমাদের বাড়ির দোতলার বারান্দায়! তুমি এও ভুলে গিয়েছ যে বাবুয়াদের সামনের ঘরে সন্দেশের অফিস? আর অফিসের বাইরের বারান্দায় প্রায়ই 'সন্দেশের কপি পড়ে থাকে। আমি সময় পেলেই সেগুলোর পাতা উল্টে উল্টে পড়ি। ওখানে যারা কাজ করে, তারা অতি ভদ্রলোক। বারান্দায় কোনও কপি পড়ে না থাকলে, আমাকে দেখলেই একটা কপি বার করে দেয়। তুমি এসবের কোনও খবর রাখ? থাকো তো দিল্লিতে! এই যেমন এসেছ, তেমনি মাঝে মাঝে আস কলকাতায়।'

আমার রাগ হতে আরম্ভ করল। চালাকি নাকি! আমি না-হয় কলকাতায় মাঝে মাঝে আসি। না-হয় যজ্ঞেশ্বরকাকু কাক সমাজে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, তা বলে না জেনেশুনে সম্পূর্ণ এক অলীক ব্যাপার নিয়ে আমার ওপর চোটপাট করবেন? নিজেকে সামলাবার চেষ্টা সত্ত্বেও, আমার গলায় একটা রাগের ভাব থেকে গেল।

'আপনি যা পড়েছেন, সবই গল্প। সত্যজিৎ রায়ের লেখা রহস্য কাহিনী। এত ভালো লেখা যে পড়তে পড়তে মনে হয় চোখের সামনেই সব ঘটে যাচ্ছে। কল্পনার সৃষ্টিকে বাস্তব মনে হয়। শার্লক হোমসের ক্ষেত্রে একই ব্যাপার। তিনি আর্থার কন্যান ডয়েলের এর অনন্য সৃষ্টি। দু'জন গোয়েন্দার একজনও বাস্তব-জগতের লোক নন।'

'যজ্ঞেশ্বরকাকু আমার দিকে খানিকক্ষণ তীব্রতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'সত্যি কথা বলছ?'

'আমি আপনাকে কোনওদিন মিথ্যে কথা বলেছি? যদি বিশ্বাস না-হয়, তাহলে খোঁজ করে দেখুন।'

যজ্ঞেশ্বরকাকু সন্দেহের চোখে তাকাতে তাকাতে বললেন, 'বলা যায় না সত্যি না মিথ্যে বলছ। তবে যদি মিথ্যে বলে থাকো, তাহলে ঠুকরে তোমার মাথা থেকে রক্ত বার করে দেব।'

'সেটা হয়ত পারবেন না। আমি সাধারণত মিথ্যে কথা বলি না।'

হঠাৎ যজ্ঞেশ্বরকাকুর হাবভাব একেবারে বদলে গেল। তিনি ভীষণ অসহায় আর হতাশ ভাবে নিজের মনে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'তাহলে কী হবে! তাহলে কী হবে!'...

আমার মনে হল, যজ্ঞেশ্বরকাকু কোনও মহা বিপদে পড়েছেন। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন? কী হল?'

যজ্ঞেশ্বরকাকু একটু চুপ করে থেকে চিন্তিত মুখে বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে!'

আমার কৌতূহল বাড়তে আরম্ভ করল, 'কেন? সর্বনাশ হল কেন?'

'কেন? তুমি জানো। তোমাদের পাশের বাড়ির ছাদে সপ্তাহে দু'দিন এপাড়ার কাকদের পার্লামেন্ট বসে?'

'হ্যাঁ, জানি। আপনাকে সেখানে দু'একবার বক্তৃতাও করতে দেখেছি। কিন্তু আমি বেশ দূরে ছিলাম বলে, আপনার গলা শুনতে পাচ্ছিলাম না।'

'শুনলেও বুঝতে পারতে না। কারণ, আমি সেখানে কাকদের ভাষায় ভাষণ দিচ্ছিলাম। যাই হোক, তুমি জানো যে আমি আমাদের সংসদে বিরোধী দলের নেতা?'

'আপনিই একবার বলেছেন।'

'ভালো, গাড়িয়াহাট মোড় কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত আমাদের পার্টি কাকপন্থী গণতান্ত্রিক দলের সাংসদ ডঃ তীক্ষ্ণচঞ্চু চকচকে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাকত্রাণ কৃষ্ণকায়ের বিরুদ্ধে সংসদে কয়েকদিন আগে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন। তার পরদিন থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা কলকাতা কাক-পুলিশের পণ্ডিতিয়া মোড় আর গড়িয়াহাট মোড় থানায় ডায়েরি করেছি। পুলিস কমিশনার দীর্ঘগ্রীবা কালিকাময়কেও জানিয়েছি। সবাই বলছেন, চেষ্টা

চলছে। কিন্তু এক সপ্তাহ হয়ে গেলেও তীক্ষ্ণচঞ্চুকাকুর কোনও খবর নেই। আমাদের সন্দেহ যে—হয় কৃষ্ণকায় নিজে বা তাঁর সঙ্গে দুর্নীতি জড়িত অন্য কেউ তাঁকে গুণ্ডা দিয়ে অপহরণ করিয়েছে। তারা তাঁকে মেরে ফেলেছে, কিম্বা চেষ্টা করছে যাতে তিনি তাঁর অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেন। তাই ভাবছিলাম, তাঁকে উদ্ধার করার বা তাঁর হত্যাকারীদের ধরার জন্য, আমরা তোমাদের ফেলুদার সাহায্য নেব। কিন্তু তুমি তো বলছ যে ফেলুদা একজন কাল্পনিক চরিত্র।'

ঘটনটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমি একটু ভেবে বললাম, তা আপনি কলকাতা পুলিসকে ব্যাপারটা জানান না কেন?'

যজ্ঞেশ্বরকাকু আবারে ধমকের স্বরে বললেন, 'এবার তুমি মাস্টার তপেসরঞ্জন ওরফে তোপ্‌সের মতো কথা বলছ! কলকাতা পুলিশ কলকাতার মানুষদের সামলাতেই হিমসিম খাচ্ছে। একজন কাককে খুঁজে বার করার তাদের সময় কই? একজন কাক নিজের সমাজে যত গুরুত্বপূর্ণ হন না কেন, কলকাতা পুলিস তাঁর গুরুত্ব কী বুঝবে?'

'তাহলে?'

'তাই তো ভাবছি। তুমি ঠিক জানো যে ফেলুদা কাল্পনিক চরিত্র?'

'বলেইছি তো তাই।'

হঠাৎ যজ্ঞেশ্বরকাকুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল, 'তোমাদের ফেলুদা যদি সত্যজিৎ রায়ের কল্পনার সৃষ্টি হয়ে থাকেন, তাহলে আমার সম্পর্কে পূর্বপুরুষ কাক্কেশ্বর কুচকুচে ছিলেন সত্যজিৎ রায়ের বাবা সুকুমার রায়ের সৃষ্টি। তাহলে লোকে আমার বিষয়তেও বলতে পারে যে আমি তোমার কল্পনার সৃষ্টি। যত সব গাঁজাখুরী কথা! শোনো, আমি এ-ব্যাপারে তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করতে রাজি নই। সাংবাদিকতা করতে করতে তোমার মাথার ঘিলু গোবর হয়ে গিয়েছে। ফেলুদা আছেন! তাঁর বাড়িতে ফোনও আছে। তুমি দেখো, আমি যেমন করে পারি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব! মিছিমিছি

তোমার সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করলাম।'

যজ্ঞেশ্বরকাকু কথা শেষ করে জানলার শিকের ভিতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে, পাঁচবার ডানা ঝাপটিয়ে টেক-অফ করলেন। আমার চা ততক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। আমি আরেক পেয়ালা চা ঢেলে নিয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসলাম।

তারপর দিন সাতেক যজ্ঞেশ্বরকাকুর কোনও খবর পাইনি। আমার দিল্লি ফিরে যাবার দু'দিন আগে হঠাৎ দেখি, তিনি আমাদের বাগানের পিছনদিকের পাঁচিলে বসে একটা মুরগীর ঠ্যাং খাচ্ছেন। তাঁর দু'পাশে দু'জন দু'জন করে মস্তানের মতো দেখতে কাক বসে আছেন। জিজ্ঞেস করার লোভ সামলাতে পারলাম না, 'কী, ফেলুদার কোনও খবর পেলেন?'

যজ্ঞেশ্বরকাকু মুরগীর ঠ্যাংটা তাঁর ডান পায়ের নীচে চেপে রেখে গম্ভীর গলায় বললেন, 'তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার আগেই তীক্ষ্ণচঞ্চুকাকু ফিরে এসেছেন।'

'তাঁর মানে? আপনি ফেলুদার খোঁজ করছেন শুনেই বুঝি অপহরণকারীরা ওঁকে ছেড়ে দিলো?'

যজ্ঞেশ্বরকাকু আরও গম্ভীর গলায় বললেন, 'সব কিছু নিয়ে ছ্যাবলামো কোরো না, ব্যাপারটা অত্যন্ত সিরিয়াস।'

'তীক্ষ্ণচঞ্চুকাকু কি পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন?'

এবার যজ্ঞেশ্বরকাকুর চোখে-মুখে রাগের ভাব স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলো। বললেন, 'তোমাকে তো বলেইছি যে তীক্ষ্ণচঞ্চুকাকুকে অপহরণ করা হয়েছিল। ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি তোমাদের বাড়ির সামনের ফুটপাথের বকুলগাছটার মগডাল থেকে উড়ে গিয়ে, সবে ত্রিকোণ পার্কে করপোরেশন অফিসের কার্নিশে বসেছেন, এমন সময় কে একজন বা কারা তাঁর ঠোঁটের ওপর কড়া গন্ধঅলা একটা কাপড় চেপে ধরে। তিনি তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান হলে দেখেন তিনি একটা বিরাট কয়লার ঢিপির ওপর পড়ে আছেন। আস্তে আস্তে উঠে চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারেন যে তিনি একটা রেলের মালগাড়ির কয়লা ভরা ওয়াগানের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। আরও লক্ষ্য করলেন যে মালগাড়িটি একটা ষ্টেশনের সাইডিং-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদিক-ওদিক ঘুরে দেখলেন — ষ্টেশনের নাম খড়গপুর!'

আমার কৌতুহল বাড়ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওঁকে ফেলে রেখে গেল কেন? আপনি তো বলেছিলেন...'

আমাকে কথা শেষ না করতে দিয়ে, যজ্ঞেশ্বরকাকু অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন, 'এখন বুঝতে পারছি, তুমি কেন ফেলুদার কোনও খবর রাখ না। তুমি আসলে ফেলুদার ওপর সত্যজিৎ রায়ের কোনও লেখাই পড়নি। পড়লে এতদিনে তোমার যুক্তি-শক্তি বাড়ত। ওদের উদ্দেশ্য ছিল তীক্ষ্ণচঞ্চুকাকুকে খুন করা।'

'কী করে?'

'কী করে? ওরা জানত—তীক্ষ্ণচঞ্চুকাকুর যখন জ্ঞান হবে, তখন তিনি আমাদের পাড়ার থেকে অনেক দূরে। সেখান থেকে তাঁর পথ চিনে ফেরা কঠিন হবে। সেখানে কোথায় খাবার পাওয়া যায়, কোথায় ডাষ্টবিন, তাও তিনি জানবেন না। তারপর খাবারের সন্ধান পেয়ে খেতে গেলে, স্থানীয় কাকদের সঙ্গে তাঁর গোলমাল লাগবে। তাঁরা ভাববেন এটা আবার কে, কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে আমাদের খাবারে ভাগ বসাচ্ছে। তাঁরা সকলে মিলে তাঁকে আক্রমণ করে মেরে ফেলবেন। তিনি নিজের গাছের ডাল থেকে অনেক দূরে এক অজানা জায়গায় ক্ষিদেয় ধুঁকতে ধুঁকতে, অন্য কাকদের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মারা যাবেন। একবারে মেরে ফেললে তাঁর এত কষ্ট হবে না।'

আমি চমকে উঠলাম। 'এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার! মানুষদের মধ্যে এরকম দানবীয় পরিকল্পনার কথা শুনেছি। কিন্তু কাকদের মধ্যে? আমার...'

আমার কথা শেষ হবার আগেই, যজ্ঞেশ্বরকাকু গম্ভীরভাবে বললেন, 'তুমি কি ভাবো, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন শুধু মানুষদের জগতে সীমাবদ্ধ? এটা কাকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। তীক্ষ্ণচঞ্চুকাকু তারই ভিক্‌টিম হতে যাচ্ছিলেন।'

'বাঁচলেন কী করে?'

'কী করে? উনি নিজে কিছু কম নাকি? উনি যেমন তেমন কাক নন। একজন রাজনৈতিক কাক। তার ওপর

নেতা। তিনি চোখ-কান খোলা রাখেন। দেশের সাধারণ কাকদের কী করে বোঝাতে হয়, সেটা ভালোরকম জানেন। জানেন কী করে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হয়। উনি ঠিক অবস্থা সামাল দিলেন। প্রথমেই উনি ওখানকার কাকদের সব কথা খুলে বললেন। বললেন, তিনি তাঁদের খাবারে ভাগ লাগাতে আসেন নি। রাস্তা খুঁজে পেলেই, নিজের গাছের ডালে ফিরে যাবেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁদের কাকপন্থী গণতান্ত্রিক দলের কথাও শোনালেন। বললেন, সব কাকের উচিত দেশে গণতন্ত্রের ভিত শক্ত করা।'

'তারপর কী হল?'

'কী হল? খড়গপুরের রেল সাইডিং-এর কাকরা তাঁকে শুধু খেতেই দিলেন না, সেখানে কাকপন্থী গণতান্ত্রিক দল বা 'কাগদ'-এর একটা শাখা খুললেন। তাছাড়া তাঁরা তীক্ষ্ণচঞ্চুকাকুকে তাঁদের পাশের পাড়ার কাকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে, তাঁদের অনুরোধ করলেন তাঁকে সাহায্য করতে। সেখানে দূরদর্শী মিশকালো বলে একজন কাক ছিলেন। তিনি একজন খ্যাতনামা পর্যটক। বেশ কয়েকবার কলকাতা-খড়গপুর, খড়গপুর-কলকাতা করেছেন। তিনি তীক্ষ্ণচঞ্চুকাকুকে ফেরার রাস্তা ভালো করে বলে দিলেন। সেখানেও কাকপন্থী গণতান্ত্রিক দলের একটা শাখা খোলা হয়ে গেল। আর সে-পাড়ার কাকরাও তাঁদের পাশের পাড়ার কাকদের সঙ্গে তীক্ষ্ণচঞ্চুকাকুর পরিচয় করিয়ে দিলেন। এরকম করে একের পর এক পাড়া ঘুরে তিনি কেবল বহাল তবিয়ৎ ফিরে এলেন না, খড়গপুর থেকে কলকাতা 'কাগদ' বা কাকপন্থী গণতান্ত্রিক দলের প্রায় দেড় হাজার শাখা স্থাপন করে এলেন।'

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বললাম। 'থাক্! সব ভালো যার শেষ ভালো।'

যজ্ঞেশ্বকাকু আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'শেষ কিসের? এখন তো সবে শুরু! আমাদের একজন নেতৃস্থানীয় সাংসদকে হত্যা করার এমন একটা জঘন্য চেষ্টা হল, আর আমরা চুপ করে থাকব? আমরা কাল দেশপ্রিয় পার্কে এক বিরাট কাকসভার ডাক দিয়েছি। আশা করি অন্তত পাঁচ হাজার কাক সেখানে জড় হবেন। সেখানে আমরা ঘোষণা করব—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তীক্ষ্ণচঞ্চুকাকুর অপহরণকারীদের গ্রেপ্তার না-করা হলে এবং অন্যথায় কাকত্রাণ কৃষ্ণকায়কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পথ থেকে বরখাস্ত না করা হলে, আমরা দেশব্যাপী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হব। দেখব, এরপর কাকবাদী প্রজাতন্ত্রী দল কতদিন ক্ষমতায় থাকে!'

অবাক হয়ে শুনতে শুনতে আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ কথাগুলো বেরিয়ে গেল, 'থাক্, তাহলে আর আপনার ফেলুদার প্রয়োজন নেই!'

'কেন নেই? আলবৎ আছে! আগের মতই আছে! যতদিন অপহরণকারীদের ধরা না হচ্ছে, ততদিন আমাদের কোনও নেতা নিরাপদ নন। এইতো দেখছ, আমাদের দেহরক্ষী নিয়ে চলতে হচ্ছে! আমার ডান দিকে প্রথম জন হচ্ছেন মসীবর্ণ মারকুটে, বিরাট ক্যারাটে-বিশারদ। তাঁর ডানদিকে যিনি, তাঁর নাম কৃষ্ণবর্ণ বোম্বেটে, দারুণ বক্সার। আমার বাঁদিকে প্রথমজন হচ্ছেন কাকবিক্রম তীব্রঠোকর। উনি ফাইটার-বম্বার এরোপ্লেনের মতো ডাইভ করে এসে, সাংঘাতিক ঠোকর মারেন। তাঁর বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আছেন কাকগৌরব শানিতনখর। উনি বাঘের মতো খাম্চে দেন। এঁরা সকলেই আমাদের দলের কাকপন্থী সেনার কমাণ্ডো। আমরা এঁদের কাক-ক্যাট বলি। এঁরা থাকতে আমার ধারে-কাছে কোনও শত্রু আসতে পারবে না। কিন্তু আমরা চিরকাল তো দেহরক্ষী নিয়ে চলতে পারব না। কাজেই আমাদের বার করতে হবে তীক্ষ্ণচঞ্চু চকচকের অপহরণের পিছনে কাদের হাত ছিল। কারা তাঁকে অপহরণ করেছিল। তাই আমাদের মিঃ প্রদোষ মিটারকে চাই। তিনিই একমাত্র লোক, যিনি এই অপরাধের কিনারা করতে পারেন। এখন আমাদের একমাত্র স্লোগান হচ্ছে, 'ফেলুদা লাও! দেশ বাঁচাও' বুঝেছ?'

এই বলে তিনি নিজের ভাষায় চিৎকার করে উঠলেন। 'কাক-কাক কাকাও! কা-কা কাগাও!'

তৎক্ষণাৎ তাঁর দু'পাশের দেহরক্ষীরাও চিৎকার করে উঠলেন, 'কাক-কাক কাকাও! কা-কা কাগাও!'

'কিন্তু...'

যজ্ঞেশ্বরকাকু আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই পাখা ঝটপটিয়ে উড়ে এসে গোটা দশেক কাক তাঁর দু'পাশের দেহরক্ষীদের দু'ধারে লাইন করে বসে ব্যস্ত-সমস্তভাবে কী যেন বলতে আরম্ভ করলেন।

যজ্ঞেশ্বরকাকু তাঁর ডান পা-টা মুরগীর ঠ্যাংটার ওপর থেকে তুলে নিয়ে ইঙ্গিতে তাঁদের থামিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন, 'এখন আর তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় হবে না। কলকাতার কাক-পুলিস আমাদের দেশপ্রিয় পার্কে কাকসভা করতে অনুমতি দিচ্ছে না। কাজেই আমাদের এখনই পুলিসের সদর দপ্তর কাকবাজার ঘেরাও করতে হবে। তবে তোমার সঙ্গে আমার কথা শেষ হয়নি। তুমি গোল্লায় যাচ্ছ!'

যজ্ঞেশ্বরকাকু কথা থামিয়ে তাঁর গলা আর ঠোঁট আকাশের দিকে করে স্লোগান দিলেন, 'কাক-কাক কাকাও। কা-কা কাগাও!'

উপস্থিত অন্য কাকরা সমস্বরে চিৎকার করলেন, 'কাক-কাক কাকাও! কা-কা কাগাও!'

যজ্ঞেশ্বরকাকু মসীবর্ণ মারকুটের কানে কানে ফিসফিস করে কী-সব বলে, পাঁচবার ডানা ঝাপটিয়ে টেক-অফ করলেন। ঠিক একইভাবে ডানা ঝাপটিয়ে টেক-অফ করে অন্য কাকরা তাঁর পিছন পিছন উড়ে গেলেন। কেবল মসীবর্ণ মারকুটে সতর্ক চোখে দাঁড়িয়ে রইলেন যজ্ঞেশ্বরকাকুর ফেলে যাওয়া মুরগীর ঠ্যাং-টার পাশে। মনে হল, তাকে বলা হয়েছে সেটা পাহারা দিতে। কাকবাজার ঘেরাও শেষ হলে, যজ্ঞেশ্বরকাকু ফিরে এসে আবার খাবেন।

ফেলুদার শয়তানরা কেন বিদ্বান?

উজ্জ্বল চক্রবর্তী

বনবিহারী সরকার।

মগনলাল মেঘরাজ।

মহাদেব চৌধুরী...

ফেলুদার জন্য থাকে আমাদের হাততালি, আর এঁদের জন্য আপসোস। হয়তো একটু সিমপ্যাথি। অথচ এঁরা সবাই দুর্ধর্ষ ভিলেন। তবু কোন্ শক্তির জোরে এঁরা আমাদের সিমপ্যাথি পেয়ে যান? ফেলুদা এই প্রশ্নের উত্তর দেয়নি তোপ্‌সেকে। দেবেও না। তাহলে যে তোপ্‌সেকে নিয়ে যেতে হবে অন্ধকার 'অ্যাডাল্ট' পৃথিবীতে!

ফেলুদা কি সব কথা বলে তোপ্‌সেকে? সব বিশ্বাস, সব অভিজ্ঞতা শেয়ার করে?

না। এমনকি ফেলুদার নীল নোটবুক পড়াও তোপ্‌সের বারণ। ফেলুদার চোখে অ্যাডাল্ট পৃথিবীর রূপটা এমনই, যা কাউকে বুঝিয়ে বলা চলে না। সেটা শুধুই অনুভবযোগ্য। আজকের পৃথিবী নিয়ে সেই অনুভবটা ফেলুদার এসেছে দীর্ঘ অ্যাডভেঞ্চার-জীবনের মধ্যে দিয়ে।

কী করে আমরা সেই অনুভবের অংশীদার হব?

ফেলুদা তার দুশমনদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সেটা দেখেই। ফেলুদার ভিলেনদের আমরা চিরে চিরে দেখব। তাহলেই আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে ফেলুদার অ্যাডাল্ট পৃথিবীটা!

২

ভিলেনই পদে পদে নায়কের কাজে বাধা সৃষ্টি করে। বাধাগুলো যত কঠিন হয়, ততই জমে ওঠে অ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু কঠিন বাধা সৃষ্টি করা কার পক্ষে সম্ভব? যে প্রখর বুদ্ধিমান, একমাত্র তার পক্ষেই। তাই বলে আজকের যুগে শুধুই বুদ্ধির জোরে সফল হওয়া যায় না। সঙ্গে চাই জ্ঞান। এ-যুগটাই ইনফরমেশনের। যে-মানুষের মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত ইনফরমেশন ধরে রাখার ক্ষমতা নেই, সেই লোক আজকের যুগে যথেষ্ট সফল হতে পারে না। তাই কোনো ভিলেনকে যদি সফল হতে হয়, তবে তাঁর মগজে যথেষ্ট ইনফরমেশন ধরে রাখার ক্ষমতা থাকা চাই।

ফেলুদার প্রধান ভিলেনরা এই ছাঁচেই ঢালাই করা। এঁরা সবাই শহুরে এবং শিক্ষিত। অতি সাধারণ স্তরের প্রতিদ্বন্দ্বী (যাকে বলে ছিঁচকে অপরাধী) মাত্র একবারই এসেছে ফেলুদার জীবনে। সে রায়বেরিলির জেল ভেঙে পালানো এক জালিয়াত। নাম পুরন্দর রাউত, বাড়ি পূর্ণিয়া। তবু সে-ও সরাসরি ফেলুদার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। ছদ্মবেশী মছলীবাবা ওরফে পুরন্দরের মাথার ওপর ছিলেন স্বয়ং মগনলাল মেঘরাজ!

যদি ভাবা হয়, ফেলুদার গল্প-উপন্যাসের চরিত্র-দের মধ্যে ফেলুদাই সবচেয়ে ওয়েল-ইনফর্মড্, তবে কিন্তু ভুল হবে। যদি সেটাই সত্যি হত, তাহলে মহাদেব চৌধুরীর মতো দুর্ধর্ষ ভিলেনের বাড়িতে নিজে গিয়ে ফেলুদা প্রশ্ন করত না—'পেরিগ্যাল রিপিটার কী?'

আসলে ঘড়ির বিষয়ে মহাদেব চৌধুরীর যা জ্ঞান, তার কোনও জুড়ি কলকাতায় ছিল না। তাই ফেলুদাকে যেতে হয়েছিল চৌধুরী-সাহেবের কাছেই। ঠিক এই পয়েন্টেই আমরা একটা দারুণ সূত্র পেয়ে যাচ্ছি। যে সূত্র ফেলুদার অন্যান্য ভিলেনদের বুঝতে দারুণ সাহায্য করবে।

সূত্রটা হল, ফেলুদার ভিলেনরা ওয়েল-ইনফর্মড হলে কী হবে, তাঁদের জ্ঞান কয়েকটা অদ্ভুত বিষয়ের

মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন,

১। মহাদেব চৌধুরীর ভালোবাসা অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলিতি যন্ত্র। যেমন, ঘড়ি ('গোরস্থানে সাবধান')।

২। নরেশচন্দ্র পাকড়াশীর আগ্রহ পুরনো ভ্রমণ-কাহিনীর ওপর ('বাক্স-রহস্য')।

৩। শশধর বোস তিব্বতী প্রথায় পরলোকচর্চা করেন (*গ্যাংটকে গণ্ডগোল*)।

৪। রাজশেখর নিয়োগী রেনেসাঁস আমলের ইউরোপীয় চিত্রকলায় দক্ষ (*টিনটোরেটোর যীশু*)।

৫। মগনলাল মেঘরাজ প্রাচীন শিল্পবস্তু হাতে নিলেই তার মূল্য টের পেয়ে যান (*জয় বাবা ফেলুনাথ*)।

৬। অমিয়নাথ বর্মণ মেস্‌মেরীয় প্রথায় সম্মোহন করতে ওস্তাদ (*সোনার কেল্লা*)।

৭। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় লখ্‌নৌ শহরে যা যা ঘটেছিল, সেই-সব ঘটনা বনবিহারী সরকারের নখদর্পণে (*বাদশাহী আংটি*)।

এই সাত জন ভিলেনকে যদি আমরা তাঁদের ক্রিমিন্যাল-জীবনের বাইরে টেনে নিয়ে দাঁড় করাই, তাহলে তাঁদের প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আসাই স্বাভাবিক। নিজেদের প্রিয় বিষয়ে তাঁরা যে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেছেন, তার জুড়ি মেলা ভার!

নিজেদের প্রিয় বিষয়ে তাঁরা যে কতটা স্বচ্ছন্দ, তার দু'একটা প্রমাণ দেওয়া দরকার। না হলে বক্তব্য তেমন স্পষ্ট হবে না। *বাদশাহী আংটি*-র পাঁচ নম্বর পরিচ্ছেদে চলে আসা যাক, যেখানে ফেলুদা আর তোপ্‌সেকে সঙ্গে নিয়ে বনবিহারী সরকার ঢুকছেন লখ্‌নৌ শহরের রেসিডেন্সিতে। কেন যে বাড়িটা এখন ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেছে, সেটা গড়গড়িয়ে বলে দিলেন বনবিহারীবাবু। '...সেপাই মিউটিনির সময় লখনৌ শহরে নবাবদেরই রাজত্ব। বৃটিশরা তাদের সৈন্য রেখেছিলেন এই বাড়িটার ভেতরেই। স্যার হেনরি লরেন্স ছিলেন তাদের সেনাপতি। বিদ্রোহ লাগল দেখে প্রাণের ভয়ে লখ্‌নৌ শহরের যত সাহেব মেমসাহেব একটা হাসপাতালের ভিতর গিয়ে আশ্রয় নিল। কদিন

মহাদেব চৌধুরী কলকাতার সেরা ঘড়ি-বিশেষজ্ঞ

খুব লড়েছিলেন স্যার হেনরি, কিন্তু আর শেষটায় পেরে উঠলেন না। সেপাই-এর গুলিতে তাঁর মৃত্যু হল। আর তার পরে বৃটিশদের কী দশা হল, সেটা এই বাড়ির চেহারা দেখে কিছুটা আন্দাজ করতে পারছ। স্যার কলিন ক্যাম্পবেল যদি শেষটায় টাটকা সৈন্য সামন্ত নিয়ে না এসে পড়তেন, তাহলে বৃটিশদের দফারফা হয়ে যেত। ...এ ঘরটা ছিল বিলিয়ার্ড খেলার ঘর, দেয়ালে সেপাইদের গোলা লেগে কী অবস্থা হয়েছে দেখ। ...'

বাস্তব জীবনে আমরা ক'জন দেখেছি এমন লোক, যিনি এত অনায়াসে ইতিহাসের ঘটনা বলতে ত পারেন, অথচ নিজে পেশাদার ঐতিহাসিক নন? এদিক দিয়ে ভাবলে বনবিহারী সরকার একজন বিরল মানুষ!

মহাদেব চৌধুরীও তা-ই। ফেলুদা শুধু বলেছিল, 'পেরিগ্যাল রিপীটার জিনিসটা কী, সেটা জানতে চাইছিলাম'। মহাদেব চৌধুরী কিন্তু বললেন না— দু'দিন পরে আপনি আবার ঘুরে আসুন, আমি ইতিমধ্যে বই-টই ঘেঁটে দেখি। বরং অপ্রস্তুত অবস্থাতেও স্বচ্ছন্দে তিনি বলে দিলেন, '...রিপীটার মানে বন্দুকও হয়, তবে তার সঙ্গে পেরিগ্যাল যোগ দিলে সেটা হয় ঘড়ি। পকেট ওয়াচ। ফ্রানসিস পেরিগ্যাল। ইংলিশম্যান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পেরিগ্যালের মতো ঘড়ির কারিগর পৃথিবীতে কমই ছিল। দুশো বছর আগে ইংল্যান্ডেই সবচেয়ে ভালো ঘড়ি তৈরি হত, সুইটজারল্যান্ডে নয়।'

আশ্চর্য! বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বইতে যে-বিষয়ে একটা পরিচ্ছেদও নেই, যে বিষয়ে কোনো ভালো বইও লেখা হয়নি— একটুও হকচকিয়ে না গিয়ে, সেই বিষয়ে এমন স্পষ্ট উত্তর দিতে ক'জনই বা পারেন?

এই দুটো উদাহরণেই নিশ্চয়ই প্রমাণ করা গেল ফেলুদার প্রতিদ্বন্দ্বীরা কতটা বিরল গোত্রের মানুষ! এমনকি স্বয়ং শার্লক হোমস্-এর রাইভ্যালরাও এঁদের পাশে দাঁড়াতে পারেন না। যদিও ফেলুদা নিজে উলটো কথাই বলত। সে নিজে হোমস্-এর ভক্ত!

'...জানিস তোপ্‌সে — আমাদের যা কিছু শিক্ষা দীক্ষা ওই শার্লক হোম্‌সের কাছে। সব প্রাইভেট ডিটেকটিভের গুরু হচ্ছে হোম্‌স। তাঁর সৃষ্টিকর্তা কন্যান ডয়েলের জবাব নেই।... ' (*অপ্সরা থিয়েটারের মামলা,* পরিচ্ছেদ এক)

কিন্তু কন্যাল ডয়েলের জবাব আছে! সেই জবাব বেশ ভালোভাবেই দিয়েছেন ফেলুদার দুশমনরা। তাই বলি, ফেলুদার তেমন কিছু শেখার নেই হোম্‌স্-এর কাছে। হোম্‌স্‌কে কোনোদিন বনবিহারী সরকার বা মহাদেব চৌধুরীর মতো মেধাবী লোকের সামনে পড়তে হয়নি, পাণ্ডিত্যে যাঁরা সহজেই টেক্কা দিতে পারেন একজন গোয়েন্দাকে। অন্তত একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটা প্রমাণ করা দরকার।

প্রমাণটা যাতে জোরদার হয়, তার জন্য বেছে নেওয়া যাক শার্লক হোম্‌স্-এর একটা মার্কামারা অ্যাডভেঞ্চার, *দ্য হাউণ্ড অব্ দ্য বাস্কারভিল্‌স্*। শুনেছি হোম্‌স্-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস নাকি এটাই। কন্যান ডয়েলের ব্যক্তিগত জীবনকেও পালটে দিয়েছিল এই বই। ১৯০২ সালে *দ্য হাউণ্ড অব্ দ্য বাস্কারভিল্‌স্* প্রকাশিত হবার পরই, কন্যান ডয়েল 'স্যার' উপাধি পেয়েছিলেন। এখন যদি প্রমাণ করা যায়, এই উপন্যাসের ভিলেন দুর্বল, তাহলে হোম্‌স্-এর অন্য গল্পের অন্য ভিলেনদের দক্ষতা সম্পর্কেও আমাদের মনে সংশয় জাগতে বাধ্য! *বাস্কারভিল্‌স্*-কে বেছে নেবার এটাও একটা কারণ।

এই উপন্যাসের ভিলেন নিজের পরিচয় দেয় 'প্রকৃতিবিদ্' বলে। শুধু তা-ই নয়, গল্পে যে-অপরাধটা সে মাঝে মাঝেই ঘটাচ্ছে, সেটাও করছে একটা হিংস্র অথচ বুদ্ধিমান প্রাণীর সাহায্য নিয়েই। সেটা অবশ্য তার মাঝরাতের কাজ। সারাদিন সে ধাওয়া করে বেড়ায় উড়ন্ত প্রজাপতির পেছনে। লোকটার নাম স্টেপলটন (ওরফে ভান্দেল্যুর ওরফে 'ছোট'-বাস্কারভিল)।

এবার, খোলা মন নিয়ে দেখা যাক, ফেলুদার রহস্য-অ্যাডভেঞ্চারের তরুণ পাঠকরা ঠিক কী আশা করবে স্টেপলটন নামে এই লোকটার কাছে?

আশা করবে, তার জ্ঞান যথেষ্ট গভীর হোক্। যাতে সে হোম্‌স্‌কে সত্যিকারের ধাঁধায় ফেলতে পারে। ধাঁধাটা জটিল না হলে, বাধাটা যে কঠিন হয় না!

কিন্তু ফেলুদার পাঠকদের সে আশায় ছাই। প্রথম

মহীতোষ সিংহরায় কথা বলছেন ফেলুদার সঙ্গে

দর্শনেই এই প্রকৃতিবিদ্‌কে চেনা যায় মেকি বলে। জলের শব্দ আর পাখির ডাক আলাদা করে চিনতে পারেন না এই 'বিজ্ঞানী'! তাঁকে একদিন ডাক্তার ওয়াট্‌সন প্রশ্ন করলেন,

'What do you think is the cause of so strange a sound?'

বিজ্ঞানীর উত্তর, 'Bogs make queer noises sometimes. It's the mud settling, or the water rising, or something.'

ফেলুদার দুশমনদের মুখে এমন অনিশ্চিৎ উত্তর কেউ কল্পনাও করতে পারে না। ডাক্তার ওয়াট্‌সন অবিশ্যি একটুও সন্তুষ্ট না-হয়ে আবার বললেন,

'No, no, that was a living voice.'

'Well, perhaps it was. Did you ever hear a bittern booming?'

'No, I never did.'

'It's a very rare bird— practically extinct— in England now, but all things are possible upon the moor. Yes, I should not be surprised to learn that what we have heard is the cry of the last of the bitterns.'

'It's the weirdest, strangest thing that ever I heard in my life...' (পরিচ্ছেদ সাত)

বনবিহারী সরকার বা মহাদেব চৌধুরী হলে কি এতে আমতা করে আমতা ডাক্তার ওয়াটসনের প্রশ্নের উত্তর দিতেন? তাহলেই বোঝো, হোম্‌স্‌-এর দুশমন স্টেপলটন-সাহেবের দশাটা কী! এ হেন মেকি বিজ্ঞানীর সাজানো অপরাধের সমাধান যে সহজেই হয়ে যাবে, তাতে অবাক হবার তেমন কিছু নেই। বনবিহারীবাবু যখন ইতিহাসের ঘটনা বলেন, আর স্টেপলটন বলেন প্রকৃতির কথা— তখন দু'জনের তুলনা করলেই ধরা পড়ে যায়, জ্ঞান এবং আত্মবিশ্বাসের কী দুস্তর তফাত দুই অপরাধীর মধ্যে! বোঝা যায়, বনবিহারীবাবু কতটা এগিয়ে আছেন।

শুধু তো জ্ঞান নয়, সে-জ্ঞানের প্রয়োগেও ফেলুদার ভিলেনরা দক্ষ এবং উৎসাহী। মনে করো মহাদেব চৌধুরীর কথা। মহাদেব চৌধুরী শুধু ঘড়ির ইতিহাস নিয়ে প্রচুর তথ্য মগজে পুরেই ক্ষান্ত হননি। নিজের বাড়িটাকেও করে তুলেছেন অনেক আশ্চর্য ঘড়ির এক আজব মিউজিয়াম। আর নরেন্দ্রনাথ পাকড়াশী যদি একবার অপ্রকাশিত ভ্রমণকাহিনী খুঁজে পান, তাহলে তাঁকে রোখা দায়। *বাক্স-রহস্য* উপন্যাসে তিনি উঠে-পড়ে লেগেছিলেন একটা পাণ্ডুলিপির জন্য— ১৯১৭ সালে লেখা শম্ভুচরণ বসুর 'এ বেঙ্গলি ইন্ লামাল্যাণ্ড'।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ফেলুদার ভিলেনরা শুধু পাণ্ডিত্য নিয়েই ফুরিয়ে যান না। সেই জ্ঞানের প্র্যাকটিক্যাল প্রয়োগ করতেও তাঁদের উৎসাহের ঘাটতি নেই। মানতেই হয়, এটা যথেষ্ট প্রশংসনীয় প্রবণতা।

এবার আমরা আসল প্রশ্নের কাছে হাজির হয়েছি। এত গুণ থাকা সত্ত্বেও, এঁরা অপরাধী হয়ে গেলেন কেন? তার কারণ কি শুধুই লোভ?

এই ভিলেনদের ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টের কথা যদি ভাবি, তাহলে মানতেই হয়, শুধু টাকার লোভে এঁরা অপরাধী হননি। বনবিহারী সরকারের একটা বাগান-বাড়ি আছে লখ্‌নৌতে। কাশীতে আছে মগনলাল মেঘরাজের অট্টালিকা। নরেশচন্দ্র পাকড়াশী দক্ষিণ কলকাতার ল্যান্সডাউন রোডে একটা বড় বাড়িতে একলা থাকেন, তাঁর বক্সার হাউন্ড কুকুর নিয়ে। মহাদেব চৌধুরীর আশ্চর্য মিউজিয়ামে সোনার ঘড়ির ছড়াছড়ি। 'এস্.এস্. কেমিক্যাল্‌স্' নামে একটা জাঁদরেল আতর কোম্পানির ফিফটি পারসেন্ট শেয়ার আছে শশধর বোসের নামে।

মোট কথা, শুধু টাকার লোভে এইসব 'মানুষ' ভিলেন হয়ে গেছেন, এটা ভাবার কোনো যুক্তি নেই। তাহলে পার্থিব জীবনে কিসের অভাব এঁদের অপরাধী করে তুলেছে? এবার তারই জবাব খুঁজব।

একটু আগেই ফেলুদার যে ক'জন ভিলেনের নাম বলেছি, তাঁদের প্রিয় বিষয়গুলোর দিকে আর-একবার তাকানো যাক্। ভাবার সুবিধের জন্য ছোট্ট একটা তালিকা বানিয়ে ফেলি।

১। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলিতি যন্ত্র।
২। অপ্রকাশিত ভ্রমণের পাণ্ডুলিপি।
৩। তিব্বতী প্রথায় পরলোকচর্চা।
৪। প্রাচীন শিল্পবস্তু।
৫। সম্মোহনবিদ্যা।
৬। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের লখ্‌নৌ শহর।

এই তালিকায় একবার চোখ বোলালেই আমরা টের পেয়ে যাই, এইসব বিষয় মোটেই জ্ঞানের মূল প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ, যাকে বলে জ্ঞানের মেনস্ট্রিম — এসব বিষয় তার মধ্যে পড়ে না। যেমন স্কুল-কলেজে ইতিহাস পড়ানো হয় ঠিকই, কিন্তু আলাদা করে 'ঘড়ির ইতিহাস' পড়াবার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। আর এটাই 'গোরস্থানে সাবধান' উপন্যাসের মহাদেব চৌধুরীর সমস্যা! কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে ঘড়ির ইতিহাস পড়িয়ে সুনাম অর্জন করবেন, তার সম্ভাবনা নেই। অথচ ঘড়ির বিষয়ে এতটা পাণ্ডিত্য নিয়ে, তিনি যে সেই জ্ঞানের সাহায্যে একটু-আধটু খ্যাতিমান হতে চাইবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু খ্যাতিমান হবার সুযোগ তাঁর নেই!

অবশ্য একটা বিকল্প রাস্তা খোলা আছে চৌধুরী-সাহেবের সামনে। সেটা হল, ঘড়ির ইতিহাস নিয়ে নামী-দামি পত্রিকায় লেখা ছাপানো। সেই লেখার সঙ্গে যদি পুরনো ঘড়ির ঝল্‌মলে রঙিন ছবিও ছাপা হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। সেইসব ঘড়ির ছবি তুলতে তাঁর

কোনো অসুবিধে নেই। কলকাতা শহরে ঘড়ির শ্রেষ্ঠ কালেক্টার তো তিনি নিজেই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, অফসেটে রঙিন ছবি ছাপতে পারে এমন কোনো পত্রিকা ঘড়ির ইতিহাস নিয়ে প্রবন্ধ যদি একবার ছাপেও, তাহলে অন্তত তার পরের দশ বছর এ বিষয়ে আর কোনো লেখা ছাপবে না। এটাই নামী পত্রিকার সম্পাদকদের রেওয়াজ। জ্ঞানের মেনস্ট্রিমের বাইরে যেসব সাবজেক্ট আছে, সেইসব বিষয়কে তারা পত্রিকার পাতায় জায়গা দেন হয়তো দশ বছরে একবার। তার বেশি নয়। মহাদেব চৌধুরী জানেন, মাত্র একবার লেখা ছেপে

ডঃ বৈদ্য তিব্বতী প্রথায় পরলোক-চর্চা করতেন

তেমন লাভ নেই। বিষয়টার পুনরাবৃত্তি না-হলে, পাঠকরা অচিরেই সেই বিষয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। ফলে, তাঁর খ্যাতিও স্থায়ী হবে না। সুতরাং, কোনও সূত্রেই খ্যাতিমান হবার কোনো সুযোগ মহাদেব চৌধুরীর নেই! বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রেই হোক, আর নামী কাগজে লেখা ছাপার সূত্রেই হোক!

কিন্তু মেনস্ট্রিম জ্ঞানের মধ্যে পড়ে, এমন সব বিষয়ে যাঁরা পারদর্শী— আত্মপ্রকাশের জন্য তাঁদের এই সঙ্কটে পড়তে হয় না। যেমন, রবীন্দ্রনাথের গানের বিষয়ে যাঁরা পন্ডিত, নিজেদের ধ্যান-ধারণা বার বার প্রকাশ করার যতটা সুযোগ তাঁদের আছে, ঠিক ততটা সুযোগ কোনও ঘড়ি-বিশেষজ্ঞের থাকতে পারে না। অন্তত কলকাতায়। আবার নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ যিনি জ্ঞানী, তাঁর চিন্তা-ভাবনা বার বার প্রকাশের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে ভারতের অন্তত পাঁচটি নামী বিজ্ঞান-পত্রিকা। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে একটা মাত্র প্রবন্ধ ছেপেই তারা ক্ষান্ত হবে না। তারা প্রত্যেক সংখ্যাতেই এ-বিষয়ে কিছু-না-কিছু ছাপতে আগ্রহী।

কারণ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স মেনস্ট্রিম জ্ঞানের মধ্যে পড়ে। কিন্তু প্রাচীন তিব্বতী পুঁথি বা বিষাক্ত মাকড়সা নিয়ে লেখা প্রবন্ধ প্রত্যেক সংখ্যায় ছাপতে মোটেই রাজি হবেন না কোনো ডাকসাইটে পত্রিকার সম্পাদক। তাহলে এই দুটো বিষয়ে পারদর্শী চরিত্র— *গ্যাংটকে গণ্ডগোল* উপন্যাসের শশধর বোস আর *বাদশাহী আংটির* বনবিহারী সরকার কী করবেন? তাঁদের কি খ্যাতিমান হবার কোনও রাস্তাই নেই?

অথচ তাঁরা আত্মবিশ্বাসী মানুষ। নিজেদের প্রিয় বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান যে পর্যাপ্ত গভীর, এ-নিয়ে কোনও সংশয় নেই। নিজেদের অপাংক্তেয় ভেবে নিয়ে চেষ্টাহীন শান্ত জীবনযাপন করবেন, তাঁরা এই ধাতুতে গড়া নন। নিজেদের জ্ঞানের বিষয়ে তাঁরা অযথা বিনয়ও করেন না। বরং জোর গলায় বলে বেড়ান, '...চলো — আমার মতো গাইড পাবে না। মিউটিনি সম্বন্ধে আমার থরো নলেজ আছে।' (বনবিহারী সরকার)

তাহলে তাঁরা করবেন কী? কোনো পথেই যখন তাঁরা খ্যাতিমান হতে পারছেন না, অথচ উৎসাহ-উদ্দীপনার কোনো ঘাটতি নেই, তখন যে তাঁরা বিকৃত রাস্তার সন্ধান করবেন, এটাই স্বাভাবিক।

লক্ষ করে দেখ, এই ভিলেনদের সবারই বয়স পঞ্চাশের ওপর। অর্থাৎ অন্তত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তাঁরা অবহেলা সহ্য করেছেন — একটি বিষয়ে প্রচন্ড জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও! পঞ্চাশ পেরনোর পর তাঁরা যখন প্রতিষ্ঠিত হবার সমস্ত আশাই ত্যাগ করলেন, তখন তাঁদের ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। এই ক্ষিপ্ত ভাব থেকেই এসেছে অপরাধ-প্রবণতা। আর শুধু যে অপরাধ-প্রবণতা তা-ই নয়, সেই সঙ্গে বিকৃতির আরো কয়েকটা লক্ষণ ফুটে উঠেছে তাঁদের মধ্যে। তার মধ্যে একটা হল, কোনো কারণ ছাড়াই অচেনা লোককে অপমান করার প্রবণতা!

মহাদেব চৌধুরী আর নরেশচন্দ্র পাকড়াশী ঠান্ডা গলায় মৃদু ধমক দিয়ে, ফেলুদাকে বাড়ি থেকে বহিষ্কার করে দিতে একটুও পেছপা হননি। এই অপমান যে কতটা নির্বিকার গলায় তাঁরা করতে পারেন, তার দুটো দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

(১) '...আমার কুকুরের বয়স সাড়ে তিন। ওটা জাতে বক্সার হাউণ্ড। বাইরের লোক আমার ঘরে এসে আধঘণ্টার বেশি থাকে সেটা ও পছন্দ করে না। কাজেই— (নরেশ পাকড়াশী। *বাক্স-রহস্য*।)

(২) '...আপনি যা জানতে চেয়েছিলেন সেটা আপনার জানা হয়ে গেছে। এবার আপনি আসুন। পেরিগ্যাল রিপীটার কলকাতায় যেটা আছে সেটা আমিই পাব, আপনি পাবেন না। — পেয়ারেলাল!' (মহাদেব চৌধুরী। *গোরস্থানে সাবধান*।)

মগনলাল মেঘরাজ জটায়ুকে ছুরি খেলার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য করেছেন। জোর করে ওভাবে ছুরির সামনে দাঁড় করানোর ইচ্ছে থেকে যেন একটা কথাই আমাদের মনে আসে। মগনলাল যেন বলতে চাইছেন— আমি যখন শুধুই প্রাচীন শিল্প নিয়ে চর্চা করতাম, তখন কেউ আমার জ্ঞানকে সিরিয়াসলি নেয়নি, কেউ আমাকে পাত্তাই দেয়নি। কাশীর সেই শিল্প-প্রেমিক কিশোর অবহেলা পেতে পেতে, আজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এই দক্ষ ছুরি-খেলোয়াড় অর্জুন যে তাঁর
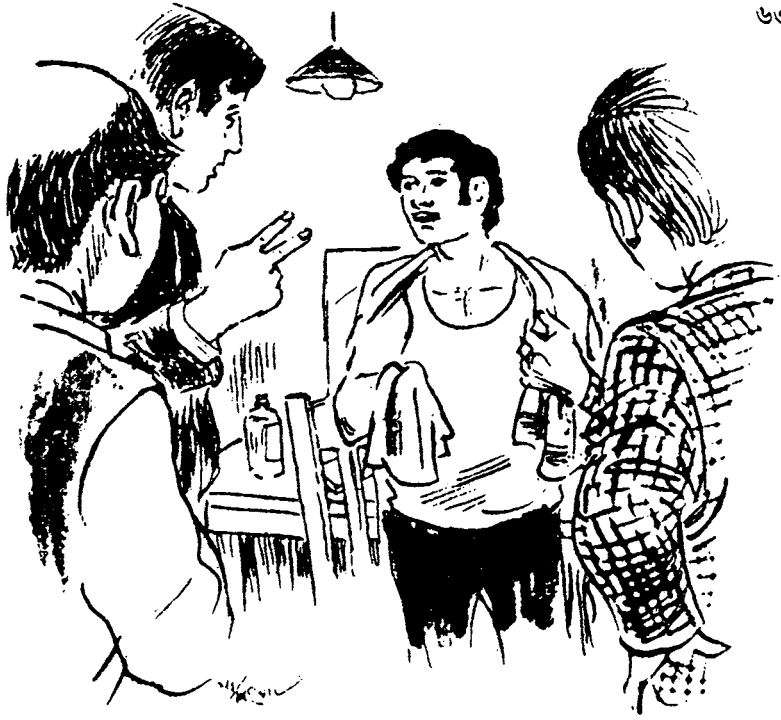
তরুণ যাদুকর সুনীল তরফদার সম্মোহন-বিদ্যায় দক্ষ

আজব শিল্পরসিক মেজাজের এক অমূল্য সংগ্রহ, সেই কথাটা জাহির করার জন্যই যেন মগনলাল মেঘরাজ জটায়ুকে দাঁড় করিয়ে দেন ছুরির সামনে। যাতে মেঘরাজের সংগ্রহকে অবজ্ঞা করার কোনো সুযোগ না থাকে!

এই কাজটা মগনলালের মধ্যে লুকিয়ে-থাকা গুণের বিকৃত অথচ নাটকীয় প্রকাশ। ব্যর্থ-গুণীদের মধ্যে যে এক ধরণের নাটকীয়তা দেখা দেয়, এই বিষয়ে ফেলুদা নিজের গোয়েন্দা-জীবনের প্রথম থেকেই সচেতন, '...অনেক গুণী লোকই নাটুকে হয়, অভিনয় পছন্দ করে, লোককে চমকে দিতে ভালোবাসে। এটা মানুষের অনেকগুলো স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মধ্যে একটা (*গ্যাংটকে গণ্ডগোল*, পরিচ্ছেদ আট)

অবশ্য নরেশচন্দ্র পাকড়াশী এবং রাজশেখর নিয়োগীকে ঠিক ভিলেন বলা চলে না। ওঁরা যা করেছেন, সেই দুটো কাজ মার্কামারা ক্রাইমের পর্যায়েও পড়ে না। তাঁরা নিজেরা অপরাধের রাস্তা নিলেও, তাঁদের উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল এটা মানতেই হবে। পাকড়াশী একটা পুরনো পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের চেষ্টা করছিলেন। আর রাজশেখর নিয়োগী রেনেসাঁ আমলের এক বিখ্যাত অয়েল-পেন্টিং বৈকুণ্ঠপুরের জমিদারবাড়ি থেকে উদ্ধার করে ইয়োরোপের কোনও বিখ্যাত মিউজিয়াম পাঠানোর চেষ্টা করছিলেন। যাতে পৃথিবীর শিল্পীরসিক মানুষ ছবিটা দেখার সুযোগ পান। আসলে ছবিটা দু'শো বছরের পুরনো বাড়ির অন্ধকার ঘরে পড়ে থাকবে, সেটা রাজশেখর নিয়োগীর মনঃপূত হচ্ছিল না। তিনি এক আশ্চর্য দক্ষ শিল্পী। জুরিখের এক হাসপাতালের সেবিকা ছিলেন তাঁর মা। রাজশেখর ছবি-আঁকা শিখেছিলেন প্যারিসে। তাঁর আগ্রহ ছিল রেনেসাঁ-আমলের পেন্টিং-এর প্রতি। রেনেসাঁ পেন্টিং -এ তেল-রঙের আলোছায়ার কারুকাজ করার কলাকৌশল তিনি প্রবল অধ্যবসায়ে রপ্ত করেছিলেন। অথচ এই ক্ষমতা রাজশেখর নিয়োগীকে শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা এনে দিতে পারেনি। অথচ সারা ভারত খুঁজে বেড়ালেও, রাজশেখরের এই দক্ষতার জুড়ি মেলা ভার, একথা মানতেই হবে। এদিক দিয়ে ভাবলে রাজশেখর নিয়োগী অদ্বিতীয়! ঠিক যেমন অদ্বিতীয় মহাদেব চৌধুরী, মগনলাল মেঘরাজ, বনবিহারী সরকার!

আসলে একটা কারণে এই-সব মানুষের প্রতি সহানুভূতি না-এসে পারে না। ওঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের প্রিয় বিষয়ের চর্চা করার জন্য অন্তত কুড়ি বছর সময় দিয়েছেন। দুই দশকের দীর্ঘ অনুশীলন ছাড়া, কোনো বিষয়েই দক্ষতার শীর্ষে পৌঁছনো সম্ভব নয়। এঁরা যদি শুধুই লোভী আর শয়তান হতেন, তাহলে শুধু একটি বিষয়ের চর্চা করে জীবনের কুড়িটা বছর ব্যয় করতেন না। সেটা এঁরা পেরেছেন নিজেদের সাবজেক্টকে ভালোবাসেন বলেই। আর সেই ভালোবাসা কিছুটা অন্ধও ছিল। বিষয়টার চর্চা করার সময় তাঁরা ভেবেও দেখেননি— ভবিষ্যতে এই জ্ঞানের দৌলতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব কি না!

অথচ এই সামান্য ব্যাপারটা ভেবে দেখতে জানে আজকের ১৬ বছরের ছেলে-মেয়েরাও। ভবিষ্যতে ডাক্তার-এঞ্জিনিয়ার হবার উদ্দেশ্য নিয়েই যে বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রী সায়েন্স পড়তে আসে, এটা তো অস্বীকার করা যায় না। শুধুই জ্ঞানতৃষ্ণা মেটানোর জন্য আসে ক'জন? ক'জনই-বা আসে শুধু বিষয়ের প্রতি অন্ধ ভালোবাসার জন্য?

সুতরাং, অন্ধ ভালোবাসা নিয়ে যখন কেউ কোনও বিষয়ের চর্চা করে, তখন তাকে শুধুই 'ভিলেন' বলে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় কি?

৩

ফেলুদার জীবনে-আসা দুর্ধর্ষ ভিলেনরা সত্যিই কতটা অসৎ, সেটা বিচার করে দেখার জন্য, একজন সৎ লোকের চরিত্র খুঁজে নেওয়া যাক্। তারপর দেখি, এই ভিলেনরা কি তাঁর তুলনায় সত্যিই খুব বেশি অসৎ?

এ-রকমই একজন সৎ মানুষ হলেন সিদ্ধেশ্বর মল্লিক। তাঁকে আমরা পেয়েছি *ভূস্বর্গ ভয়ংকর* উপন্যাসে। কেমন মানুষ ইনি, সেটা আগে বলা দরকার। না-হলে ভিলেনদের সঙ্গে তাঁর তুলনাটা ঠিক মতো করা যাবে না।

এই মল্লিকমশাই একটা অদ্ভুত ধাঁচের মধ্যে পড়েন। ধাঁচটা এই দুর্ধর্ষ ভিলেনদের ঠিক উল্টো। কেননা এমন একটি বিষয়ে বিখ্যাত হবার স্বপ্ন দেখেন এই ধাঁচের মানুষরা, যে-বিষয়ে তাঁদের কোনো দক্ষতাই নেই। তাই তাঁদের 'নিজস্ব' কাজটা গোপনে করিয়ে নিতে হয় অন্য লোককে দিয়ে। কিন্তু বাইরে তাঁরা প্রচার করেন কাজটা নিজেরা করেছেন বলেই।

যেমন, লেখক হবার অ্যামবিশন। এমন লোকের দেখাও আমরা ফেলুদার উপন্যাসে পাই, যাঁদের লেখক হিসেবে নাম করার কী উগ্র বাসনা!! অথচ সাধ্য নেই। তখন কী করেন তাঁরা?

খুব সহজ সমাধান। কোনও তরুণ লেখককে চাকরি দিয়ে তাঁরা বাড়িতে রাখেন। একটা অফিসিয়াল পরিচয়ও চাপিয়ে দেওয়া হয় সেই তরুণের কাঁধে। প্রাইভেট সেক্রেটারি! গোপনে তিনিই বেনামা লেখক!

কী পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন এই তরুণ?

আগে বাজিয়ে দেখে নেওয়া হয়, তিনি রীতিমতো ভালো লেখেন কিনা। সেই পরীক্ষায় উৎরোলে, তবেই চাকরি। অর্থাৎ, শেষ-অবধি যিনি চাকরিটা পেয়ে যান, তিনি ওস্তাদ লিখিয়ে। আর সেটাই হয় তাঁর ক্ষতির কারণ। কী ভাবে?

কারণ, সেই তরুণের প্রথম বইটা যদি অন্যের নামে একবার বাজারে বেরিয়ে যায়, আর সেই বই যদি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তাহলে পরে আর নিজের নামে বই ছাপা সম্ভব না-ও হতে পারে সেই তরুণের পক্ষে। তাঁর পাঠানো পাণ্ডুলিপি পড়ে প্রকাশকরা বলবেই, 'ইয়াং হলে কী হবে, এই লেখকের কোনও নিজস্বতা নেই। বিখ্যাত আত্মজীবনীকার 'অমুক'-এর ভাষা, রসিকতার ধাঁচ, এমনকি মুদ্রাদোষ পর্যন্ত বেমালুম চুরি করেছে।' তখন তো আর তিনি প্রকাশকদের বলে বোঝাতে পারবেন না যে, 'অমুক'-এর আত্মজীবনীটা আসলে তাঁরই লেখা! মোট কথা, সেই তরুণের লেখক-জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবারই সম্ভাবনা।

অথচ ঠিক এই সাংঘাতিক অপরাধটাই করেছিলেন মহামান্য বিচারপতি সিদ্ধেশ্বর মল্লিক! আয়রনি এই যে —মল্লিকমশাই কিন্তু নিজেকে সৎ বলেই মনে করেন। শুধু সেটা মনে করেই ক্ষান্ত হন না, অতীতে যেটুকু অসততা করতে বাধ্য হয়েছেন নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে,

তার প্রায়শ্চিত্ত করারও আয়োজন করেছেন। সেই অদ্ভুত প্রায়শ্চিত্তের জন্যই তিনি নির্জন হিমালয়ের কোলে লিদর নদীর তীরে তাঁবুতে এসে রয়েছেন। ছেড়ে দিয়েছেন জজিয়তি।

আশ্চর্য ব্যাপার, এমন সৎ এবং অনুতপ্ত বৃদ্ধও 'আত্মজীবনী' লেখার কথা ভাবেন। আর সেই বই লিখিয়ে নিতে চান অন্য একজন তরুণ লেখকের কলমে। এখানেই খট্‌কা লাগে। বৃদ্ধের সৎ হবার চেষ্টাকে তামাশা বলে মনে হয়।

বৃদ্ধ মল্লিকমশাই নিজের স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য যথারীতি সেক্রেটারি রেখেছেন। নাম, সুশান্ত সোম। আসলে তিনি বৃদ্ধ বিচারপতির আত্মজীবনী-লেখক। 'সৎ' বৃদ্ধের অবশ্য এ-বিষয়ে কোনও অনুতাপ নেই। তরুণ লেখকও ব্যবস্থাটা মেনে নিয়েছেন বেশ হালকা ভাবেই। তাই তিনি যখন ফেলুদাকে এই খবরটা দিয়েছেন, তখন তাঁর কথায় আক্ষেপের সুর ছিল না। '...উনি ডায়েরি লিখতেন ; সে ডায়েরি সব এখন আমার হাতে কারণ আমি ওঁর একটা জীবনী লিখছি — যদিও সেটা আত্মজীবনী হয়েই বেরোবে।...' (সুশান্ত সোম: *ভূস্বর্গ ভয়ংকর*। পরিচ্ছেদ দুই)

এবং এই 'আত্মজীবনী' জনপ্রিয় হওয়া মানেই, স্বাধীন-লেখক হিসেবে সুশান্ত সোমের অপমৃত্যু! এই হল মহামান্য 'সৎ বিচারপতি'র অবদান তাঁর প্রিয় সেক্রেটারির জীবনে! অবশ্য সুশান্ত সোম একা নন। ফেলুদার জীবনে এ-রকম চরিত্র আগেও এসেছে। *রয়েল বেঙ্গল রহস্য* উপন্যাসে তড়িৎ সেনগুপ্ত নামে একজন তরুণ আছেন, তাঁর চাকরিটা এই সুশান্ত সোমের মতোই।

এবার আসল প্রশ্ন। (১) কাকে আমরা বেশি 'সৎ' বলব? অনুতপ্ত বিচারপতি সিদ্ধেশ্বর মল্লিক কি 'দাগী'

মগনলাল মেঘরাজ মূল্যবান শিল্পদ্রব্য দেখলেই চিনতে পারেন
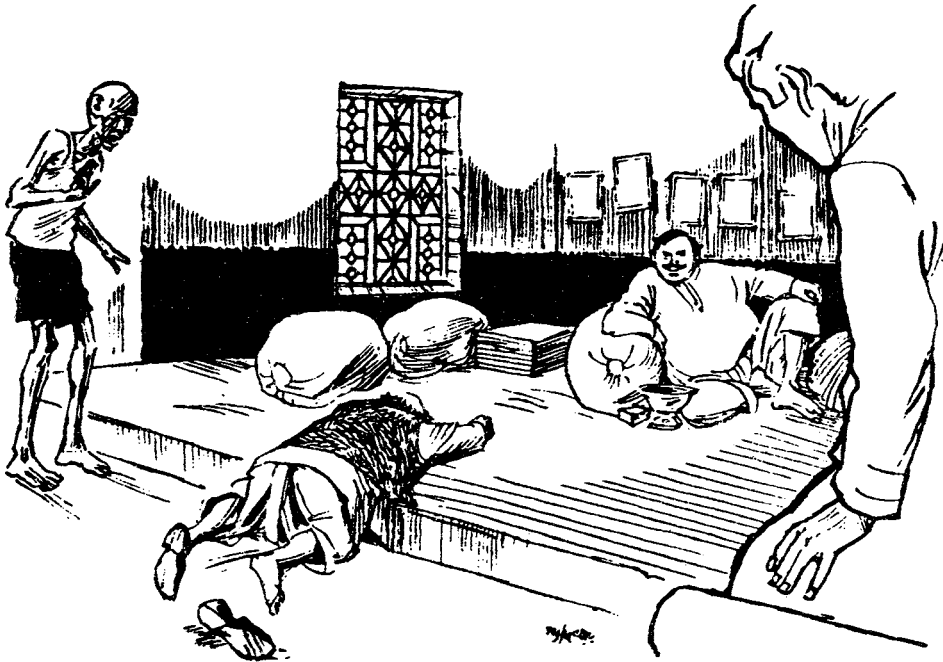
শয়তান মহাদেব চৌধুরী বা বনবিহারী সরকারের তুলনায় বেশি সৎ?

(২) যেভাবে তিনি একজন তরুণ লেখকের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, সেটা কি মানুষ খুন করার চেয়ে খুব ভালো কাজ?

(৩) সেদিক থেকে *বাদশাহী আংটি*, *জয় বাবা ফেলুনাথ* কিংবা *গোরস্থানে সাবধান*-এর দুর্ধর্ষ ভিলেনরা বেশি অসৎ? কতটা বেশি?

(৪) যেখানে গুণ না-থাকতেই মহামান্য বিচারপতি মল্লিকমশাই লেখক হিসেবে খ্যাতিমান হবার স্বপ্ন দেখছেন, সেখানে পর্যাপ্ত গুণ নিয়ে মহাদেব চৌধুরী যদি ঘড়ি চুরির অপরাধ করেন, তাহলে তুলনায় চৌধুরীর দোষটাকে বড় করে দেখা হচ্ছে কেন?

(৫) ইতিহাসে গভীর জ্ঞান নিয়ে বনবিহারী সরকার যদি আওরঙ্গজেবের আংটির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন, আর আংটিটা নিজের কাছেই রাখতে চান, তাহলে সেটা কি একজন তরুণ লেখকের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার চেয়ে বড় অপরাধ? ইতিহাসে বনবিহারীবাবুর জ্ঞানই কি মোগল-সম্রাটের আংটির প্রতি তাঁর আসক্তিকে কিছুটা জাস্টিফাই করে না? বাদশাহী আংটি হস্তগত করার পেছনে কি শুধুই বনবিহারী সরকারের লোভ কাজ করছে? না, মোগল-আমলের ভারতের প্রতি নস্টাল্‌জিয়াও?

(৬) মহাদেব চৌধুরী কবর খুঁড়ে সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন অষ্টাদশ শতকের আশ্চর্য ঘড়ি। কারণ সে-যুগের ঘড়ির বৈজ্ঞানিক মূল্য আজ অসীম। আইজাক নিউটনের সময় থেকে শুরু করে পরের ১০০ বছরে ঘড়ি-কম্পাস-দূরবীন তৈরিতে আশ্চর্য উন্নতি করেছিল ইংল্যাণ্ড। সেটা সম্ভব হয়েছিল নিউটনীয় আদর্শের প্রভাবেই। সে-যুগের ঘড়ি ৩৬৫ দিনেও এক সেকেণ্ডও স্লো যেত না। কী করে এটা সম্ভব হত? এই রহস্যের সমাধান হবে তখনই, যখন ঘড়ির একটা আসল নমুনা হাতে পাওয়া যাবে। *গোরস্থানে সাবধান* উপন্যাসে সেই সুযোগটাই পেয়েছিলেন মহাদেব চৌধুরী। সে-যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতির জ্বলজ্যান্ত নমুনা হাতে পেয়েও সেটা ছেড়ে দেওয়াটা কি উচিত হত তাঁর পক্ষে? মোটেই না। বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিউটনীয় যুগের পরবর্তী ১০০ বছরের গুরুত্বের বিষয়ে যিনি অজ্ঞ, একমাত্র তিনিই ছাড়বেন এই সুযোগ। মহাদেব চৌধুরী তেমন মূর্খ ছিলেন না! এমন 'শয়তান'-কে পছন্দ না করে উপায় কী?

ফেলুদা পুরো হাততালিটা নিয়ে বেরিয়ে যায়, তারপরও আমাদের মনে একটা চাপা আপসোস থেকে যায়। এই ভিলেনদের জন্য। যে আপসোসটাকে সিম্‌প্যাথির জাতভাই বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না।

৪

ফেলুদার জগৎটা বড়ই জটিল। অনন্য গুণীরা এখানে 'ভিলেন' হয়ে যান। আর অনেক 'অপরাধী' নিজেরাই বিশ্বাস করে তারা 'সৎ'। এই আবর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াটা মুশকিল ফেলুদার পক্ষে। কেননা, যে-কোনো গোয়েন্দাকেই অন্তত একটা 'এথিকাল কোড' মেনে চলতে হয়। সেটা হল, ঠিক যতটুকু শাস্তি যার পাওনা, তার চেয়ে বড় শাস্তি দেওয়া চলে না।

এখানেই মুশকিল। যেখানে অপরাধের গুরুত্বটাই মাপা কঠিন, সেখানে শাস্তি কতটা হবে— সেটা মাপার উপায় কী? যেমন, বনবিহারী সরকার বা মহাদেব চৌধুরীর শাস্তি কতটা হওয়া উচিত? সেটা ভাবা সহজ নয়।

যদিও কথাবার্তায় ফেলুদা এমন একটা ভাব দেখায়, যেন ভিলেনদের প্রতি তার কোনো সিম্‌প্যাথি নেই। দু'-একটা মন্তব্য উদ্ধৃত করলেই এ-বিষয়ে ফেলুদার দৃষ্টিকোণটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

(১) ফেলুদা রাতে শুতে যাবার আগে বলল, 'মল্লিকমশাইয়ের ধারণাটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করা চলে না। একজন খুনীর প্রাণদণ্ড হবে না সেটা মেনে নেওয়া কঠিন। ভদ্রলোকের আসলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তির খানিকটা গোলমাল হয়ে গেছে।...' (*ভূস্বর্গ ভয়ংকর*। পরিচ্ছেদ দুই)

(২) '...এ যুগে মানুষের দোষের শাস্তি মানুষই দিতে পারে, ভগবান নয়।' (*রয়েল বেঙ্গল রহস্য*। পরিচ্ছেদ দশ)

রাজশেখর নিয়োগী ইউরোপীয় ধারায় তৈলচিত্র আঁকায় ওস্তাদ

ফেলুদার মন্তব্য থেকে এটুকু স্পষ্ট, খুনীকে মুক্তি দেবার ভাবনাটাই তার চোখে 'চিন্তাশক্তির গোলমাল' এটা তার সচেতন মন্তব্য। কিন্তু তার অবচেতন মনও কি একই কথা বলে? তা-ই যদি হয়, তাহলে ফেলুদা নিজে সবসময় অপরাধীকে শাস্তি দেয় না কেন? ফেলুদার সব ক'টা অ্যাডভেঞ্চার মিলিয়ে আমরা এমন অপরাধী অনেক পাব, যাঁরা অপরাধ লুকিয়ে দিব্যি মাথা তুলে হেঁটে বেড়িয়েছেন। জীবদ্দশায় কোনও শাস্তিই পাননি। এই রকম কয়েকজন 'সৎ' অপরাধীর নাম বলছি। (অবশ্য কে কী অপরাধ করেছেন, সেটা এখানে বাদ রইল। সেটা জানার জন্য তো আসল বইগুলোই আছে।)

১। জর্জ হিগিন্‌স্ (*ডাঃ মুনসীর ডায়রি*)।
২। মহেশ চৌধুরী (*ছিন্নমস্তার অভিশাপ*)।
৩। সূরয সিং (*গোলাপী মুক্তা রহস্য*)।
৪। নীহাররঞ্জন দত্ত (*গোলকধাম রহস্য*)।
৫। মহীতোষ সিংহরায় (*রয়েল বেঙ্গল রহস্য*)।
৬। রাজেন মুনসী (*ডাঃ মুনসীর ডায়রি*)।
৭। রঞ্জন কে. মজুমদার (*লণ্ডনে ফেলুদা*)।
৮। মিস্টার হিঙ্গোরানি (*নয়ন রহস্য*)।
৯। নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (*গোরস্থানে সাবধান*)।

এঁদের সমস্ত অপরাধের কথাই ফেলুদা জানতে পেরেছে। সত্যি বলতে কী, এই ন'জনের অন্যায় ধরা পড়েছে ফেলুদারই গোয়েন্দাগিরির দৌলতে। সুতরাং 'শাস্তি হবে না সেটা মেনে নেওয়া কঠিন'— মুখে এ-কথা বললেও, কাজের বেলায় ফেলুদা যে সব সময় এই 'নীতি' মেনে চলে না, সেটা প্রমাণ করেন এই ন'জন। ফেলুদার ন্যায়-অন্যায়ের বোধটা এত সাদাসিধে নয়।

ওপরের ন'জন সোজাসুজি অপরাধী। কিন্তু এঁদের ঘিরে আছেন আরো কয়েকজন, যাঁরা নীরব দর্শক। কখনো অপরাধের সহায়ক। প্রতিবাদ না-করে যদি কেউ নীরবে অপরাধকে মেনে নেন, তাহলে তাঁকেও ক্রিমিন্যাল বলাই উচিত। এ-রকম চরিত্রও অনেক আছেন ফেলুদার অ্যাডভেঞ্চারে। ন'জনের শুধু নামটা মনে করিয়ে দিই (কাজটা নয়)।

১। অখিল চক্রবর্তী (*ছিন্নমস্তার অভিশাপ*)।
২। শিবাজী হুবলিকার (*নয়ন রহস্য*)।
৩। সূরযলাল মেঘরাজ (*জয় বাবা ফেলুনাথ*)।

৪। গণেশ গুহ (*বাদশাহী আংটি*)।

৫। শশাঙ্কমোহন সান্যাল (*রয়েল বেঙ্গল রহস্য*)।

৬। হরিনাথ মজুমদার (*ভূস্বর্গ ভয়ংকর*)।

৭। 'নাইফ্‌থ্রোয়ার' অর্জুন (*জয় বাবা ফেলুনাথ*)।

৮। গোকুল (*ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা*)।

৯। উমাশঙ্কর পুরী (*এবার কান্ড কেদারনাথে*)।

অপরাধের ঘটনায় এঁদের জড়িয়ে পড়ার কারণ, এঁরা সবাই একজন করে ধনী লোকের আশ্রিত। সুতরাং, যদি প্রতিবাদ করতে যান, তাহলে অবলম্বনটা খোয়াতে হয়। আজকের দিনে হুট্‌ করে নতুন আশ্রয় খুঁজে নেওয়াটা সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়েই এঁরা আশ্রয়দাতার অপরাধটা গোপন রাখতে সাহায্য করেন। এঁরা নিরুপায়। ফেলুদা সেটা বোঝে। তাই এঁদের শাস্তির কথাও তোলে না। কখনো কখনো অপরাধীর দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাটা দেখতে জানেন শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা। ফেলুদাও তা-ই। শাস্তি-না-পাওয়া নামের এই প্রাচুর্য্যই তার প্রমাণ।

ফেলুদার চোখ এবং মস্তিষ্ক দিয়ে যে-জগৎটাকে

বনবিহারী সরকার

সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে পণ্ডিত

আমরা চিনেছি, সেখানে মন্দকেও ভালো লাগার যথেষ্ট কারণ থাকে — কখনো কখনো সেই মন্দ লোক অনন্য গুণের অধিকারী হয় বলে। আবার সুসভ্য সৎ

কালো চশমা-পরা নীহার দত্ত
সার্থক বিজ্ঞানী

নাগরিককে শাস্তি দেবার কারণও থাকে— তাঁর 'অনিচ্ছাকৃত' মারাত্মক অপরাধের জন্য। তাই ফেলুদার জগতে একবার ঢুকে পড়লে, ভালো-মন্দের বিচার করাটা আর সহজ নয়। এখানে ভালো-মন্দের কোনো ধরা-বাঁধা 'ফর্মুলা' নেই। ফলে ফেলুদার জগৎ আর গল্পের মনগড়া জগৎ থাকে না। হয়ে ওঠে বাস্তবের সার্থক প্রতিফলন।

সুপারম্যান না-হয়ে ফেলুদা রক্তমাংসের মানুষ হয়ে ওঠে তখনই, যখন দেখি সে-ও জীবনের প্রতিটা ঘটনায় নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী চলতে পারে না। গোস্ট-রাইটারদের সম্পর্কে ফেলুদার মনোভাব দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যায়। (যাঁরা বেনামে অন্যের হয়ে বই লিখে দেন, তাঁদেরই বলে গোস্ট-রাইটার।)

রয়েল বেঙ্গল রহস্য উপন্যাসে এরকমই একজন গোস্ট-রাইটার সম্পর্কে ফেলুদা ওর এক রাইভ্যালকে বলেছিল '...আপনি ভালো মাইনে দিতেন, তাকে আরামে রেখেছিলেন, তোয়াজে রেখেছিলেন এ সবই ঠিক। কিন্তু একজন সত্যিকারের গুণী স্রষ্টার পক্ষে ওগুলোই যথেষ্ট নয় সে সবচেয়ে বেশি যেটা আশা করে সেটা হল তার গুণের আদর।...'

এই বিশ্বাস ব্যক্ত করার কয়েক বছরের মধ্যে, ফেলুদা তার জীবনের দ্বিতীয় গোস্ট-রাইটারের দেখা পায় কাশ্মীরে। এঁর নাম সুশান্ত সোম, যাঁর কথা একটু আগেই বলেছি। অথচ সুশান্তবাবুর কষ্ট লাঘব করার জন্য কিছুই করতে পারেনি ফেলুদা। কারণ, কেউ তাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। সুতরাং, বাস্তব জীবনে বিশ্বাসের প্রয়োগ কতটা সম্ভব, সেই নিয়ে ফেলুদার মনেও দ্বন্দ্ব আছে— সমস্ত আধুনিক মানুষের মতোই!

৫

এবার মূল প্রশ্ন। ফেলুদার 'অ্যাডান্ট' পৃথিবীটা কেমন?

এ-এক অদ্ভুত বিভ্রান্তিকর জগৎ! একদিকে অপরাধীদের মধ্যে গুণের বর্ণচ্ছটা! অন্যদিকে সভ্য-সামাজিক মানুষদের মধ্যে গোপন অপরাধের ঢল নেমেছে। কী অসহনীয় এই আয়রনি!

নিজের কালচার অনুসারে ফেলুদা বিশ্বাস করে, মস্তিষ্কের ক্ষমতাই মানুষকে মুক্তি দেয়। মস্তিষ্কের চর্চা ও উন্নতির বিষয়ে তার আগ্রহের কোনো শেষ নেই। তোপসের ভাষায়, 'ফেলুদার তিনটে স্বাভাবিক অস্ত্র হল ওর মস্তিষ্ক, স্নায়ু আর মাংসপেশী। এর মধ্যে প্রথমটা অবিশ্যি আসল।...' (অর্থাৎ, মস্তিষ্ককেই ফেলুদার আসল শক্তি বলে তোপ্‌সেও মেনে নিয়েছে।)

এ-রকম কথা প্রায়ই বলতে শোনা যায় ফেলুদাকে, 'রহস্য যখন জাল বিস্তার করে, তখন এইভাবেই করে লালমোহনবাবু। এ না হলে জাত-রহস্য হয় না। আর তা না হলে ফেলু মিত্তিরের মস্তিষ্ক পুষ্টি হয় না।...' (*বোম্বাইয়ের বোম্বেটে* । পরিচ্ছেদ সাত)

এখানে 'মস্তিষ্কপুষ্টি' কথাটা জরুরি, কারণ সেটাই জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য। আর ঠিক এই পয়েন্টেই সবচেয়ে বড় আঘাতটা পেয়েছে ফেলুদা। পেশাদারী জীবনে ফেলুদা বার বার দেখেছে— বিরল মস্তিষ্ক-সম্পন্ন মানুষরা কীভাবে বিপথগামী হন! তা সত্ত্বেও আজও ফেলুদার কমিট্‌মেন্ট রয়ে গেছে উন্নত মস্তিষ্কের প্রতিই। তাই বিরল জ্ঞানীদের ওপর থেকে তার বিশ্বাস পুরোপুরি চলে যায়নি। যদি যেত, তাহলে বৈজ্ঞানিক নীহাররঞ্জন দত্তকে সে এমন মুখ বুজে ক্ষমা করত না। অস্বীকার করার উপায় নেই, উন্নত মস্তিষ্কের প্রতি ফেলুদার পক্ষপাতেরই ব্যঞ্জনা এই ক্ষমা। একজন বৈজ্ঞানিককে ক্ষমা করার পেছনে ফেলুদার অবচেতন মনে কাজ করেছে নিজের সম্পর্কে একটা বিশেষ ধারণা, যে ধারণা সে একবার নিজের মুখেই প্রকাশ করে ফেলেছিল!

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'ধরে নিন আমিও একজন বৈজ্ঞানিক, আমিও গবেষণা করছি, আর সেই কারণে আমিও রিস্‌ক নিচ্ছি।' (*সোনার কেল্লা*। পরিচ্ছেদ ছয়)

হয়তো আজও ফেলুদা আশা রাখে— সাময়িকভাবে বিপথগামী হলেও, শেষ অবধি 'সংশোধিত' হবার দিকেই বুদ্ধিমান মানুষের ঝোঁক বেশি। আর সেই 'সংশোধন' ঘটবে তাদের সহজাত বুদ্ধির জোরেই। হয়তো বনবিহারীবাবু একদিন আওরঙ্গজেবের আমলের আংটি কব্জা করার চেষ্টা মুলতুবি রেখে, লাইব্রেরিতেই ইতিহাস-চর্চা করবেন অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপির ওপর ঝুঁকে পড়ে। সে সম্ভবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তাই তো এই লাইনগুলো আমরা পেয়েছি ফেলুদারই একটা অ্যাডভেঞ্চার-উপন্যাসে

'...কলকাতায় আমাদের বাড়িতে বসে আমি আর ফেলুদা অনেক সময় আমাদের পুরোন অ্যাডভেঞ্চারগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, বিশেষ করে তাদের সম্বন্ধে, যাদের শয়তানি বুদ্ধি ফেলুদাকেও মাঝে মাঝে প্যাঁচে ফেলে দিয়েছিল। লখ্‌নৌ-এর বনবিহারী সরকার, কৈলাসের মূর্তি চোর, সোনার কেল্লার বর্মণ আর মন্দার বোস, মিঃ গোরে, কাশীর মগনলাল মেঘরাজ — এরা সব কোথায়? কী করছে? ভোল পালটে সৎপথে চলছে?...' (*যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে* । পরিচ্ছেদ আট)

এই উদ্ধৃতি একটা কথাই প্রমাণ করছে। এই বুদ্ধিমান দুশমনদের যে ভোল পালটে সৎ পথে চলার সম্ভাবনা আছে, সেই আশা ফেলুদা পুরোপুরি ত্যাগ করেনি।

তবু একটা সংশয় কাজ করে এই আশাবাদের সঙ্গে। সত্যিই কি এঁরা সংশোধিত হবেন? সেটা আশা করা কি খুব বাস্তব বুদ্ধির পরিচয়? তাই ওঁদের নিয়ে ফেলুদার যেটুকু আশা, সেটা বিষাদেই ডুবে থাকে!

সভ্য নাগরিকদের মুখোমুখি হয়েও, এই বিষাদটুকু সে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। ফেলুদা সেখানেও দেখতে পায়— কত মানুষ সফলভাবে অপরাধ লুকিয়ে, খোশমেজাজে আছেন। সমাজে তাঁদের সম্মানের এতটুকু ঘাটতি নেই!

শশধর বসু সুগন্ধি-বিশেষজ্ঞ

ফেলুদাকে বাস্তব-জগতে এভাবে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ওর ভিলেনরাই। লালমোহন গাঙ্গুলি (জটায়ু) কিংবা তোপ্‌সে নয়। তাই ওর জীবনে ভিলেনরা এত জরুরি।

শাস্তি-পাওয়া আর শাস্তি-এড়ানো — দুই ঘরানার ভিলেনই।

এই দু'য়ে মিলেই ফেলুদার অ্যাডাল্ট-পৃথিবী। তার কাঁধে-চেপে-বসে-থাকা এই পৃথিবীকে সে ভুলেই থাকতে চায়। তাই তার জীবনে জটায়ু এত জরুরি।

এখানেই আমরা আরো একটা জরুরি প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাচ্ছি। জটায়ুর সঙ্গে ফেলুদার এত বন্ধুত্ব কেন? কারণ, বনবিহারীবাবুর মতো ব্যর্থ পাণ্ডিত্য

জটায়ুর নেই। আবার 'সৎ' বিচারপতি সিদ্ধেশ্বরবাবুর মতো গোপন অপরাধও নেই। অর্থাৎ, ফেলুদার অ্যাডাল্ট-পৃথিবীতে জটায়ু কেউ নন। আর এই পৃথিবীর লোকের ব্যাপারেই ফেলুদা সন্দিহান। তাই ওর একমাত্র বন্ধু লালমোহনবাবু।

কিন্তু যেই ফেলুদা ওই অ্যাডাল্ট জগতে ঢুকে পড়ে, তখন সে আবার একলা হয়ে যায়। তখনই সে নীল নোটবুক নিয়ে, তক্তাপোষে উপুড় হয়ে পড়ে। ভাবে। আর 'অ্যাডাল্ট' চরিত্রদের সম্পর্কে নোট্ নেয়।

তখন জটায়ুরও কথা বলা বারণ। লালমোহনবাবুকে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে থামিয়ে দেয় তোপ্সে। অ্যাডাল্ট পৃথিবীতে ফেলুদা একাই থাকতে চায়।

ফেলুদা ওর অ্যাডাল্ট জগৎ নিয়ে লেখালেখি করতে চায় তোপ্সে ঘুমিয়ে পড়ার পরই। তাই এ-রকম ঘটনা আমরা অনেক পাই, ঠিক যেমন লেখা হয়েছিল *বোম্বাইয়ের বোম্বেটে* উপন্যাসে '...জটায়ু চলে যাবার মিনিট দশেকের মধ্যে শুয়ে পড়লাম। ফেলুদা যে এখন শোবে না সেটা জানি। ওর নোটবুকটা খাটের পাশেই টেবিলের উপর রাখা রয়েছে, সারাদিন খেপে খেপে তাতে অনেক কিছু লেখা হয়েছে, হয়তো আরো কিছু লেখা হবে। আমি অনেকদিন চেষ্টা করেছি রাত্রে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে খেয়াল রাখতে ঠিক কোন সময় ঘুমটা আসে। '

কিংবা, *গ্যাংটকে গণ্ডগোল* উপন্যাসে '...ঘুম আসার আগে পর্যন্ত মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখেছি ফেলুদা তার খাতায় নোট করে চলেছে।...'

সোনার কেল্লা-তেও সেই একই ব্যাপার '...কাল মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল একবার, তখন সময় কটা জানি না, দেখলাম ফেলুদা বেড-সাইড ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে তার নীল খাতায় কী জানি লিখছে। ও কত রাত পর্যন্ত কাজ করেছিল জানি না।...'

অর্থাৎ, তোপ্সে যখন ঘুমের দেশে, তখনই ফেলুদা একলা ঢুকে পড়ে তার অ্যাডাল্ট জগতে!

নরেশ পাকড়াশী

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে আগ্রহী

ফেলুদাদা

অমিতাভ চৌধুরী

ফেলুদাদা ফেল করে না
গান গেয়ে যায় ভয়রোঁ,
ঠিক যেন সে হোম্‌স্‌ সাহেব
কিংবা আরকুল পয়রো।

সিগারেটে টান দিয়ে জোর
রহস্যকে টেনে বার
করতে জানে, ধরতে জানে
নিখুঁত খুনি বারম্বার।

কাণ্ড যত কাঠমাণ্ডুর
ফাঁস করে দেয় নিমেষে,
গ্যাংটকে যা গণ্ডগোল
থামিয়ে দেয় সে এসে।

কাশীধামে চুরি হল
বোসপুকুরে হঠাৎ খুন,
সব কিনারা করে ফেলে
ফেলুদাদার এমন গুণ।

সঙ্গে থাকে তোপ্‌সে ভায়া,
লালমোহন গাঙ্গুলি
খুব সহজে সব সমাধান
খেলছে যেন ডাংগুলি।

সিনেমাতে দেখি তাঁকে —
চাটুজ্যে বা কাপুর,
বাজিমাতে এক নম্বর —
হাওড়া থেকে হাপুর।

তিরিশ বছর ধরে দাদার
কাণ্ড দেখে গেলাম
ফেলুদাদা আসল দাদা,
সেলাম দাদা সেলাম।

রহস্যের সুর, সুরের রহস্য

অতনু চক্রবর্তী

গোয়েন্দা ফেলু মিত্তির, তাঁর সহকারী তপেশরঞ্জনকে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে, যাবে রাজস্থানে। এই যাওয়াটা নিছকই বেড়াতে নয়, বরং মুকুল এবং সোনার কেল্লা নিয়ে বেশ একটা গোলমেলে রহস্যের খোঁজে চলেছে দু'জনে। ফলে ফেলুদার মাথায় প্ল্যান-প্রোগ্রাম ঘুরপাক খাবার কথা, তোপ্‌সের হবার কথা খানিকটা উত্তেজিত। তবে তাদের মনের ভাব তেমন বোঝা যায় না। উপরন্তু 'সোনার কেল্লা' ছবির ওই দৃশ্যে আনন্দের একটি সুরও ভেসে আসে কানে। স্টেশনের লাউডস্পিকারে ঘোষণা এবং অন্যান্য শব্দের ওপর এসে পড়ে ওই মিউজিক। বেহালা এবং চেলোর মতো ছড়-টানা বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সরোদ-পিয়ানোতে বাজানো ওই সুরটির মধ্যে এক ধরণের খুশির আভাস আছে। ফুর্তির মেজাজ আনে ওই সঙ্গীত, সেই সঙ্গে মনে আনে গতি বা চলার ভাবনা। ফলে ছবির দর্শক — যারা গোয়েন্দা ফেলুদার এই যাত্রার সঙ্গী হয়, তাদের উপরও উৎকণ্ঠা বা উত্তেজনার সরাসরি কোনও চাপ সৃষ্টি হয় না। ওই সঙ্গীতের মাঝখানে বাঁশির সুরটি একটু বাঁকা পথে গিয়ে আশংকার মতো বাজলেও, মূল সুরে অস্বস্তিকর ভাবনা বা উদ্বেগের সংকেত মেলে না। ওই যাত্রায় লালমোহন গাঙ্গুলি সঙ্গী হবার পর এই মজার পরিবেশটি আরও জমে ওঠে। হিউমার হয়ে ওঠে সংলাপের সঙ্গী; অ্যাকশনের সঙ্গী হয়ে যায় রিলিফ।

মূল যে গল্পটি থেকে সিনেমা তৈরি হয়, সেটি পড়বার সময় মনে মনে অনেক কিছুই কল্পনা করে নেওয়া যায়। গল্পের বর্ণনার সঙ্গে তাল রেখে, নিজের ভাবনা যোগ করে, খুশি-মাফিক এঁকে নেওয়া যায় ছবি। মনের মতো করে চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে, কল্পনার ডানা মেলে এগিয়ে চলা যায় বইয়ের পাতার সঙ্গে। কিন্তু মাধ্যমটি যখন বদলে যায়, সাহিত্যের বদলে হয় সিনেমা, তখন ভাবনার ধারাটাও খানিকটা পাল্টে নিতে হয়। সিনেমার প্রয়োজনে মূল গল্পকে যেমন পাল্টে নেন চিত্রপরিচালক।

ফেলুদাকে নিয়ে তোলা সত্যজিৎ রায়ের দুটি সিনেমার সঙ্গে মূল গল্প মেলালেই, এই পরিবর্তনটা স্পষ্ট হবে। তাছাড়া সিনেমায় ওই ভাবনা কাজটার অনেকটাই সেরে ফেলেন চিত্রপরিচালক। গল্পের পাত্র-পাত্রী কেমন দেখতে, ঘটনা যেখানে ঘটছে সেখানকার বর্ণনাও পেয়ে দেখবার সুযোগ থাকে সিনেমায়। ফলে চোখে দেখা দৃশ্যকে বিচার-বিশ্লেষণের দিকে মন দিতে হয় বেশি। আর চোখের সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কান। ছবির পাত্র-পাত্রীদের অভিনয়, গতিবিধি, প্রকৃতির দৃশ্যপট, — এ-সব চোখে পড়ার পাশাপাশি, কানে আসে কথাবার্তা, সেই সঙ্গে শোনা যায় শব্দ আর সঙ্গীত। কাশীর গলিতে কাকের ডাক, জয়পুর স্টেশনে ময়ূরের ডাক থেকে শুরু করে মোটরগাড়ি, ট্রেন বা বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার শব্দ যেমন কানে আসে, তেমনই আসে গান এবং বাজনাও। শব্দের মতোই গানবাজনা দিয়ে অনেক জরুরি কাজ সেরে নেন সিনেমার পরিচালক। চলমান দৃশ্যের ফাঁক ভরানোর কাজে যেমন আসে সঙ্গীত, তেমনিই কাজে লাগানো হয় ফাঁক তৈরি করে নেবার জন্যও।

যেমন ধরা যাক, 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবিতে মছলিবাবাকে ঘিরে অনেকক্ষণ চলেছে ভজন গান। এর আগেই ছবিতে গড়ে উঠেছে টান টান উত্তেজনার পরিবেশ। তার মধ্যে এই গান তৈরি করে দেয় খানিকটা রিলিফ; যেমন ঘরের ঘেরাটোপ থেকে খোলা আকাশের নীচে এসে খানিকটা স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়। এই দৃশ্যে প্রক্রিয়াটা চলতে থাকে আড়াল থেকে। গান সেই

আড়ালটা গড়ে দিতে সাহায্য করে। মছলিবাবার বেশভূষা বা সাধু-কান্ড যেমন ভনিতা, আড়ালে চলে অন্য কর্মকান্ড; তেমনি গানটিও একটি মোড়ক — তার ফাঁকে ফাঁকে দৃশ্যের পর দৃশ্য জুড়ে পরিচালক তৈরি করেন অন্য নাটক।

চরিত্রের বিশেষ কোনও ভাবনা প্রকাশ করতেও, সঙ্গীতকে কাজে লাগানো হয়। সাহিত্যে যেমন বলা সম্ভব — গল্পের পাত্র-পাত্রীদের সব অনুভূতি বা উপলব্ধি, সিনেমায় তেমন করে বলা যায় না। সেই না-বলা ভাবনা, আশংকা, ভয় বা দ্বন্দ্ব — হাবভাবে যতটা ফুটে ওঠে, তার সঙ্গে সঙ্গীতকে মিলিয়ে দেওয়া হয় বাকি ফাঁকটুকু ভরাতে। এই সুরই দর্শকের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

যেমন, ঝর্ণার মতো উজ্জ্বল পিয়ানোর সুর, বা সেতারে মনে-দোলা-লাগানো ঝংকার শুনলে খুশির ভাব আসে সিনেমার দর্শকদের মনে। আবার নীচের স্কেলে বা খাদের দিকে ছড়-টানা বাদ্যযন্ত্রে সুর তুললে গম্ভীর, চাপা উত্তেজনা বা ভয়ের ভাবনা আসে। চড়া পর্দায় তীক্ষ্ণ সুরে আর্তনাদের মতো বাঁশি অথবা বেহালাজাতীয়

ইটালিতে তৈরি পুরনো বেহালা-হাতে ফেলুদা

যন্ত্রে সুর তুলে চাপা কান্না, বিষণ্ণতা, হাহাকারকে ধরা যায়।

'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবিতে ফেলুদা যখন মছলিবাবার ডেরায় হানা দিচ্ছে, তখন প্রায়-অন্ধকার সিঁড়ি এবং ফেলুদার অনুসন্ধানী চলা আমাদের চোখে পড়ছে। কিন্তু ফেলুদার কৌতূহলের তীব্রতা, সতর্কতার মাত্রা, দ্বন্দ্ব বা সংশয় মিলিয়ে যে মানসিক অবস্থা—তা তো ফেলুদা কারও কাছে কথায় প্রকাশ করতে পারছে না। দর্শক এগুলো নিজের মনে তৈরি করে নিচ্ছে। তার জন্য ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ, গতিবিধি, শব্দের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গীত জুড়ে দিয়ে, ভাবনাটাকে জোরালো করে তোলা হচ্ছে। ফলে চোখ আর কান দুই-ই থাকছে টানটান।

আবার একই সঙ্গীত, কখনও বা একটু অদল-বদল করে, ছবির নানা অংশে ব্যবহার করে, একই ভাবনার পরিস্থিতি তৈরি করা হয়। আগের কোনও দৃশ্য বা ঘটনার স্মৃতিও উসকে দেয় এ ধরণের সঙ্গীতের প্রয়োগ।

যখন ফেলুদা রহস্যভেদ করবার জন্য পাওয়া সূত্রগুলো নিয়ে ভাবনায় মগ্ন, যুক্তি-তথ্য-বিশ্লেষণের এই ভাবনাটা হচ্ছে তার মগজে। ফেলুদাকে হয়তো দেখা যাচ্ছে গালে হাত দিয়ে চিন্তার ভঙ্গীতে, বা অস্থির পায়চারি করতে কিংবা কিছুটা আপন মনেই কথা বলতে। তখন আবহে পিয়ানোর টুংটাং শব্দ শোনা যাচ্ছে। থেমে-থেমে। বাঁধা কোনও সুর নয়; খানিকটা অন্যমনস্কতায় পিয়ানোর চাবিতে আঙুল চালানো যেন। যেন ঠিক 'ঠিক সুরটি' খুঁজে চলেছে বাদক। ভাইব্রাফোন-পিয়ানোতে এমন আলতো অবিন্যস্ত সুর,আর সেই সঙ্গে কশাঘাতের মতো সিম্বেলিন্ বা ব্রাসের শব্দ — কানে এলেই দর্শকদের মনে হয়, ফেলুদার মগজে নানা গভীর ভাবনার জন্ম নিচ্ছে। এই প্রয়োগশৈলি আরও ব্যঞ্জনা পায় — যখন একইসঙ্গে দুটি চরিত্রের মধ্যে এই ভাবনার খেলাটা চলতে থাকে। তখন সঙ্গীত সাংকেতিক হয়ে ওঠে।

যেমন, 'সোনার কেল্লা' ছবিতে মুকুল যখন ভাবছে অর্থাৎ নিজের মনের গভীরে মুকুল উঁকি দিচ্ছে, স্মৃতি থেকে আঁকা ছবিকে বাস্তবে খুঁজছে। আবার খুঁজে না-পাবার অস্থিরতায় মস্তিষ্কে এই তোলপাড় যখন ঘটে তখন শোনা যায় এমন সঙ্গীত। কখনও কখনও এই সঙ্গীতে রেসোন্যান্স প্রয়োগ করে রহস্যময় করে তোলা হয়। ফেলুদাও মস্তিষ্কের উন্নত স্তরে খুঁজে বেড়ায় রহস্য সমাধানের সূত্র।

'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবিতেও এই সমান্তরাল ভাবনার প্রক্রিয়াটি ঘটে। একদিকে ক্যাপ্টেন স্পার্কের গল্পের ও স্বপ্নের জগৎ, আর অন্যদিকে ফেলুদার বুদ্ধি-যুক্তির জগৎ। যতক্ষণ এই দু'জন আলাদা জগতে থাকে, যতক্ষণ একজনের সঙ্গে অন্যের কথাবার্তা হয়নি, ততক্ষণই সঙ্গীতকে ব্যবহার করা হয়। যখনই ক্যাপ্টেন স্পার্ক এবং ক্যাপ্টেন ফেলুর বন্ধুত্ব হয়ে যায়, তখন সংলাপ আর অভিব্যাক্তিই হয়ে ওঠে প্রধান ভাষা তখন আর সংগীত নেই। কোনও কথা বা কাজের ওপর জোর বা গুরুত্ব দিতেও সঙ্গীতকে ব্যবহার করা হয়। তবে এই কাজগুলো সঙ্গীত করে, দৃশ্যের সঙ্গে মিলে থেকেই। চোখের সঙ্গে কানকেও সজাগ করে দৃশ্যের বক্তব্যটি বুঝিয়ে দেবার বা আন্ডারলাইন করে দেবার কাজটি সুকৌশলে জেনে নিতেই এই সঙ্গীতের ব্যবহার ।

এই ব্যবহার সিনেমায় দেখা যায় ছবির একেবারে গোড়া থেকেই। ছবির শুরুতে টাইটেল-কার্ড অর্থাৎ ছবি তৈরিতে যাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, তাদের নাম যখন পর্দায় পড়ে, তখন অন্য কিছু দেখবার মতো না-থাকলেও, সঙ্গীত থাকেই। অন্তত সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে এর ব্যতিক্রম হয়নি। ফেলুদার দুটি ছবিতেও তাই টাইটেল-মিউজিকের খুবই কার্যকরী ব্যবহার হয়েছে। ছবির শুরুতে এই যন্ত্রসঙ্গীতের ভেতর দিয়ে ছবির মেজাজের বা ভাবনার একটা প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায়।

'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবির পরিচয়লিপি পর্দায় পড়েছে কয়েকটি বৃত্তের ভেতর। এই বৃত্ত শেষের দিকে কমতে কমতে চারটি, তিনটি, দুটি হয়ে যায়। শেষে একটি মাত্র বৃত্তের ভেতর এসে পড়ে কাহিনী, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত-রচনা এবং পরিচালনা যাঁর, তাঁর নাম। এই-সব নাম চোখে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বেজে যায় সঙ্গীত। বন্দুকের গুলির শব্দ দিয়ে এই দৃশ্যের শুরু। পর্দায়

গোলাকৃতি ছকগুলি লক্ষ্য বা টার্গেট। বন্দুকের শব্দের উদ্দেশ্য আসল লক্ষ্যটিকে ভেদ করা। গোয়েন্দা যেমন করে থাকে, সন্দেহজনক কয়েকজনকে সনাক্ত করে, ক্লু জেনে, অ্যালিবাই দেখে। তারপর এলিমিনেশনের সূত্র ধরে সে এগোয়। কম সন্দেহজনকদের একে একে বাদ দিতে থাকে। তারপর শেষতম ব্যক্তিকে দাঁড় করায় অভিযুক্তের কাঠগড়ায়। নাম লেখা বৃত্তগুলো ওভাবেই একে একে উধাও করা হয়েছে। বন্দুকের শব্দটি সঠিক লক্ষ্যভেদের কথা মনে করিয়ে দেয়। পর্দায় নাম পড়ছে তখন, বেহালায় ছড়ের ঘর্ষনে একটু শিরশির শব্দ এবং গিটারের তার প্লাক করে সুরের টোকা, বাঁশিতে 'র্সণ ধপ । ধণ ঋ র্স' সুরে ভোরের আভাস আসে। এরপরই বেহালা-চেলো মিলিয়ে বেজে চলে জোভিয়াল মিউজিক্যাল পীস, চলনটা অনকেটা এরকম ঃ (ডি-ন্যাচারাল স্কেলে) যে-কোনও বাদ্যযন্ত্র বাজালে সুরের কাঠামো আসবে—

প প ০ গম | প প ০ মপ | ধ ধ ০ পধ।

ণ ণ ০ ধণ | র্স র্ম ০ ধনি | র্স ধ ০ ধপ।

স ম ০ ধপ | স ম ০ ০ | স গ ম ০।

ছন্দে ছন্দে এগিয়ে যাওয়া বেশ-একটা ফুর্তির মেজাজ রয়েছে এই সুরে। এটাই সত্যসন্ধানের দিকে যাবার থিম মিউজিক। কাশীর রাস্তাতেও এই মিউজিকই অন্য চালে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে উত্তেজনা, হালকা ভয় বা টেনশনের কোনও চিহ্ন মেলে না। তবে এর পরে টাইটেলের শেষদিকে অর্গান-পিয়ানো-চেলো মিলে একধরণের চাপা সঙ্গীত— খানিকটা রেজোন্যান্স নিয়ে আসে। তখন আর মিউজিকটি সহজ থাকে না, মিশ্র জটিলতার চেহারা পায়।

'সোনার কেল্লা' ছবির টাইটেল-মিউজিক আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এসেছে। বিষয় হিসেবে ছবিতে চেতন-অবচেতন মনের যোগসূত্র খোঁজবার ব্যাপার রয়েছে বলেই, রহস্যময়তা প্রশ্রয় পেয়েছে এই সঙ্গীতে। পর্দায় যখন পরিচিতি আর মরুর কেল্লার ছবি হাতে আঁকা তখন কানে আসে ভাইব্রাফোন এবং পিয়ানোর একটি একটি করে সুর, পেছনে ড্রাম বীটের মতো শব্দ— যা সরাসরি কানে বেঁধে না, ঢেউয়ের মতো বইতে থাকে। তবে এরপরই ভেসে আসে বেহালা সরোদের গতিময় সঙ্গীত, যাকে 'জয়বাবা ফেলুনাথ' ছবির টাইটেলের মূল বাজনাটির আত্মীয় বলা যায়।

রহস্যময়তা থেকে অভিযান— এরপরই সঙ্গীতে আসে লোকশনের পরিচিতি। মূল পটভূমি যেহেতু রাজস্থান, অতএব, রাজস্থানের লোকসঙ্গীতের সঙ্গে তাল রাখার জন্য বাজানো 'তিরি কিটি তিরি কিটি' ধ্বনি ক্রমশ তীব্র হতে থাকে। শ্লেটের টুকরো বাজিয়ে অনেকটা এমনই শব্দ বা তাল সহযোগে গান শুনিয়ে ভিক্ষে চাইতে শোনা যায় অনেক জায়গাতেই। রাজস্থানী কালচারের সঙ্গে মিশে আছে এই শব্দ, টাইটেলে এই শব্দের ক্রমাগত প্রয়োগ দর্শককে নিয়ে যায় মূল পটভূমিতে। পরের দিকে যখন রাজস্থানী লোকসঙ্গীতের দৃশ্য ছবিতে আসে, তখন স্পষ্ট হয় টাইটেলের ওই শব্দের উৎস কোথায়।

টাইটেল-মিউজিক বা সাউন্ডট্রাকে সাসপেন্স-মিউজিকের আড়ম্বর না-রাখলেও, গোয়েন্দা-সিনেমার আঙ্গিক বা প্রয়োজনীয় এলিমেন্টের অনটন রাখেননি পরিচালক। মিউজিকের মতোই চরিত্র-গঠন, চিত্রনাট্য, সিচ্যুয়েশন নির্মানের ভঙ্গীতে রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। ট্রিটমেন্টে মেলে এই ভিন্ন স্বাদ। রহস্য-সংঘাত-খুন-ষড়যন্ত্র— সবই আছে ফেলুদার গল্পে বা সিনেমায়। কিন্তু চাপা টেনশন-ভয়ের আবহে ব্যাপারগুলো জাহির করা হয়নি। তাই 'সোনার কেল্লা'র ভিলেন চরিত্ররা সেই অর্থে শয়তান হয়ে ওঠে না, দুষ্টু লোক হয়েই থেকে যায়। পরিচালক তাদের পেশাদার কিডন্যাপার, খুনী বা কুচক্রী করে তোলেননি। খানিকটা অ্যামেচার করেই রেখেছেন। ফলে অ্যাডভেঞ্চারের মেজাজটি প্রধান্য পায়। সোনার কেল্লার কাছাকাছি পৌঁছেও দেখা যায় ভিলেন গাড়ির ভেতর ঘুমিয়ে পড়ে। অ্যাডভেঞ্চারের প্রাধান্য দেবার ফলেই এমন ঘটে।

তুলনায় 'জয়বাবা ফেলুনাথ'-এর মগনলাল মেঘরাজ পেশাদার ক্রিমিন্যাল সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গল্পের নিউক্লিয়াস গনেশ মূর্তিতেই এমন একটা ফাঁকি রাখা

হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত গোটা ব্যাপারটাই হয়ে ওঠে মজার রহস্য। মগনলাল কাজেকর্মে পেশাদার হলেও, তার আচরণের মধ্যেও রাখা হয়েছে মজা পাবার মতো উপকরণ। গোটা ছবিতেই উপস্থিত অন্তর্লীন এই মেজাজটি বোঝাবার পক্ষে সবচেয়ে ভালো উদাহরণ ছুরি-খেলার পর্বটি।

মগনলালের ঘরে ফেলুদা অ্যাণ্ড কোম্পানিকে শাসানো হচ্ছে। বিরুদ্ধাচরণ করলেই শাস্তি, এমন ঘোষণা রাখতে গুলি ছুঁড়ে ভাঙতে হলো দামী ফুলদানি। এই ভয় দেখানোরই আরও বড় প্রক্রিয়া — লালমোহনবাবুকে ফ্রেমে দাঁড় করিয়ে, ছুরি-খেলার বাহাদুরী দেখানো এবং মজা পাওয়া। এর মধ্যে যে 'মজাটা' আছে, তাকে স্পষ্ট করে তোলে ওই দৃশ্যের আবহসঙ্গীত।

লালমোহনবাবুর জীবন বিপন্ন, তিনজনেই বিপদগ্রস্ত একটি ছুরি ফস্কে গেলেই অঘটন ঘটতে পারে—এমন একটি ভয়ানক দৃশ্যে বেজে উঠেছে ঢোলক এবং ক্ল্যারিওনেট টোনে কনসার্ট। লঘুরসাত্মক চালে 'সার্কাস্টিক' এই বাজনাই দৃশ্যটিকে মজার করে তোলে। ছুরি-বেঁধানোর গোটা পর্বটি জুড়ে গীটার প্লাক করে এবং ডুগডুগির শব্দের একটা 'ফানি' চরিত্র, আর সেইসঙ্গে মেঘরাজের 'নাজুক-লা জবাব' ধ্বনি উচ্চারণ মিলে দৃশ্যটিকে কখনোই সার্কাসের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হয়নি।

প্রতিমা শিল্পী খুনটি ছাড়া, দুটি ছবিতে আর-কোনো প্রত্যক্ষ শংকার অবকাশ রাখেননি পরিচালক। সাসপেন্স তৈরির পরেই, তাকে ভেঙে দিয়ে, কৌতূহলকে জিইয়ে রেখেছেন। শিশু এবং কিশোরের মনস্তাত্ত্বিক গঠনটি মনে রেখেই এই বিন্যাসপ্রক্রিয়া। মুকুল বা ক্যাপ্টেন স্পার্কের বন্ধুদের এই অ্যাডভেঞ্চারের অংশীদার করে তোলার জন্যই, অনাবশ্যক টেনশনের পরিস্থিতি বা তেমন সঙ্গীত প্রয়োগ করেননি পরিচালক। হাতে বন্দুক, তাতে ছটা গুলি থাকলেও, গোটা ব্যাপারটাই অতএব মগজাস্ত্রের খেলা এবং নৈপুণ্যের নজির হয়েই থাকে!

নেপালের পাটন শহরের অচেনা গলিতে সারিন্দা বাজাচ্ছেন নেপালি প্রবীণ

রা জ শ্রী রা হা

দুনিয়া-জুড়ে এখন কুইজ-চর্চা ভয়ানক বেড়ে গেছে। এদেশেও পাড়ার ক্লাব থেকে টেলিভিশনের পর্দা, সব জায়গায় কুইজ-এর বে-পরোয়া চাষ হচ্ছে দিন-রাত! অবিশ্যি কিছু তথ্য মুখস্ত করে ঝট্‌পট্‌ কুইজ-চ্যাম্পিয়ান হলেই, তাতে কারো বিদ্যে-বুদ্ধির মালুম পাওয়া যায় না, এটা মনে রেখো। সে যা-ই হোক্‌, ফাটাফাটি 'ফেলুদা সংখ্যা'য় ফেলুদা-কুইজ না-থাকলে চলে? উত্তর আগামী মাসে।

১। ফেলুদার বাবার নাম কী?

২। কোন্‌ মূর্তির জন্য শেলভাঙ্কারকে প্রাণ দিতে হল?

৩। হেলমুট উঙ্গার কে?

৪। বেঙ্গল ক্লাবের মেম্বার ফেলুদার ক্লাস ফ্রেন্ড-এর নাম কী?

৫। কন্দর্পনারায়ণ কোন্‌ বাদ্যযন্ত্রের নাম দিয়েছিলেন 'আম আঁটির ভেঁপু'?

৬। ফেলুদার প্রিয় সিগারেটের ব্র্যান্ড কী?

৭। ভবানন্দ কে?

৮। লালমোহনবাবুর ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল, তা কোন্‌ জ্যোতিষী বলেছিলেন?

৯। ভি. বালাপোরিয়া কে?

১০। সিধুজ্যাঠ্যার মতো বিরূপাক্ষ মজুমদারও খবরের কাগজের কাটিং সংগ্রহ করতেন। তাঁর জমানো কাটিং-এর খাতার কত নম্বর খণ্ডের উল্লেখ 'দার্জিলিং জমজমাট' উপন্যাসে আছে?

১১। আচার্য-পরিবারের 'ব্ল্যাকশিপ' ইন্দ্রনারায়ণকে কী অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল?

১২। ফেলুদার সঙ্গে বাগডোগরায় কোন্‌ বাঙালির প্রথম পরিচয় হয়েছিল?

১৩। ফেলুদাকে 'এ. বি. সি. ডি' নাম দিয়েছিলেন লালমোহনবাবু। পুরো কথাটা কী?

১৫। নয়ন একজন অ্যামেরিকান সাহেবের ব্যাঙ্কের লকারের নম্বর বলে দিয়েছিল। সেই নম্বরটা কী?

১৬। ফেলুদা পাটনায় কিসের তদন্তে সফল হয়েছিল?

১৭। কারান্ডিকারকে কোন্‌ সার্কাসের বাঘ আক্রমণ করেছিল?

১৮। ডাঃ মুনসী কার বাবাকে মোটরচাপা দিয়েছিলেন?

১৯। ফেলুদা সাংঘাতিক আর বীভৎস একসঙ্গে বোঝাতে সেবার দার্জিলিঙে কী শব্দ ব্যবহার করেছিল?

২০। সিদ্ধেশ্বর মল্লিকের সিদ্ধান্তে কার ছেলের প্রাণদণ্ড হয়েছিল?

ফেলুদাকে ফলো!

অমল চক্রবর্তী

ফেলুদা লোকটা
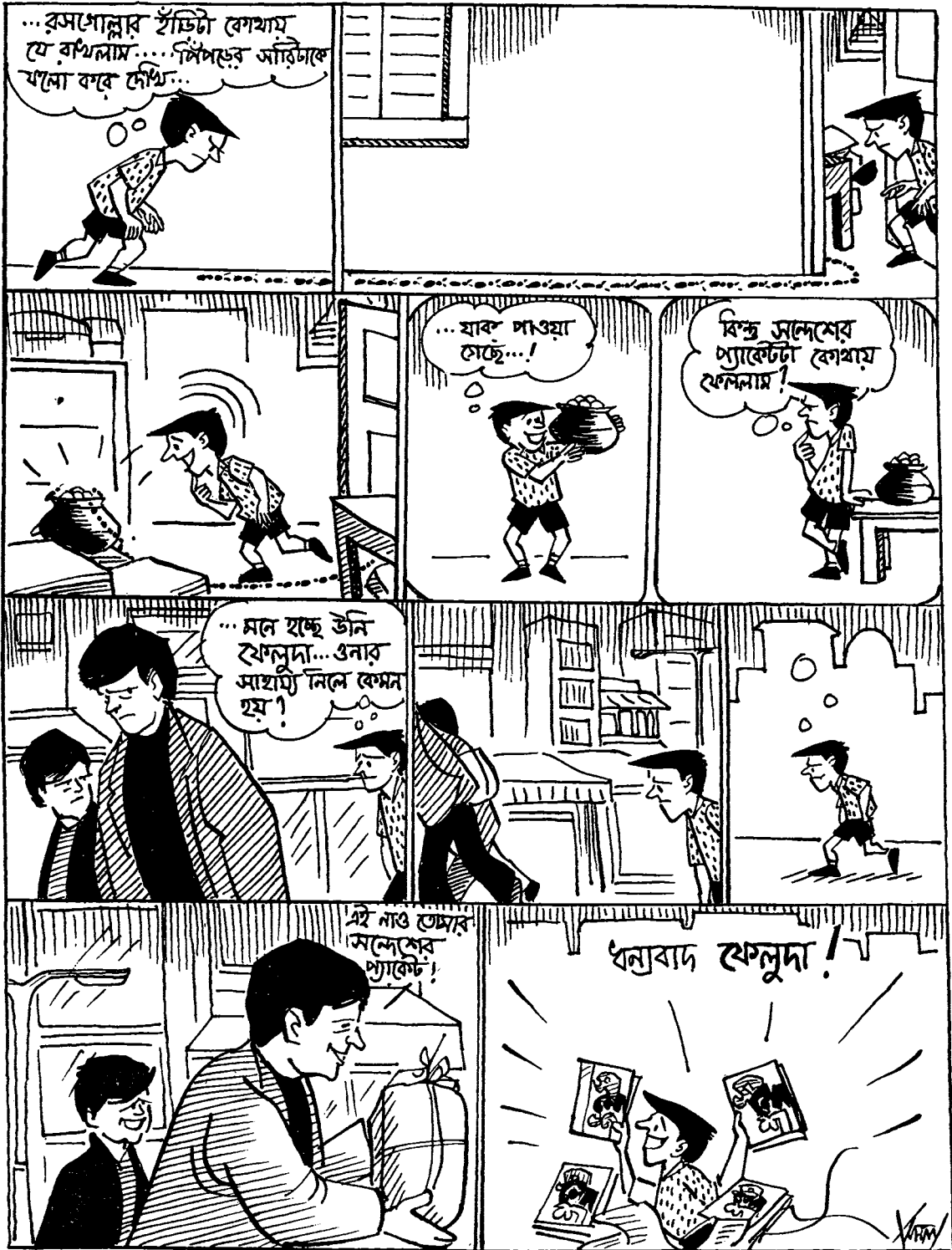
ক্ষে ত্র গু প্ত

কিশোর-সাহিত্যে বয়স্কদের হানাদারি

ফেলুদা-কাহিনী বাংলা গোয়েন্দা-গল্পের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পড়া হয়। সেই জনপ্রিয়তার বস্তুগত প্রমাণ আছে। গত তিরিশ বছর ধরে এই ফেলুদা-প্রেম ক্রমে বাড়ছে। একে সত্যজিৎ রায়ের অন্য শিল্পে বিশ্বব্যাপী গৌরবের প্রতিফলন মনে করবার কারণ নেই। যদিও জনপ্রিয়তা কোনো রচনার মানদণ্ড হতে পারে না। কিন্তু কোনো লেখা যদি বছরের পর বছর তার 'বেস্ট সেলার' বিশেষণটি বাঁচিয়ে রাখতে পারে, তবে তার মধ্যে এমন কিছু সারপদার্থ আছে, যাকে 'দাম' না-দিয়ে উপায় থাকে না।

লেখক ফেলুদা-কাহিনীকে ছোটদের পড়ার মতো করে লিখেছেন। যদিও ছোটদের জন্য লেখা উঁচু মানের সাহিত্য বড়দের কাছেও উঁচুই হয়ে থাকে। আমরা সাধারণত ছোটদের সাহিত্যকে পৃথক একটা সীমায় আটকে রাখি। অনেকেই ভুল করেন, ছোটদের সাহিত্যের মাপটাও ছোট। আসলে এই লক্ষ্মণের গণ্ডি ছোটদের জন্য। বয়স্ক-সাহিত্যের নিজস্ব চৌহদ্দিতে ছোটদের ঢুকে পড়ায় কিছু সমস্যা আছে। অন্যপক্ষে বড়দের অনায়াস যাতায়াত ছোটদের ওই মহলে। আমি বলব সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল' বাংলা সাহিত্যের একটা সেরা বই, বলব না 'ছোটদের সাহিত্যের'।

তবুও লেখক সত্যজিৎ ছোটদের জন্য লিখতে গিয়ে, নিজেকে অনেকখানি বেঁধেছেন। কোথাও সেই বাঁধনে টান পড়েছে। যেখানে পিতা নিহত বা আক্রান্ত পুত্রের হাতে, যেমন ঘুরঘুটিয়ায় বা ভূস্বর্গ কাশ্মীরে, অথবা যেখানে স্ত্রী ডা. মুনসীকে খুন করার জন্য হামানদিস্তা তুলে দেন স্বল্পবুদ্ধি ভাইয়ের হাতে। লেখক বয়স্ক-বোধ্য জটিল মনস্তত্ত্বের মুখোমুখি হয়ে সামলে গিয়েছেন। সম্ভাবনাটা আমন্ত্রণ জানাচ্ছে বয়স্ক-মনকে জীবনের রহস্যভেদ করার। সত্যজিৎবাবু শুধুই 'ছোটদের জন্য' লেখেননি। লিখেছেন 'গোয়েন্দা' গল্প, শঙ্কুর 'অ্যাডভেঞ্চার', 'ভৌতিক' বা 'অলৌকিক' সব কাহিনী। ছোটদের মনের মতো এই-সব উপাদান সাহিত্যের অভিজাত মহলে প্রায়ই জায়গা পায় না। সেটাও আমি কুসংস্কারই মনে করি। এই-সব জিনিস নিয়েও উঁচুমানের সাহিত্য তৈরি হতে পারে। সত্যজিতের রহস্য-কাহিনী এবং অন্য লেখার মধ্যে এমন কতগুলি গল্প-উপন্যাস আছে, যার শিল্প-মর্যাদা নিয়ে আমার অন্তত কোনো দ্বিধা নেই। 'সোনার কেল্লা', 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ', 'সমাদ্দারের চাবি', 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য', 'এবার কাণ্ড কেদারনাথে' বা 'টিনটোরেটোর যীশু'র মতো গল্প— কোনো-না-কোনো দিক থেকে 'বড় সাহিত্যে'র লক্ষ্যভেদ করেছে। যদিও আদ্যন্ত এন্টারটেনমেন্ট, বিশেষত ছোটদের বিনোদন ছিল তার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য।

ছোটদের জন্য লেখা বলে কিছু বাড়তি অ্যাক্‌শন আছে, কিছু আছে ফর্মুলা, ঘটনার পুনরুক্তি। এগুলিকে মেনে নেব রহস্য-গল্পের কিশোর-সেব্য প্যাঁচ বলে। 'বেস্ট সেলার' হবার কিঞ্চিৎ খেসারত বলেও। এ-সবের মধ্য থেকেও ভেদ করে বেরোয় কিছু প্রাপ্তি। যার জন্য বয়স্ক-ভিড় ফেলুদার দরবারে!

ফেলুদা একের মধ্যে তিন

ফেলুদা মানুষটি দারুণ বলেই সত্যজিৎ রায়ের রহস্য-গল্প এত জমে ওঠে। মনে হয় আমাদের খুব চেনা, যেন কাছে বসে আছে— একেবারে স্বাভাবিক,

সহজ। ভাতের মধ্যে বাটির মতো গর্ত করে সোনা-মুগের ডাল ঢালছে, খাবার শেষে চারমিনারে টান। কোথাও কিছু বানানো নেই, একেবারে খাঁটি বাঙালি, ১৯৬৫ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে তার বয়স ২৭ থেকে ৩৫-এ দাঁড়িয়ে, লেখক ওইটুকু যা বাস্তবের রাশ টেনেছেন। বয়স যদি বছরের মাপে বাড়তেই থাকত, তা হলে 'রবার্টসনের রুবি'তে এসে তাকে ৫০-৫৫র প্রৌঢ় হয়ে পড়তে হয়। তখন তাকে 'ফেলুদা' না-বলে 'ফেলুকাকা' বলতে হত, এবং গল্প মাটি হত। কিশোর-পাঠক দাদা বলতে পারে, এমন বয়স তো রাখতে হবে!

সত্যজিৎবাবু ১৯৬৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ফেলুদাকে যত্ন করে গড়ে পূর্ণ করে তুলেছেন, এবং পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাও থামিয়ে দিয়েছেন। মজা হল এই, ফেলুদা যেই নাম-টাম একটু করেছে, ছেলে এবং ছেলের বাবা দুজনেই তাকে 'ফেলুদা' বলে উঠছে। আসলে ছেলের বাবার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা কিশোরকে জাগিয়ে দিচ্ছে ফেলুদা।

ফেলুদা তার গোয়েন্দাগিরির গল্পেই ধরা পড়েছে— একথা খুবই ঠিক, তবুও মাঝে মাঝে রহস্য ও রহস্যভেদের ঘটনাগুলি ভুলে, শুধু ফেলুদার কথা ভাবতে ভালো লাগে। ওই গল্পগুলির মধ্য দিয়েই সে তৈরি হয়ে উঠেছে— ওগুলি ছাড়া তার অস্তিত্বই তো নেই, তবুও মনে হয় সে যেন ও-সব ছাড়িয়ে আলাদা হয়ে বেরিয়ে আসছে। ফেলুদার এই স্বাধীন রূপটি আমাদের কাছে কিছু কম পাওয়া নয়।

ফেলুদা একেবারে সহজ, স্বাভাবিক, চেনা লোক। গোয়েন্দাগিরিটা যে খাঁটি বাঙালি থেকেও করা যায়— তার জন্য পাইপ টেনে, বাঁকা ইংরেজি বলে, তাকে কিরীটি রায়ের মতো নকল সাহেব হয়ে উঠতে হয় না, ব্যোমকেশ বক্সী আর ফেলুদাই তা দেখিয়ে দিল। সর্ষে-বাটা ইলিশ, রুই মাছের কালিয়া— খাবার পরে চাই একটি মিঠে পান। বাঙালির দেশ-বেড়াবার বাতিকটাও তার রক্তে। মাঝে মাঝেই মনে হয় গোয়েন্দাগিরির জন্য বেড়ানো। পুরী, দার্জিলিং, ইলোরা, কাশ্মীর, লখ্নৌ, বেনারস, কাঠমাণ্ডু, শান্তিনিকেতন, ডুয়ার্স, হাজারিবাগ— এগুলি বাঙালির ভ্রমণ-তালিকায় সবচেয়ে প্রিয় নাম, আধুনিককালে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাঁ-ই-ই করে ঘুরে আসা লন্ডন বা হংকং। কখনো মনে হয় বেড়ানোর জন্যই যেন গোয়েন্দাগিরি। কখনো উল্টোটা— কে জানে কোন্‌টা ঠিক। আর এত-সব বেড়িয়েও, বাংলার পল্লীতে শীতের মাঠে আসন্ন সন্ধ্যায় যে কুয়াশা নামে, তার তুলনা সে পায় না!

এত সহজ, স্বাভাবিকের মধ্যেই ফেলুদা অসাধারণ। যদিও দুর্বোধ্য বা দুরূহ নয় কোথাও, নয় অস্বাভাবিক। দীর্ঘদেহী এই যুবক এক তীক্ষ্ণধার, উজ্জ্বল তরোয়াল। রহস্যভেদের সূচ্যগ্র বুদ্ধি, তার সঙ্গে একটা চাপা কৌতুক। সে পড়ে, জানে, কিন্তু মন পুরো খোলা রাখে। মানুষের মনের গোপনে ঢুকবার শক্তি আছে তার।

ফেলুদার মনের একটা দিক কিশোরবয়সী। যদি কেউ বলে— তোপ্‌সে একটি পৃথক ছেলে ঠিকই, কিন্তু সে আসলে ফেলুদার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা ফেলুদার মনের কাঁচা অংশটা, তো আমি সে-কথা মেনে নেব। হেঁয়ালি, ধাঁধা, ছড়া, সংকেত ভেদ করায়

ফেলুদার আগ্রহ, অনেক সময় রহস্যভেদের প্রয়োজন ছাপিয়ে উঠেছে খেয়াল-খুশিতে। ছদ্মবেশ ধারণ শুধু অভিনয়ের আনন্দে, গোয়েন্দাগিরি রইল হয়তো পিছনে পড়ে। আর অতি সহজে সব-ধরনের শিশুর বন্ধু হয়ে ওঠার শক্তি। ফেলুদায় তোপ্‌সেতে পার্থক্য থাকে না!

তিন মুখওয়ালা দেবতার মতো ফেলুদাকে কখনো মনে হয়। স্বয়ং ফেলুদা এবং তোপ্‌সে— এই দুই মুখ না-হয় মানা গেল। আর তৃতীয় মুখটি? যদি বলি জটায়ু, তো অনেকেই আপত্তি করবে। একটু ভেবে দেখলে, কথাটা মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। জটায়ুর মধ্য দিয়ে ফেলুদা যেন নিজের গোয়েন্দাগিরির উপরে অনেকখানি কৌতুক ছড়িয়ে দিচ্ছে। জটায়ুর গোয়েন্দা প্রখর রুদ্র আর ফেলুদার নাম প্রদোষ মিত্র। বম্বের ফিল্ম-পরিচালক বলেছিলেন প্রখর রুদ্রের চরিত্রে অভিনয় করার একমাত্র যোগ্য লোক প্রদোষ মিত্র। বম্বে সিনেমায় গল্প বিক্রি হলে জটায়ু বলেছিল—'আমাদের দু'জনের লেখা'। জটায়ুর লেখা গল্পের নামে আর ফেলুদার বাস্তব-কীর্তিতে আশ্চর্য মিল। জটায়ুর বই 'সাহারার শিহরণ', 'হণ্ডুরাসে হাহাকার', 'আরক্ত আরব'। ফেলুদার কীর্তি 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল', 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি', 'ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর'। 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' তো নামে কমন।

ফেলুদা; তোপ্‌সে, জটায়ু— তিনজন মিলে একজনই।

গোয়েন্দাগিরি ছাপিয়ে

ক্লাসিক গোয়েন্দা-বইয়ের পাঠক যারা, বিলিতি ডিটেকশন-এর জট-পাকানো জট-খোলার গল্প পড়ে যাদের মন তৈরি, তারা কেউ কেউ ফেলুদার রহস্যভেদকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান না। ক্রাইম এবং ডিটেকশন— দুটোই খুব জটিল নয় ফেলুদায়, অন্তত বেশিরভাগ গল্পে, এরকম একটা অভিযোগ আছে। যার সবটা মানা গেল না।

ধরা যাক্ মাত্র একটি গল্প, 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য'র কথা। এই গল্পে যদিও কেউ ছদ্মবেশে নেই, নাম-পরিচয়ও ঠিক-ঠাক। কিন্তু যাকে জানি, সে হয় তা নয়— অন্য কিছু অথবা আরও কিছু। মাথাখারাপ দেবতোষ অসংলগ্ন বকেন, তাতে কিন্তু সত্যের মর্মভেদ হয়। মহীতোষ কীর্তিমান শিকারী, আসলে বন্দুক ধরলে তার হাত কাঁপে। মহীতোষ নিজের শিকার-কাহিনীর কীর্তিমান লেখক, আসলে কোনো শিকার যেমন তার নিজের করা নয়, বইয়ের একটি বাক্যও নিজের লেখা নয়। বন্ধু শশাঙ্ক সহচর-টাইপের, মহীতোষের কাঠের কারবার দ্যাখে— আসলে সে বিরাট শিকারী, মাটিতে দাঁড়িয়ে গণ্ডায় গণ্ডায় বাঘ মেরে মহীতোষকে কীর্তিমান করেছে। এই-সব রহস্যভেদ করার দায় ছিল না ফেলু মিত্তিরের, হেঁয়ালি ভেঙে গুপ্তধন উদ্ধার করতে গিয়ে মহীতোষের অনভিপ্রেত এত-সব রহস্যের গোড়া শুদ্ধ উপড়ে এনেছে। খুব ভালো বিদেশী গল্প বা সেরা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই মাত্র এর তুলনা।

এ-রকম অন্তত ৬-৭টি গল্পের উদাহরণ দেওয়া যায়। তাতেও যাঁরা খুশি নন, যাঁদের জন্য বলা আধুনিক রহস্য-কাহিনীর ইতিহাস প্রায় দেড়শো বছরের। শুধুই রহস্য আর রহস্যভেদে না ঘুরপাক খেয়ে, তার চারধারে বিচিত্র মণ্ডনের সৃষ্টি— এই শ্রেণীর গল্পকে ক্রমিক নতুনত্ব দিচ্ছে। শার্লক হোমস্ বা আগাথা খ্রিস্টি-র নকল করে কোনো খাঁটি শিল্পীর তৃপ্তি হবে না। সত্যজিৎও নিজের পথ নিজে করে নিয়েছেন। সে-পথে যেমন অসাধারণ সরল ও জটিল পাপীর মূর্তি গড়ে উঠেছে, তেমনি হেঁয়ালি ধাঁধা ছড়া শব্দ-খেলার একটা জগৎ তৈরি হয়েছে। মিশরের মৃত্যু-দেবতা আনুবিস, আওরঙ্গজেবের আংটি, নেপোলিয়ানের চিঠি, জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা, তান্ত্রিক যমন্তক মূর্তি, অষ্টাদশ শতকের সহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার সহজযানী পুঁথি, রেনেসাঁস-মাস্টারের আঁকা ছবি— সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা কাহিনীতে এনেছে এক মননে দীপ্ত স্বতন্ত্র মাত্রা। আরও আছে কিছু অতিলৌকিকতার স্পর্শ।

ফেলুদা গোয়েন্দাগিরি করেছে নিপুণ দক্ষতায়। তার কাহিনী গোয়েন্দাগিরির চারপাশে বিচিত্র সব উপভোগের উপাদান সঞ্চিত করে তুলেছে। উপরি এই পাওনা নিয়েই ফেলুদার পুরো আয়োজন।

চিত্রনাট্য

ফেলুদা অ্যান্ড কোং

গোরস্থানে সাবধান

কচৌরি গলি
জয়বাবা ফেলুনাথ

ছিন্নমস্তার অভিশাপ

প্রদোষ মিত্তির যাঁর ফেলু ডাকনাম
জটিল রহস্য ভেদে সদা সিদ্ধকাম।
পেশায় গোয়েন্দা তিনি বাস কলিকাতা
চিত্রগুপ্ত সম খোলে পাতকীর খাতা ।
তপেশ খুড়াতো ভাই সুহৃদ জটায়ু
(বাঙালী মানসে যাঁর চির পরমায়ু),
এঁরাই স্যাঙাত্ তাঁর যাবতীয় কাজে
আছে আরো এক তাঁরে লাগে মাঝে মাঝে—
ডাটা ব্যাঙ্ক সিধু জ্যাঠা মহা গুণী জন
ফেলু ফেল হলে তাঁরে হয় প্রয়োজন।
দু-চারশোর বছরে যাবতীয় কথা
তল খুঁজে এনে দেন বিশেষ বারতা।

'জয় বাবা ফেলুনাথ'

রঞ্জন প্রসাদ

কাঠমাণ্ডু বেনারস জয়সলমীর
গ্যাংটক থেকে পুরী সমুদ্রতীর,
যেখানেই ঘনীভূত রহস্যজাল
সহসা সেখানে এঁরা ধরে নেন হাল—
তারপর সিঁড়িভাঙ্গা অঙ্কের খেল
ফলতঃ শিষ্টের শান্তি, দুষ্টের জেল।।
কিছু অ্যাড্‌ভেনচার কমেডি খানিক
মিশিয়ে কী যাদু গড়ে গেছেন মানিক,
ছায়া-ছবি-গল্পে-সুরে ভাবি কেয়া বাত
চিরজীবি সত্যজিৎ, জয় ফেলুনাথ।।

মিত্তিরের মক্কেলরা

অমিতানন্দ দাশ

বয়স ৪৫ থেকে ৭৫, গায়ের রঙ ফরসা, মাঝারি উচ্চতা। বয়সানুপাতে সুপুরুষ, শক্তসমর্থ শরীর। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, সম্ভবত পাতলা হতে শুরু করেছে, চোখ ভাসাভাসা বা ঢুলুঢুলু। বাড়িতে পরেন পাজামা, পাঞ্জাবি, পায়ে দেন বাহারে চটি। ব্যবসাদার, উকিল বা অন্য প্রোফেশানাল, হয়ত অবসর নিয়েছেন। বেশ কিছু সম্পত্তির মালিক, হয়ত জমিদার পরিবারের ছেলে। প্রবল ব্যক্তিত্ব, একটু খামখেয়ালি। সম্ভবত কিছু সংগ্রহ করেন, নয়তো দু'একটি অমূল্য সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। হয়ত বিপত্নীক, মেয়ে থাকলে বিয়ে হয়ে গিয়েছে, ছেলে অন্যত্র থাকে, অথবা তার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো নয়। দৈনন্দিন কাজে এক সেক্রেটারির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, আপাতভাবে সে খুবই বিশ্বস্ত। বড়সড় বাড়িতে নুড়ি-বিছানো রাস্তা, সাজানো বৈঠকখানা, সোফা ও খাটে পুরু গদি। দক্ষিণ কলকাতায় বাড়ি হলে নম্বরটা সম্ভবত ৫ থেকে ৭/১-এর মধ্যে।

এই হল ফেলু মিত্তিরের 'ক্ল্যাসিক মক্কেল'-এর প্রোফাইল। ফেলুদার অবশ্য রহস্য দেখলেই অনুসন্ধান করা স্বভাব। 'কেস জমাটি হলে রোজগার হল কি না হল সেটা ফেলুদা ভুলে যায়' (*হত্যাপুরী*)। *কৈলাসে কেলেঙ্কারীর* মক্কেল কি সিধুজ্যাঠা? শ্রীবাস্তব (*বাদশাহী আংটি*) ফেলুদাকে অনুসন্ধান করতে বলেননি— তখনও অবশ্য ফেলুদার হাত পাকাবার পালা চলছিল, গোয়েন্দাগিরি থেকে রোজগার শুরুই হয়নি। অনীকেন্দ্র সোম ফেলুদাকে ফোন করার পরই খুন হন, ফেলুদা কিন্তু যেচে জড়িয়ে পড়েন এই 'হতে-পারত-মক্কেল'-এর কেসে (*কাঠমাণ্ডুতে*)। বীরেন্দ্র শেলভাঙ্কার *গ্যাংটকে গণ্ডগোল*-এর আসল মক্কেল, কিন্তু গোড়াতে তিনি নিজের পরিচয় গোপন রাখেন, ফেলুদা বিনা মক্কেলেই গায়ে পড়ে অনুসন্ধান শুরু করেন। অনীকেন্দ্র আর বীরেন্দ্র ফেলুদার সমবয়সী — মক্কেল হিসেবে সবদিক দিয়েই ব্যতিক্রম।

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে-র মক্কেল? সে তো লালমোহনবাবু স্বয়ং। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য মক্কেলের শুধু সোয়াশ' বছরের পুরনো মাথার খুলি *গোরস্থানে* দেখেছেন ফেলুদা। এই কেসে নরেন্দ্রনাথের চরিত্রের ধাঁচটা ক্ল্যাসিক মক্কেলের মতো হলেও, পারিবারিক কেচ্ছা গোপন করার জন্য তিনি নিজের সমস্যার কথা ফেলুদাকে বলেননি। ফেলুদা যেচে মক্কেল ঠাওরান টমাস গডউইনকেই, যাঁকে গোর দেওয়া হয়েছিল ১৮৫৮-তে।

কিছু ওপরচালাক ধান্দাবাজ লোক সাজানো সমস্যা নিয়ে ফেলুদার কাছে আসেন কু-মতলবে। নীলমণি সান্যাল (*শেয়াল*), অনন্তলাল বাটরা (*কাঠমাণ্ডুতে*), মহীতোষ রায় (*অপ্সরা*) বা সুনীল তরফদার (*নয়ন*)— এঁরা সব এক বিশেষ শ্রেণীর মক্কেল — এঁদের 'খলমক্কেল' বলা যেতে পারে।

অম্বর সেনকে অবশ্য খলমক্কেল না বলে 'ছলমক্কেল' বলা যেতে পারে। মতলবী ধান্দাবাজ নন, তিনি এ্যামেচার রহস্য-নাটকের নির্দেশক, যদিও আবার সে-নাটকের মধ্যে বাড়তি প্যাঁচ কষেন অন্য একজন।

'ভালো কেস না হলে (ফেলুদা) নেয় না। ভালো, মানে যাতে ওর আশ্চর্য বুদ্ধিটা শানিয়ে নেবার সুযোগ হয় এমন কেস।' (*বাক্স-রহস্য*)। কিছু ছাপোষা লোকেরও অসাধারণ কেস উৎসাহের সঙ্গেই নিয়েছেন তিনি। সুধীর ধর সাধারণ দোকানদার হলেও, তাঁর ছেলে

মুকুল (*সোনার কেল্লা*) সেই আশ্চর্য জাতিস্মর। জয়চাঁদ বড়াল সাধারণ গাঁয়ের শিক্ষক হলেও, উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর কাছে রয়েছে এক অসাধারণ অমূল্য *গোলাপী মুক্তো*।

ফেলুদার সব মক্কেলই ফরসা—'টকটকে', 'ধবধবে', 'ফরসা' বা 'মোটামুটি ফরসা'। এর ব্যতিক্রম নেই। অধিকাংশ মক্কেল জমিদার পরিবারের ছেলে, তার সঙ্গে গায়ের রঙের কিছুটা সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে।

অধিকাংশ মক্কেলের উচ্চতা মাঝারি। অবশ্য ফেলুদার তুলনাতেই বোধহয়, কারণ পৌনে ছ'ফুট লম্বা লোককেও মাঝারি উচ্চতাই বলা হয়েছে।

সাধারণত মক্কেলদের শক্তিশালী শরীর, কারো বা 'মুগুর-ভাঁজা চওড়া কাঁধ'। অনেকের মুখে এখন বয়সের ছাপ পড়লেও বোঝা যায় একসময়ে অত্যন্ত শক্তিমান ও সুপুরুষ ছিলেন তাঁরা। বিশেষ উল্লেখযোগ্য *কৈলাস চৌধুরী*, দুর্গাগতি সেন (*হত্যাপুরী*), বিরূপাক্ষ মজুমদার (*দার্জিলিং*) ও ডক্টর রাজেন *মুনসী*। বীরেন শেলভাঙ্কার (*গ্যাংটকে*) তো ফেলুদার চেয়েও লম্বা।

মহেশ চৌধুরীর হেঁয়ালির সমঝদার তাঁর নাতনি 'জোড়া মৌমাছি' (*ছিন্নমস্তা*)

ফেলুদার যেসব কেস নিয়ে তোপ্‌সে লিখেছে, তার মক্কেলদের তালিকা দেওয়া হল প্রথম সারণীতে ঃ

সারণী (১) ঃ ফেলুদার মক্কেলদের তালিকা

পর্যায়	প্রকাশের বছর	গল্পের নাম: সম্পূর্ণ	গল্পের নাম: সংক্ষেপে	মক্কেলের: নাম	মক্কেলের: বয়স	মক্কেলের: পেশা	মক্কেলের: বিশেষত্ব	সেক্রেটারির নাম
	১৩৭২	ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি	ফেলুদা	রাজেন মজুমদার	৬৫	উকিল (অবসর-প্রাপ্ত)	মুখোশ সংগ্রহ	×
	১৩৭৩	বাদশাহী আংটি	বাদশাহী	শ্রীবাস্তব	৫০?	অস্টিওপ্যাথ	আওরঙ্গজেবের আংটি	×
	১৩৭৪	কৈলাস চৌধুরীর পাথর	কৈলাস-১	কৈলাস চৌধুরী	৬০	উকিল	শিকারী	×
প্রথম	১৩৭৭	শেয়াল দেবতা রহস্য	শেয়াল	নীলমণি সান্যাল	৫০?	?	কিউরিও সংগ্রহ	×
(শুরুর	১৩৭৭	গ্যাংটকে গণ্ডগোল	গ্যাংটকে	বীরেন্দ্র শেলভাঙ্কার	৩০	ফোটোগ্রাফার	ছদ্মবেশী	×
দিকের)	১৩৭৮	সোনার কেল্লা	সোনার	সুধীর ধর	৪৫?	ব্যবসায়ী	ছেলে জাতিস্মর	×
	১৩৭৯	বাক্স-রহস্য	বাক্স	দীননাথ লাহিড়ী	৫৫	ব্যবসায়ী	ভিন্টেজ গাড়ি	×
	১৩৮০	কৈলাসে কেলেঙ্কারি	কৈলাস-২	সিধুজ্যাঠা?	?	?	তথ্য সংগ্রহ	×
	১৩৮১	রয়েল বেঙ্গল রহস্য	রয়েল	মহীতোষ সিংহ রায়	৫৯	জমিদারির উত্তরাধিকারী	ঠাকুর্দা আদিত্য-নারায়ণের সংগ্রহ	তড়িৎ সেনগুপ্ত
	১৩৮২	ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা	ঘুরঘুটিয়া	কালীকিঙ্কর মজুমদার	৭০+	জমিদারির উত্তরাধিকারী	বই সংগ্রহ	রাজেন ?
	১৩৮২	জয় বাবা ফেলুনাথ	জয় বাবা	অম্বিকা ঘোষাল	৭৩	উকিল (অবসর-প্রাপ্ত)	অমূল্য মূর্তি	বিকাশ সিংহ
	১৩৮৩	বোম্বাইয়ের বোম্বেটে	বোম্বাইয়ের	লালমোহনবাবু	?	লেখক	ফেলুদার সহকারী	×
	১৩৮৩	গোঁসাইপুর সরগরম	গোঁসাইপুর	শ্যামলাল মল্লিক	৬০+	ব্যবসায়ী (অবসর-প্রাপ্ত)	বিটকেল ছিটগ্রস্ত	সোমনাথবাবু (বাজারসরকার)
দ্বিতীয় (মাঝের	১৩৮৪	গোরস্থানে সাবধান	গোরস্থানে	টমাস গডউইন		ভাগ্যসন্ধানী	মারা গেছেন ১৮৫৮তে	×
পর্যায়)	১৩৮৫	ছিন্নমস্তার অভিশাপ	ছিন্নমস্তা	মহেশ চৌধুরী	৭০	উকিল (অবসর-প্রাপ্ত)	প্রজাপতি,পাথর হেঁয়ালি	×
	১৩৮৬	হত্যাপুরী	হত্যাপুরী	দুর্গাগতি সেন	৬২	ব্যবসায়ী (অবসর-প্রাপ্ত)	পুঁথি সংগ্রহ	নিশীথ বোস
	১৩৮৭	গোলকধাম রহস্য	গোলকধাম	নীহার দত্ত	৫০	বৈজ্ঞানিক (ছিলেন)	গবেষণার তথ্য সংগ্রহ	রণজিৎ বন্দোপাধ্যায়
	১৩৮৭	যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে	কাঠমাণ্ডুতে	অনীকেন্দ্র সোম	৩০	অধ্যাপক	বন্ধুর মৃত্যুর অনুসন্ধান	×
	১৩৮৮	নেপোলিয়ানের চিঠি	নেপোলিয়ন	পার্বতী চরণ হালদার	৭০	উকিল (অবসরপ্রাপ্ত)	কিউরিও সংগ্রহ	সাধন দস্তিদার
	১৩৮৯	টিনটোরেটোর যীশু	টিনটোরেটো	নবকুমার নিয়োগী	৪৫?	ব্যবসায়ী	কাকার অমূল্য ছবি	বঙ্কিমবাবু
	১৩৯০	জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা	জাহাঙ্গীর	শঙ্কর প্রসাদ চৌধুরী	৫০	ব্যবসায়ী	প্রপিতামহ বানোয়ারিলালের সংগ্রহ	×

পর্যায়	প্রকাশের বছর	গল্পের নাম		মক্কেলের				সেক্রেটা-রির নাম
		সম্পূর্ণ	সংক্ষেপে	নাম	বয়স	পেশা	বিশেষত্ব	
দ্বিতীয়	১৩৯১	এবার কাণ্ড কেদারনাথে	কেদারনাথে	ভবানী উপাধ্যায়	৭৫?	কবিরাজ	অমূল্য লকেট	×
	১৩৯২	বোসপুকুর খুনখারাপি	বোসপুকুরে	কীর্তিনারায়ণ আচার্য	৭৯	উকিল (অবসরপ্রাপ্ত)	ঠাকুর্দা কন্দর্পনারায়ণ	প্রদ্যুম্ন মল্লিক
	১৩৯৩	দার্জিলিং জমজমাট	দার্জিলিং	বিরূপাক্ষ মজুমদার	৬০+	ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (অবসরপ্রাপ্ত)	খবরের কাগজের কাটিং সংগ্রহ	রজতবাবু
তৃতীয় (শেষের দিকে)	১৩৯৪	অপ্সরা থিয়েটারের মামলা	অপ্সরা	মহীতোষ রায় (খল)	৪০-৪৫	অভিনেতা	মতলবী	×
	১৩৯৪	ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর	ভূস্বর্গ	সিদ্ধেশ্বর মল্লিক	৬৫	অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি	প্ল্যানচেট	সুশান্ত সোম
	১৩৯৫	শকুন্তলার কণ্ঠহার	শকুন্তলা	হেক্টর জয়ন্ত বিশ্বাস	৫০?	ব্যবসায়ী	দামী কণ্ঠহার	×
	১৩৯৬	লণ্ডনে ফেলুদা	লণ্ডনে	রঞ্জন মজুমদার	৫০?	চার্টার্ড এ্যাকাউন্টান্ট	বিলেতের ছাত্র জীবনের স্মৃতি হারিয়েছেন	×
	১৩৯৬	গোলাপী মুক্তা রহস্য	মুক্তো	জয়চাঁদ বড়াল	৪৫?	শিক্ষক	অমূল্য মুক্তো	×
	১৩৯৭	ডক্টর মুনসীর ডায়েরী	মুনসী	রাজেন মুনসী	৬০?	মনস্তত্ত্ববিদ	ডায়েরী থেকে স্মৃতিকথা লিখছেন	সুখময়
	১৩৯৭	নয়ন রহস্য	নয়ন	সুনীল তরফদার (খল)	৩০-৩২	ম্যাজিশিয়ান	অসাধারণ ক্ষমতাশালী বালক নয়ন	শঙ্কর হুবলিকার (ম্যানেজার)

উপরোক্ত কেসগুলিকে যে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে, সেই পর্বগুলির বিশেষত্ব নিচের দ্বিতীয় সারণীতে দেওয়া হল ঃ—

সারণী (২) ঃ ফেলুদার কেসগুলির তিন পর্ব

পর্যায়	প্রকাশের বছর	কেসের সংখ্যা	ফেলুদার পরিচিতি	মক্কেলের বয়স	মক্কেলের শ্রেণী	মক্কেলের পেশা	সেক্রেটারি
শুরুর	১৩৭২-৮০	৯	কম	৬৫র নিচে	দুই খলমক্কেল, ক্ল্যাসিক মক্কেল কম	অধিকাংশ উকিল বা ব্যবসায়ী	কারুর নেই
মাঝের	১৩৮১-৯৩	১৬	দ্রুত বাড়ছে	প্রায় অর্ধেক ৭০-র উপরে	অধিকাংশ 'ক্ল্যাসিক' একজন 'ছল'	অধিকাংশ উকিল বা ব্যবসায়ী	অর্ধেকের আছে
শেষের	১৩৯৪-৯৭	৮	বিখ্যাত হয়েছেন	সবাই ৬৫র নিচে	দুই খলমক্কেল অধিকাংশ 'ক্ল্যাসিক'	অধিকাংশ বিভিন্ন প্রোফেশনাল, উকিল নেই	অর্ধেকের আছে

অধিকাংশ মক্কেল ব্যবসাদার বা উকিল। মনে হয় অবসরপ্রাপ্ত উকিলেরা বিশেষভাবে পছন্দ করতেন ফেলুদার অনুসন্ধান পদ্ধতি। অন্যান্য পেশার 'ক্ল্যাসিক মক্কেল'দের মধ্যে আছেন বৈজ্ঞানিক নীহার দত্ত (*গোলকধাম*), চার্টার্ড এ্যাকাউন্টান্ট রঞ্জন মজুমদার (*লণ্ডনে*), মনস্তত্ত্ববিদ ডক্টর রাজেন *মুনসী* ইত্যাদি। অনেক মক্কেলেরই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির তুলনায় নিজস্ব রোজগার কম, কয়েকজনের বোধহয়

সম্পত্তির রোজগারেই চলে। মক্কেলের সঙ্গে তার বাপ-ঠাকুর্দা-কাকা-জ্যাঠা-ভাই-ছেলে মিলে শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র আছে বিভিন্ন কেসে। এর মধ্যে পুলিশ, সৈনিক বা রাজনীতিবিদ একদম নেই, সরকারী কর্মচারী বা কেরাণী জাতীয় সাধারণ চাকুরেও বিরল।

ফেলুদার কখনো কোনো মহিলা মক্কেল ছিল বলে জানা যায়নি। অবশ্য ফেলুদা তো ছোটদের পড়ার অনুপযোগী কোনো কেসের বিষয়ে তোপ্‌সেকে লিখতে দেননি, হতে পারে মহিলা মক্কেলদের ব্যক্তিগত সমস্যার কেস তাতে বাদ পড়ে গেছে। আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, মক্কেলেরা সর্বদা পুরুষ, সাধারণত বিপত্নীক, কিছু অবিবাহিত। তাঁদের মেয়ে থাকলে বিয়ে হয়ে গিয়েছে, সাধারণত ভাইঝি বা নাতনী ইত্যাদির মধ্যেও কোনো অবিবাহিত তরুণী নেই। প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বিরল। এর বিশিষ্ট ব্যতিক্রম *শকুন্তলার কণ্ঠহার*-এর মক্কেলের মা 'শকুন্তলা দেবী' এবং মক্কেলের মেয়ে সদ্য-গ্র্যাজুয়েট মেরী শীলা বিশ্বাস — এঁরা দুজনেই গুরুত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক চরিত্র।

বহু গল্পেই বাপ-ছেলের টানাপোড়েনের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। একবার তো ফেলুদা বলেই ফেললেন, 'দাবা খেলার শেষদিকে যখন দু'পক্ষের পাঁচটি কি সাতটি ঘুঁটি...তখন অনড় অবস্থাতেই তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলতে থাকে। যারা খেলছে তারা প্রত্যেকটি স্নায়ু দিয়ে ব্যাপারটা অনুভব করে। এই চৌধুরী পারিবারটিকে দেখে আমার দাবার ঘুঁটির কথা মনে হচ্ছে, যদিও কে সাদা, কে কালো, কে রাজা কে মন্ত্রী তা এখনও বুঝিনি' (*ছিন্নমস্তা*)।

দীননাথবাবুর দামী হীরে
আর অমূল্য পাণ্ডুলিপি
বাড়িতে জঞ্জালের মধ্যেই
পড়েছিল বহু দশক
(বাক্স-রহস্য)

ঘুরঘুটিয়া-র কালীকিঙ্কর মজুমদার তো ছেলের হাতেই আক্রান্ত হবেন। রাজেন মজুমদার ছেলেকে ত্যাজপুত্র করেন (*ফেলুদা*)। মহেশ চৌধুরী রেসুড়ে বড় ছেলে ও অকর্মণ্য ছোটকে দেখতে পারেন না, তাঁর প্রিয় মেজ বহুদিন নিরুদ্দেশ (*ছিন্নমস্তা*)। কীর্তিনারায়ণ আচার্য নাক-উঁচু বড় ও জুয়াড়ে মেজকে অপছন্দ করেন, প্রিয় ছোটই খুন হবেন (*বোসপুকুরে*)। দেনায় ডুবে আছেন বিরূপাক্ষ মজুমদারের ছেলে (*দার্জিলিং*) শেয়ার বাজারের লোকসানে, আর সিদ্ধেশ্বর মল্লিকের ছেলে (*ভূস্বর্গ*) জুয়া খেলে। সুবীর দত্তের বড় ছেলে বিদেশে, ছোট ছেলে কুসঙ্গে ক্রিমিনাল হয়ে যাচ্ছে (*গোলকধাম*)। হেক্টর জয়ন্ত বিশ্বাসের ছেলের গুণ্ডামিতে লালমোহনবাবুর তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া (*শকুন্তলা*)।

মক্কেলদের অনেকেরই, লালমোহনবাবুর ভাষায়, 'ব্যক্তিত্ব উইথ ক্যাপিটাল বি' (*হত্যাপুরী*)। তবে অনেকেই প্রচণ্ড খামখেয়ালি। বিরূপাক্ষবাবু রোজ সারা রাত জেগে থাকেন, ঘুমোন সারা দুপুর (*দার্জিলিং*)। মহেশ চৌধুরী হেঁয়ালিতে কথা বলেন, গোপন ব্যক্তিগত কথা ডায়েরিতে লিখে রেখেছেন, 'নবরত্ন বাঁদরের মতে দু'হাজার পা' (*ছিন্নমস্তা*)। প্রাক্তন বিচারপতি সিদ্ধেশ্বরবাবু যাদের ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন, তাঁদের আত্মাকে প্ল্যানচেটে ডেকে প্রশ্ন করছেন সত্যি তাঁরা খুন করেছিলেন কি না (*ভূস্বর্গ*)। দুর্গামোহন গঙ্গোপাধ্যায় সন্ত্রাসবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী থেকে ব্যবসায়ী হবার পরে হলেন বিখ্যাত কবিরাজ— আর শেষে গুহাবাসী সন্ন্যাসী (*কেদারনাথে*)।

অবিশ্বাস্য ছিটগ্রস্ত *গোঁসাইপুর*-এর শ্যামলাল মল্লিক। ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে, বিংশ শতাব্দীকে পুরো নাকচ করে তিনি ব্যবহার করেন লণ্ঠন আর টানা পাখা। আধুনিক ওষুধ, টুথব্রাশ, ফাউন্টেন পেন, জুতো, চেয়ার — সব বাতিল। চুরুট ছেড়ে গড়গড়া ধরেছেন, গাড়ির বদলে পালকি চড়েন, দারোয়ানকে বন্দুকের বদলে দিয়েছেন ঢাল-তরোয়াল।

অনেক মক্কেলের আছে আশ্চর্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ। শিকারী *কৈলাস চৌধুরী*, ডক্টর রাজেন *মুনসী*, বিরূপাক্ষ মজুমদার (*দার্জিলিং*) ও মহীতোষ সিংহরায় (*রয়েল*)-এর বাড়িতে জানোয়ারের মাথা ও ছালের ছড়াছড়ি। সিংহরায় প্যালেসে তো 'ট্রফি রুম'-এ ঠাসা রয়েছে তিন পুরুষের বাঘ, ভাল্লুক, বাইসন, হরিণ, কুমীরের চামড়া ও মাথা, উপরন্তু আছে বন্দুক— একনলা, দোনলা, পাখিমারা, বাঘমারা, হাতিমারা। সে বাড়িতেই ঠাকুর্দা আদিত্যনারায়ণের ঘরে বন্দুক, পিস্তল, তরোয়াল, ছোরা, ভোজালি, কুকরি এবং বাঘের নখ, গণ্ডারের শিং, হাতির দাঁত ছাড়াও আছে মড়ার খুলি, মোগল দূরবীন, পাথের-বসানো কুকুরের বকলস . . .!

রাজেন মজুমদারের মুখোশের সংগ্রহ (*ফেলুদা*)। রাধারমণ সমাদ্দারের বাড়ি বাদ্যযন্ত্রের মিউজিয়াম। দুর্গাগতি সেনের নেশা দুর্লভ প্রাচীন পুঁথি (*হত্যাপুরী*)। মহেশ চৌধুরীর সংগ্রহ পাথর, প্রজাপতি আর ডাকটিকিট (*ছিন্নমস্তা*)। *ঘুরঘুটিয়া*-র কালীকিঙ্কর অজ পাড়াগাঁয়ের আদ্যিকালের জমিদারবাড়িতেও সমঝদারের মতো জমিয়েছেন গোয়েন্দাকাহিনী, প্রত্নতত্ত্ব, আর্ট, বাগান, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণ সম্বন্ধে শ'য়ে শ'য়ে দুষ্প্রাপ্য বই। পার্বতীচরণ হালদার পৃথিবী ঘুরে সংগ্রহ করেছেন দুষ্প্রাপ্য কিউরিও— মুঘল দাবা-বোড়ে, ওয়ারেন হেস্টিংস্-এর নস্যির কৌটো, পিস্তল, ম্যাপ, *নেপোলিয়নের চিঠি*...। বিরূপাক্ষ মজুমদারের সংগ্রহ খবরের কাগজের কাটিং — খুন, রাহাজানি, দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, হত্যা ইত্যাদির (*দার্জিলিং*)। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক নীহার দত্ত গবেষণাগারের দুর্ঘটনায় অন্ধ হয়েও সেক্রেটারির সাহায্যে সংগ্রহ করে চলেছেন নব নব আবিষ্কারের খবর (*গোলকধাম*)।

দীননাথ লাহিড়ীর আছে তাঁর বাবার কেনা গাড়ি — হিস্প্যানো সুইজা আর ল্যাগোণ্ডা (*বাক্স-রহস্য*)। সাধারণ ভিন্টেজ কার নয়, প্রথমটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে তৈরি পৃথিবীর সর্বাধিক শক্তিশালী গাড়ির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু দীননাথবাবুর জ্যাঠার দামী হীরে আর জ্যাঠার বন্ধুর তিব্বত ভ্রমণের অমূল্য পাণ্ডুলিপি বাড়িতে জঞ্জালের মধ্যেই পড়ে ছিল বহু দশক ধরে।

মক্কেলদের নিকট আত্মীয়ের মধ্যে আছে আরো বেশ কিছু বিচিত্র ও আশ্চর্য চরিত্র। রামপুরের নবাব-তালুকদার মক্কেলদের কাছ থেকে শঙ্করপ্রসাদের ঠাকুর্দা

ব্যারিস্টার বানোয়ারিলাল চৌধুরী যা সোনাদানা পারিতোষিক পান তার অবশিষ্ট ভগ্নাংশের দামই লাখ পঞ্চাশেক (*জাহাঙ্গীর*)। অনীকেন্দ্র সোমের বন্ধু হিমাদ্রী চক্রবর্তী হেলিকপ্টার পাইলট (*কাঠমাণ্ডুতে*)। তাঁর বাপ-ঠার্কুদা নেপালের রাজপরিবারের গৃহশিক্ষক ছিলেন। মহেশ চৌধুরীর ছেলে প্রীতিন্দ্রর সাধারণ চাকরি পেতেও বেগ পেতে হয়, কিন্তু তাঁর অসাধারণ হবি— রাস্তাঘাটে বনবাদাড়ে হাতে টেপ রেকর্ডার নিয়ে পাখির ডাক সংগ্রহ করা (*ছিন্নমস্তা*)।

হেক্টর জয়ন্ত বিশ্বাসের মা ভার্জিনিয়া ছিলেন ইংরেজ সেনাপতি টমাস রেনল্ডস্ ও বাইজী ফরিদা বেগমের মেয়ে— শকুন্তলা দেবী নামে তিনি হন ভারতীয় নির্বাক চলচ্চিত্রের অন্যতম সেরা অভিনেত্রী। সৌম্যশেখর নিয়োগীর ঠাকুর্দার ভাই চন্দ্রশেখর ইটালিতে চিত্রাঙ্কন শিখে বিয়ে করেন অভিজাত পরিবারের মেয়ে কার্লা ক্যাসিনিকে। বিয়েতে শ্বশুর তাঁকে উপহার দেন তিনশ' বছরের পুরনো টিনটোরেটোর আঁকা ছবি, বর্তমানে যার দাম পঁচিশ লক্ষ টাকা। স্ত্রীর মৃত্যু ও ছেলের সঙ্গে অশান্তিতে দেশে ফিরে এসে রাজা-মহারাজাদের ছবি এঁকে বেড়ান তিনি — শেষ বয়সে বাড়ি ছেড়ে হয়ে যান সন্ন্যাসী।

মহীতোষ সিংহরায়ের বিখ্যাত ঠার্কুদা আদিত্যনারায়ণের প্রিয় কুকুরকে বাঘে মারতে তাঁর রোখ চেপে যায়— বন্দুক কিনে, শিকারী হয়ে, ব্যাঘ্রবংশ ধ্বংস করতে থাকেন তিনি বাইশ বছর ধরে (*রয়েল*)। দেড়শ' বাঘ মারার পর অবশ্য ভীমরতি হয়ে একা তরোয়াল দিয়ে বাঘ মারতে গিয়ে শেষটাতে বাঘের পেটেই পৌঁছন তিনি। আবার মহীতোষবাবুর ছিটগ্রস্ত দাদা দেবতোষ রবারের সাইলেন্সার লাগান খড়ম পরে সকলকে জিজ্ঞেস করেন হোসেন খাঁ (গৌড়ের সুলতান), রাজু (গৌড়ের সেনাপতি কালা পাহাড়) ও ভোটরাজা (ভুটানের রাজা)-র খবর।

ফেলুদার গল্পের কিছু দুর্ধর্ষ শিশুচরিত্রের মধ্যে আছে অম্বিকা ঘোষালের দশ বছরের নাতি রুকু (*জয় বাবা*)। কখনো সে ক্যাপ্টেন স্পার্ক হয়ে শয়তান সিং-

'অষ্টাদশসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'
বললেন দুর্গাগতি সেন....
(*হত্যাপুরী*)

অবিশ্বাস্য ছিটগ্রস্ত *গোঁসাইপুর*-এর শ্যামলাল মল্লিক, চুরুট ছেড়ে গড়গড়া ধরেছেন

(গোঁসাইপুর সরগরম)

এর পেট ফাঁসিয়ে দিচ্ছে, কখনো বা এমনই হেঁয়ালি বানাচ্ছে যে তার সমাধান করতে স্বয়ং ফেলুদারও ফেল মারার উপক্রম হচ্ছে।

মুকুলকে তো *সোনার কেল্লা* সিনেমাতে অনেকেই দেখেছ। যখন সে তার পূর্বজন্মের স্মৃতির মধ্যে ডুবে যায় তখন মাঝরাতেও সে ছবি এঁকে চলে— বহু শতাব্দী আগের জয়সালমীরে তার ছেলেবেলার ঘটনার।

ফেলুদার অনেক মক্কেলই, হয়তছেলে বা ভাইয়েদের সঙ্গে বনিবনার অভাবে, বেশ নিঃসঙ্গ চরিত্র। মহেশ চৌধুরীর হেঁয়ালির সমঝদার তাঁর পাঁচ বছর বয়সের নাতনী 'জোড়ামৌমাছি' (*ছিন্নমস্তা*)। রাধারমণ *সমাদ্দারের* সুরবিনিময় শুধু প্রতিবেশী অবনী সেনের ৮-১০ বছর বয়স্ক ছেলের সঙ্গে। *অম্বর সেন* নাটকটাই ছকেছেন তাঁর ১০ বছরের ভাইঝি রুণার জন্য। ইন্দ্রনারায়ণ আচার্যের লেখা ও গানের প্রথম ও প্রধান সমালোচক তাঁর ১৪ বছরের ভাইঝি লীনা (বোসপুকুরে)।

আরেক আশ্চর্য — হঠাৎ একদিন ছোট্ট ছেলে *নয়ন*-এর চোখের সামনে কিলবিল করতে লাগল ১, ২, ৩, ৪... যত সব সংখ্যা। সংখ্যায় উত্তর হয় এমন যে-কোনো প্রশ্ন শুনলেই, ওই সংখ্যারা হঠাৎ সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের উত্তর বলে দেয় তাকে। এমনকি পরদিনের রেসে কত নম্বর ঘোড়া জিতবে, তাও বলে দিতে পারে নয়ন।

বহু মক্কেলের ব্যক্তিগত সেক্রেটারি আছে। সাধারণত একজন অনাথ, অবিবাহিত যুবক যে ওই বাড়িতেই থাকে। আপাতভাবে সে বিশ্বস্ত আপনজন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। একেক মক্কেল সেক্রেটারিকে নিজের ছেলের চেয়েও বেশি বিশ্বাস করেন।

খুন হবেন দুর্গাগতি সেনের সেক্রেটারি নিশীথ বোস (*হত্যাপুরী*) ও নিয়োগী পরিবারের সেক্রেটারি বঙ্কিমবাবু (*টিনটোরেটো*)। রহস্যময় ও বীভৎসভাবে মরবেন মহীতোষবাবুর সেক্রেটারী তড়িৎ সেনগুপ্ত (*রয়েল*), ঘটনাটি খুন কি খুন নয় বোঝা ফেলুদার পক্ষেও শক্ত কাজ। যেখানেই বাড়িতে খুন বা চুরি,

সাসপেক্টের তালিকায় সেক্রেটারি থাকতে বাধ্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেক্রেটারি খুন করেছেন বা খুন করার চেষ্টা করেছেন — হয়তো কোনো পুরানো অন্যায়ের বদলা নেবার জন্য।

বেশ ক'জন মক্কেল কোটিপতি। দুর্গাপতি সেনের ব্যবসার শেয়ার ছাড়াও পাঁচটা বাড়ি আছে (*হত্যাপুরী*)। শঙ্করপ্রসাদ চৌধুরীর প্রসাদোপম বাড়ি ও নিজস্ব কারখানা ছাড়াও সোনাদানাই আছে পঞ্চাশ লাখ টাকার বেশি। বিরূপাক্ষ মজুমদার একা থাকেন ষোলো কামরার ছড়ানো বাগানবাড়িতে (*দার্জিলিং*)। *কৈলাস চৌধুরী* ও কীর্তিনারায়ণ আচার্যের (*বোসপুকুরে*) কলকাতায় বড়সড় জমিদারবাড়ি।

মক্কেলদের সাধারণত পুরোনো সাহেবী ধাঁচের বাড়ি। অনেক বাড়িতেই শ্বেতপাথরের মেঝে, বিরাট বিরাট ঘর, সাজান বৈঠকখানা। বাড়ির কম্পাউণ্ডের মধ্যে নুড়ি-বিছানো (বা নুড়িঢালা বা নুড়িবাঁধানো) রাস্তা।

মক্কেল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের কলকাতার বাড়ির ঠিকানাগুলো হল ঃ

আছে শুধু ১, ৩, ৫, ৭, ও ৮। ২, ৪, ৬, ৯ ও ০ বিলকুল অনুপস্থিত। তেরোটি সংখ্যার মধ্যে শুধু ১, ৫ ও ৭ আছে এগার বার!

বহু মক্কেলের জীবনে গোপন রহস্য আছে। হয়ত তার জন্যেই এখন তাঁর জীবন বিপন্ন। মহেশ চৌধুরী কম বয়সে একবার মাতাল অবস্থায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে একটা কুকীর্তি করেছিলেন (*ছিন্নমস্তা*)। ডাক্তার রাজেন মুনসীর জীবনেও একটা প্যাঁচাল রহস্য আছে, যার বদলা নেবার চেষ্টা করছেন একজন। বিরূপাক্ষ মজুমদারের শিকার অভিযানে একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছিল (*দার্জিলিং*), তার রেশ ফিরে এসেছে বহু বছর বাদে। আবার দ্বিতীয় প্যাঁচ — বিরূপাক্ষবাবুর ব্যাঙ্কের বহু টাকা তছরূপ করে পালিয়েছিলেন একজন। কে সে? এখন সে কোথায়?

মহীতোষ সিংহরায়ের লেখা সুখপাঠ্য শিকারের বই অনুযায়ী তিনি বাঘ মেরেছেন একাত্তরটি, লেপার্ড পঞ্চাশের বেশি (*রয়েল*)। কিন্তু এর পিছনে দুটো জোরাল প্যাঁচ রয়েছে — ছিটগ্রস্ত দাদা দেবতোষবাবুর কিছু কথায় মহীতোষবাবু ব্যস্তসমস্ত, প্রায় আতঙ্কিত

সারণি (৩) ঃ ফেলুদার গল্পের চরিত্রের বাড়ির ঠিকানা

গল্পের নাম	চরিত্রের নাম	চরিত্রের শ্রেণী	বাড়ির ঠিকানা
অপ্সরা থিয়েটারের মামলা	মহীতোষ রায়	খলমক্কেল	৫, পণ্ডিতিয়া প্লেস
অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য	অম্বর সেন	ছলমক্কেল	৫/১, পাম এ্যাভিনিউ
ডাঃ মুনসীর ডায়েরী	রাজেন মুনসী	মক্কেল	৭, সুইনহো স্ট্রীট
গোলকধাম রহস্য	নীহার দত্ত	মক্কেল	৭/১, বালিগঞ্জ পার্ক
শেয়াল দেবতা রহস্য	প্রতুল দত্ত	সাসপেক্ট	৭/১, লাভলক স্ট্রীট
নয়ন রহস্য	অসীম সরকার	নয়নের বাবা	৮, নিকুঞ্জবিহারী লেন
লণ্ডনে ফেলুদা	রঞ্জন মজুমদার	মক্কেল	১৩, রোল্যান্ড রো
কৈলাস চৌধুরীর পাথর	কৈলাস চৌধুরী	মক্কেল	৫১, শ্যামপুকুর স্ট্রীট

কলকাতার অনেক রাস্তাতেই ২০০ অবধি নম্বর আছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে অধিকাংশ বাড়ির নম্বর ৫ থেকে ৮ এর মধ্যে। আটটি ঠিকানায় তেরোটি সংখ্যা থাকলেও

হয়ে ওঠেন কেন?

প্রাক্তন বিচারপতি সিদ্ধেশ্বরবাবু জানেন তিনি সম্ভবত কয়েক জন নির্দোষ আসামীর ফাঁসির হুকুম

বিরূপাক্ষবাবু রোজ সারা রাত জেগে থাকেন, ঘুমোন সারা দুপুর *(দার্জিলিং)*

দিয়েছেন। তিনি প্ল্যানচেটেই তাঁদের আত্মাদের ডেকে আসল ঘটনা জানতে চাইছেন, আর যাঁরা নির্দোষ তাদের কাছে ক্ষমা চাইছেন (*ভূস্বর্গ*)। আত্মারা ক্ষমা করছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও জানাচ্ছে যে তাদের জীবিত আত্মীয়রা সিদ্ধেশ্বরবাবুকে ক্ষমা নাও করতে পারে। কারা তারা? সিদ্ধেশ্বরবাবু ছেলে ও ফেলুদাকে আক্রমণ করছে কি একই লোক?

অনেক মক্কেল অন্যায় করে পার পেয়েছিলেন বহু বছর আগে। ফেলুদার মক্কেলদের ক্ষেত্রে সর্বদাই দেখা যায় তাঁরা অনুশোচনায় ছটফট করেছেন বহু বছর ধরে, প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে তাঁদের। শেষটায় ধরা পড়ে যাবেন তাঁরা। নিদেনপক্ষে তাঁদের মৃত্যুতে সেই পর্বের অবসান ঘটবে।

মক্কেলদের বিষয়ে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জটিল প্যাঁচগুলোর অর্ধেকের বিষয়েই অবশ্য বলা গেল না। কারণ সেই প্যাঁচের সূত্রগুলি জড়িয়ে আছে রহস্যের প্লটের জটের গিঁটে গিঁটে। সেগুলো খোল্‌সা করে বলতে গেলে তো জমাটি প্লটগুলোই ফাঁস হয়ে যাবে — তোমরা ফেলুদার যে বইগুলো এখনো পড়নি, সেগুলো পড়ার সব মজাই মাটি হবে তাহলে!

ফেলুদার গল্পের রঙচঙে চরিত্রগুলোই বিশেষ স্বাদ দিয়েছে রহস্যগুলিকে। আর মক্কেলের সমস্যার সমাধান করাই তো 'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর'-এর কাজ — মক্কেল না থাকলে ফেলুদা গোয়েন্দা হবেনই বা কী করে? সুতরাং এই বিচিত্র মক্কেলদের অতি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে ফেলুদার জগতে।

মক্কেল ও তার পারিপার্শ্বিক চরিত্রদের গড়তে ফেলুদার স্রষ্টা ঢেলে দিয়েছেন নিজের জীবনের সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বিগত প্রজন্মের বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক চরিত্রের বিষয়ে শোনা গল্প। তারপর তাদের ছকে সাজিয়েছেন দু'-চার পোঁচ পালিশ বা রঙ মেরে। এই অনবদ্য চরিত্ররাই সৃষ্টি করেছে ফেলুদার গল্পের আশ্চর্য জনপ্রিয়তা।

খেরোর খাতা

সত্যজিৎ রায়

প্রথম পাতা (১৭.৮.৭৩)

মেক-আপ স্কেচ। ফেলুদার পরচুলা কেমন হবে।

বিভিন্ন দৃশ্যে ফেলুদার কস্‌টিউম।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে তৈরি ফেলুদা ও মুকুলের বাড়ির ফ্লোর-প্ল্যান।

উপরে ফেলুদার বৈঠকখানা ও নিচে মুকুলের ঘরের স্কেচ।
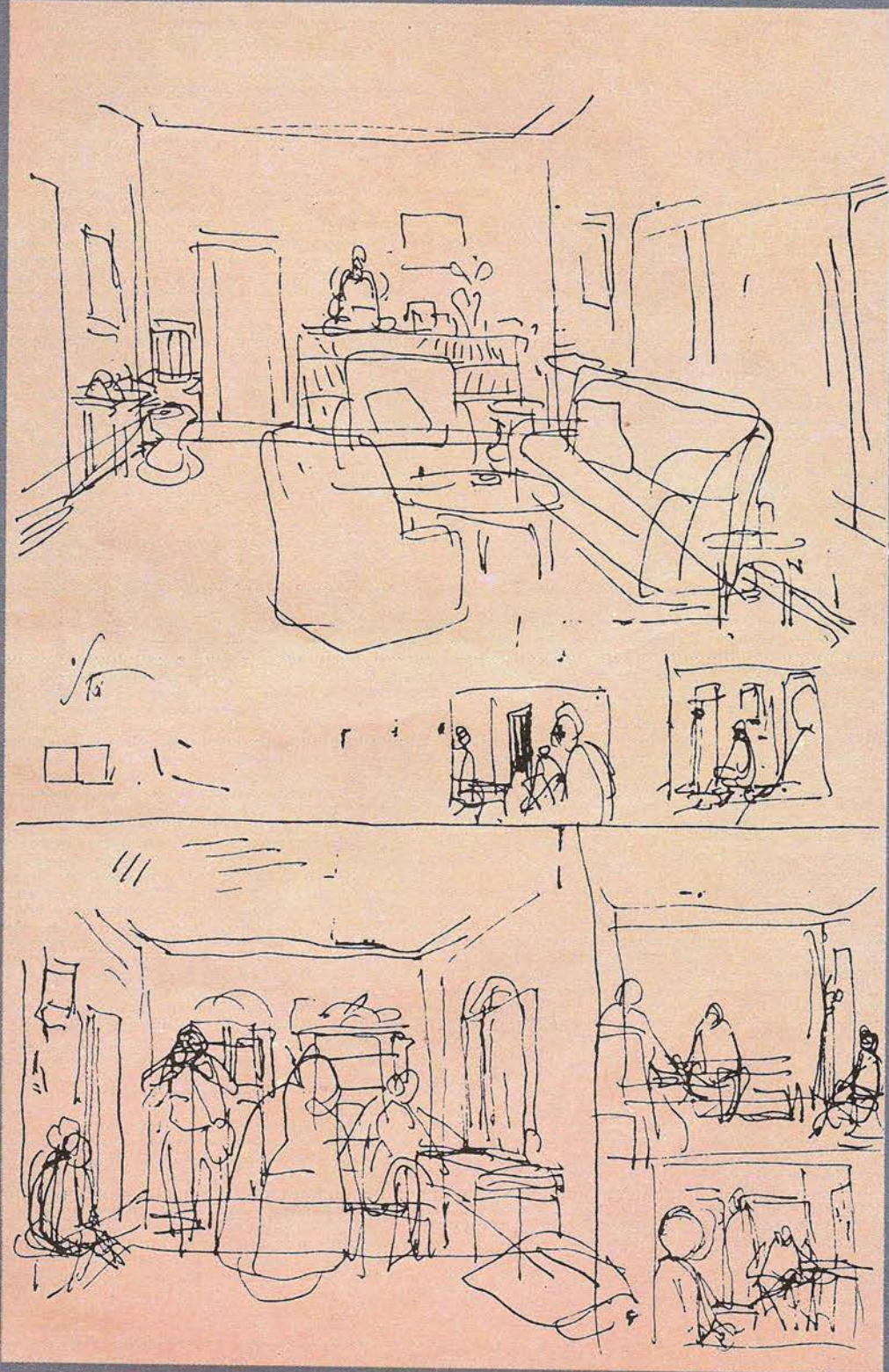
কস্‌টিউম স্কেচ। কানপুর স্টেশনে জটায়ুর প্রথম আবির্ভাব।

জটায়ুর সব চোখ-ঝল্‌সানো ছদ্মবেশ!

সিধুজ্যাঠা, উকিল শিবরতন ও মুকুলের বাবা সুধীর ধরের কস্‌টিউম।
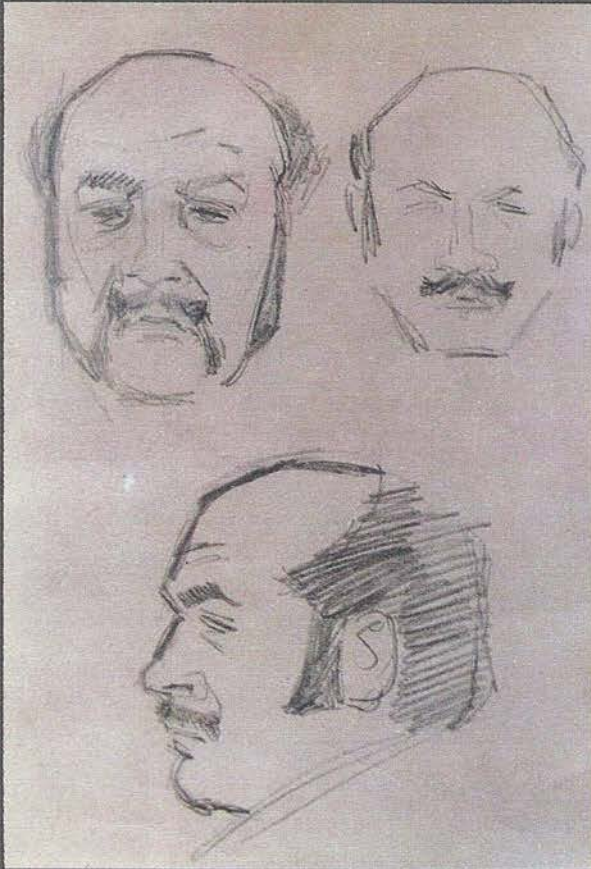
মন্দার বোস ও অমিয়নাথ বর্মনের মেক-আপ স্কেচ।
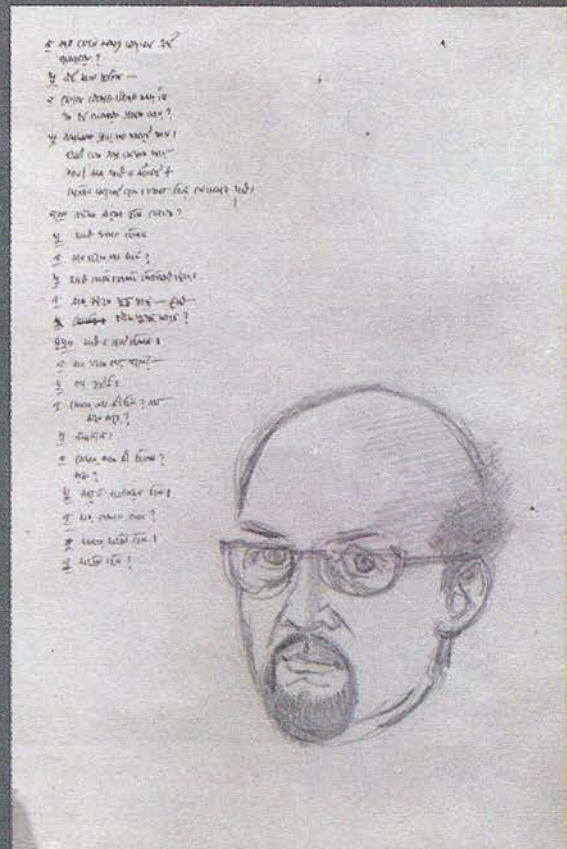
'সোনার কেল্লা'র লোগো, ডাঃ হাজরাকে করা সুধীর ধরের টেলিগ্রামের খসড়া এবং পরিচালকের সই সমেত এক জবর পাতা।
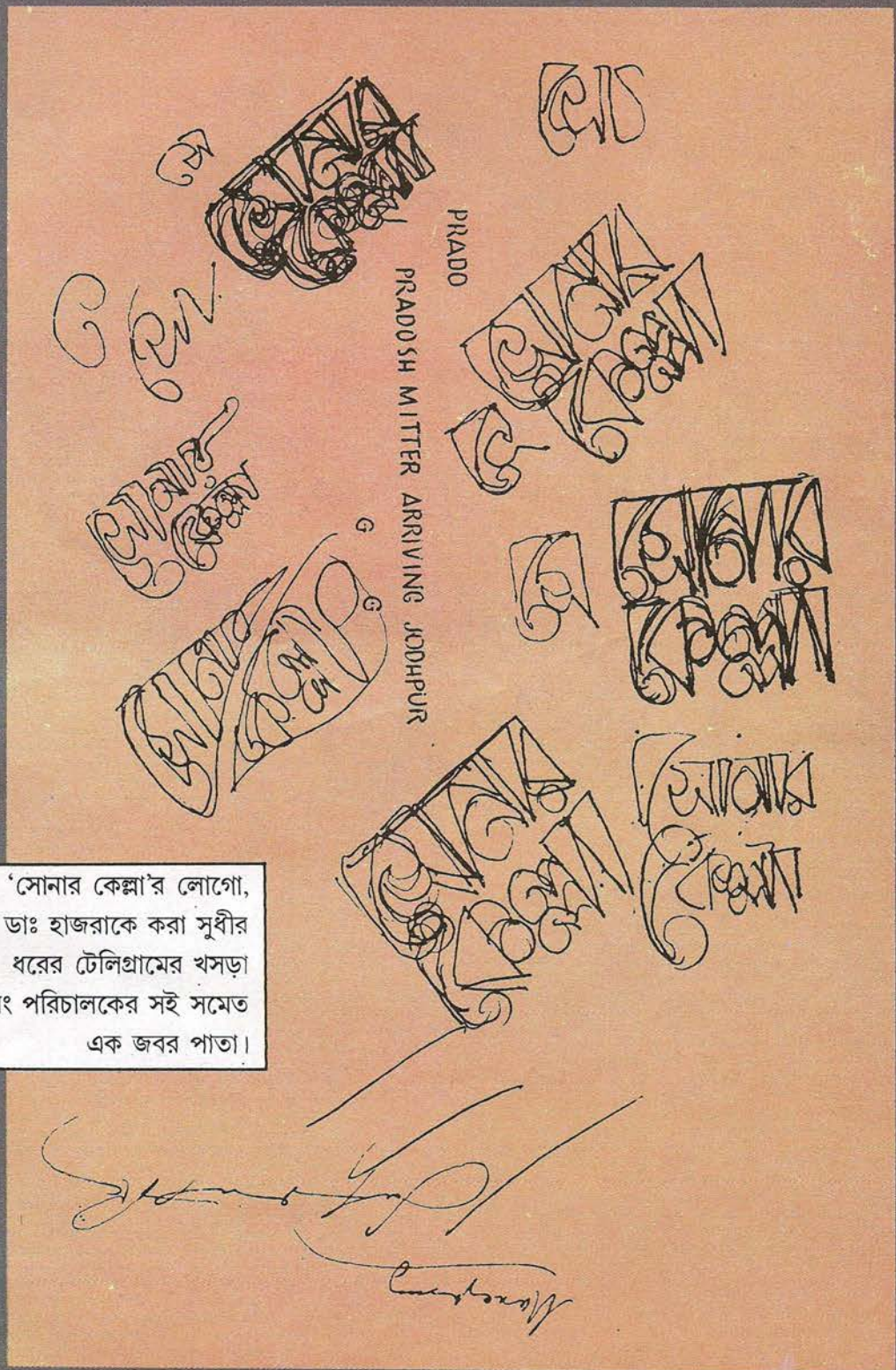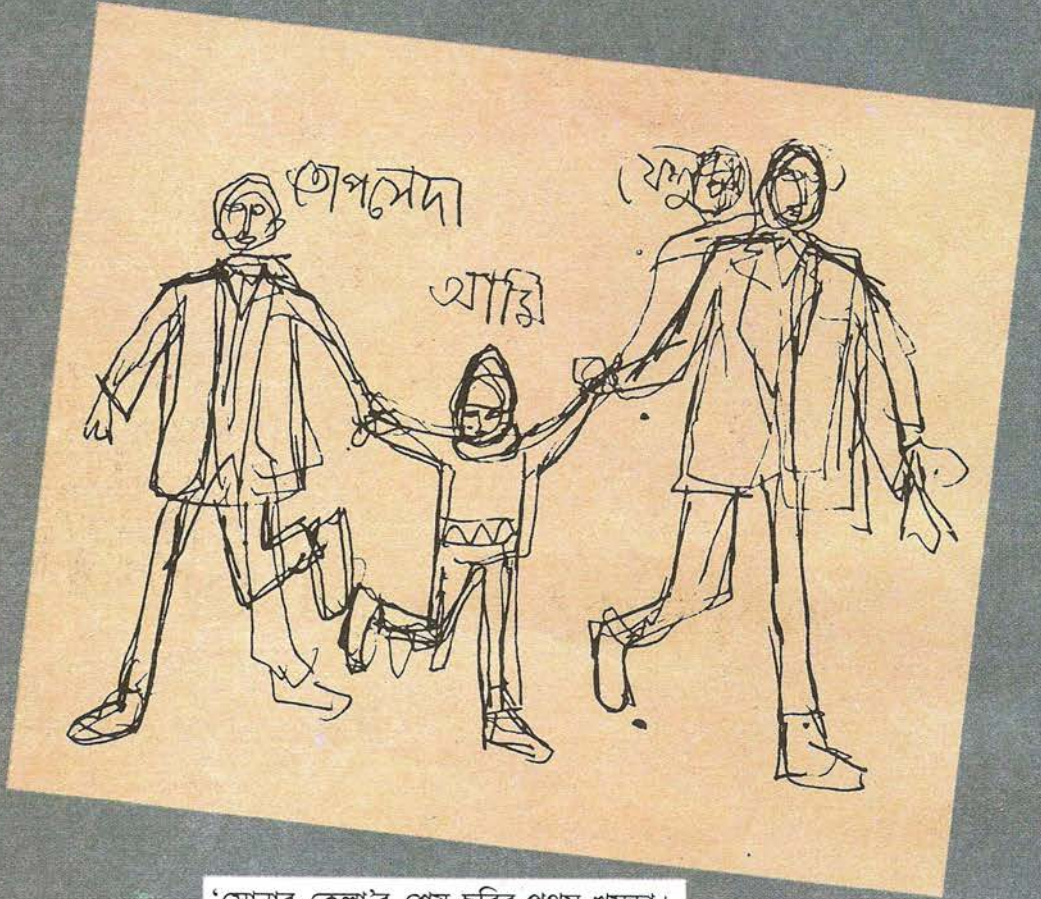
'সোনার কেল্লা'র শেষ ছবির প্রথম খসড়া।

সত্যজিৎ রায়
ইন্দ্রজাল রহস্য
গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

২২।৪।৫৭

১
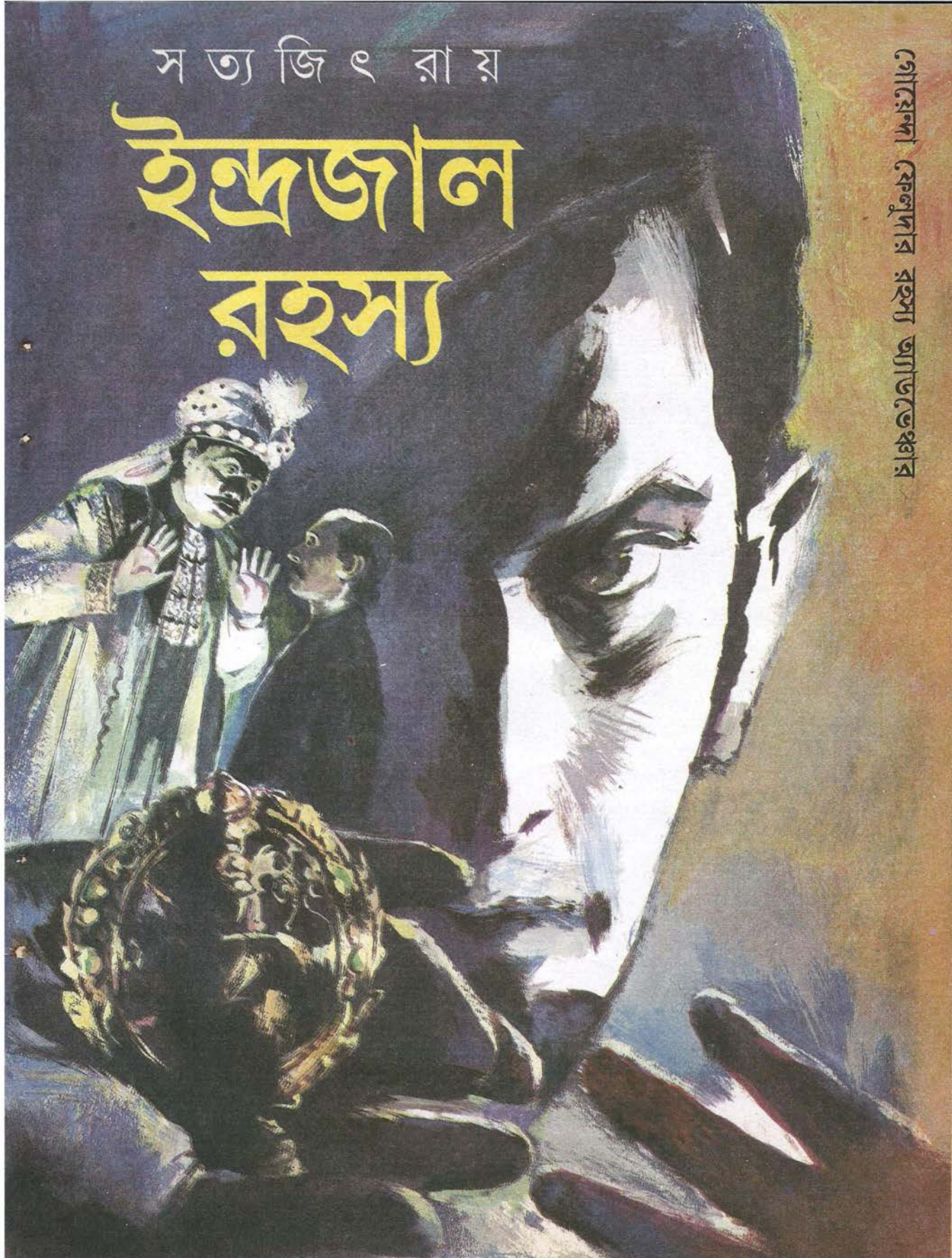
অন্য অনেক জিনিসের মতো ম্যাজিক সম্বন্ধেও ফেলুদার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। এখনো ফাঁক পেলে তাসের প্যাকেট হাতে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাতসাফাই অভ্যাস করতে দেখেছি। সেইজন্যেই কলকাতায় সূর্যকুমারের ম্যাজিক হচ্ছে দেখে, আমরা তিনজনে ঠিক করলাম একদিন গিয়ে দেখে আসব। তৃতীয় ব্যক্তিটি অবশ্য আমাদের বন্ধু রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু। যারা ম্যাজিকের আয়োজন করেছে তারা ফেলুদার খুব চেনা, তাই চাইতেই তিনখানা প্রথম সারির টিকিট পাওয়া গেল।

গিয়ে দেখি হল প্রায় ছ'আনা ফাঁকা। ম্যাজিক যা দেখলাম নেহাৎ খারাপ নয়, কিন্তু ম্যাজিশিয়ানের ব্যক্তিত্বে কোথায় যেন ঘাটতি আছে। ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ির সঙ্গে একটা চুম্‌কি বসানো সিল্কের পাগড়ি, কিন্তু গলার আওয়াজটা পাতলা। গোলমালটা সেখানেই। অথচ ম্যাজিশিয়ানকে অনর্গল কথা বলে যেতে হয়।

সামনের সারিতে বসার ফলে হল কী, হিপ্‌নোটিজ্‌ম দেখাতে ভদ্রলোক লালমোহনবাবুকে স্টেজে ডেকে নিলেন। এ-জিনিসটা ভদ্রলোক ভালোই জানেন। লালমোহনবাবুর হাতে পেনসিল দিয়ে, সেটাকে কামড়াতে বলে জিগ্যেস করলেন, 'চকোলেট কেমন লাগছে?'

লালমোহনবাবু সম্মোহিত অবস্থায় বললেন, 'খাসা, চমৎকার চকোলেট।'

পাঁচ মিনিট স্টেজে ছিলেন, তার মধ্যে জটায়ু একেবারে নাজেহাল হয়ে গিয়েছিলেন, আর লোকেও উপভোগ করল খুব। লালমোহনবাবু জ্ঞান ফিরে পাবার পরে হাততালি আর থামে না।

পরদিন ছিল রবিবার। লালমোহনবাবু তাঁর সবুজ অ্যাম্বাসাডরে ঠিক ন'টার সময় চলে এসেছিলেন তাঁর গড়পারের বাড়ি থেকে আড্ডা মারতে। তখনো ম্যাজিকের কথা হচ্ছে।

ফেলুদা বলল, 'ঠিক জমাতে পারছে না লোকটা। কালকেও সীট খালি ছিল দেখেছিলি?'

লালমোহনবাবু বললেন, 'কিন্তু যাই বলুন মশাই, আমাকে যেভাবে বোকা বানালো, তাতে বলতেই হবে কৃতিত্ব আছে। পেনসিল চিবিয়ে চকোলেট, পাথর কামড়ে কড়া-পাকের সন্দেশের স্বাদ— এ ভাবা যায় না।'

শ্রীনাথ সবে চা এনেছে, এমন সময় বাইরে গাড়ি থামার শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় টোকা পড়ল। অথচ কারুর আসার কথা নেই। খুলে দেখি, বছর ত্রিশেকের ভদ্রলোক।

'এটাই প্রদোষ মিত্তিরের বাড়ি?'

ফেলুদা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি ভেতরে আসুন।'

ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। ফরসা, রোগা, চোখে চশমা। বেশ সপ্রতিভ চেহারা।

সোফার একপাশে বসে বললেন, 'টেলিফোনে অনেক চেষ্টা করেও আপনার লাইনটা পেলাম না। তাই এমনিই চলে এলাম।'

'ঠিক আছে।' বলল ফেলুদা, 'আপনার প্রয়োজনটা যদি বলেন।'

'আমার নাম নিখিল বর্মন। আমার বাবার নাম হয়তো আপনি শুনে থাকবেন— সোমেশ্বর বর্মন।'

'যিনি ভারতীয় জাদু দেখাতেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আজকাল ত আর নাম শুনি না। রিটায়ার করেছেন বোধহয়?'

'হ্যাঁ, বছর সাতেক হল আর ম্যাজিক দেখান না।'

'উনি ত স্টেজে ম্যাজিক দেখাতেন না বোধহয়?'

'না। এমনি ফরাসে দেখাতেন। ওঁর চারদিকে লোক ঘিরে বসত। সাধারণত নেটিভ স্টেটগুলোতে ওঁর খুব নাম ছিল। বহু রাজাদের ম্যাজিক দেখিয়েছেন। তাছাড়া বাবা নানান দেশ ঘুরে ভারতীয় ম্যাজিক সম্বন্ধে নানান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলো একটা বড় খাতায় লেখা আছে। বাবা ইংরিজিতে লিখেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'ইন্ডিয়ান ম্যাজিক'। ওটা একজন কিনতে চেয়েছেন বাবার কাছে। কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত অফার করেছেন। বাবা চাচ্ছিলেন আপনাকে একবার লেখাটা দেখাতে। কারণ বাবা ঠিক মনস্থির করতে পারছেন না।'

'কুড়ি হাজার টাকা দিতে চেয়েছে কে জানতে পারি?'

'জাদুকর সূর্যকুমার নন্দী।'

আশ্চর্য! কালই আমরা সূর্যকুমারের ম্যাজিক দেখে এসেছি! একেই ফেলুদা বলে টেলিপ্যাথি।

ফেলুদা বলল, 'বেশ, আমি লেখাটা নিশ্চয়ই দেখব। তাছাড়া আপনার বাবার সঙ্গে আমার আলাপ করারও যথেষ্ট ইচ্ছে আছে।'

'বাবাও আপনার খুব গুণগ্রাহী। বলেন, অমন শার্প বুদ্ধি বাঙালিদের বড়-একটা দেখা যায় না। আমার মনে হয়, এর মধ্যেই একদিন এসে পড়ুন না। বাবা সন্ধ্যায় রোজই বাড়ি থাকেন।'

'ঠিক আছে। আমরা আজ সন্ধ্যাতেই তাহলে আসি।'

'বেশ ত। এই সাড়ে ছ'টা নাগাৎ?'

'তাই কথা রইল।'

২

রামমোহন রায় সরণিতে সোমেশ্বর বর্মনের পেল্লায় বাড়ি। এঁরা আগে পূর্ববঙ্গের জমিদার ছিলেন, অনেকদিন থেকেই কলকাতায় চলে এসেছেন। এখন বাড়িতে অধিকাংশ ঘরই খালি পড়ে আছে। বাড়িতে চাকর বাদে লোক মাত্র পাঁচজন। সোমেশ্বর বর্মন, তাঁর ছেলে নিখিল, মিঃ বর্মনের সেক্রেটারি প্রণবেশ রায়, মিঃ বর্মনের বন্ধু অনিমেষ সেন, আর রণেন তরফদার বলে এক শিল্পী। ইনি নাকি সোমেশ্বরবাবুর একটা পোর্ট্রেট করছেন। এসব খবর আমরা সোমেশ্বরবাবুর কাছ থেকেই পেলাম। ভদ্রলোকের বয়স ধরা যায় না। কারণ চুল এখনো তেমন পাকেনি, চোখ দুটো উজ্জ্বল, যেমন জাদুকরের হওয়া উচিত। আমরা একতলায় সোফায় বসেছিলাম। নিখিলবাবু আমাদের জন্য চায়ের অর্ডার দিলেন।

'আমার বাবা ছিলেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।' বললেন সোমেশ্বরবাবু, 'ভালো পসার ছিল। আমি ল' পড়েছিলাম, কিন্তু সেদিকে আর যাইনি। আমার ঠাকুরদাদা ছিলেন তান্ত্রিক। হয়তো তাঁরই কিছুটা প্রভাব আমার

চরিত্রে পড়েছিল। আমি ছোটবেলা থেকেই ভারতীয় জাদুবিদ্যার দিকে ঝুঁকি। এলাহাবাদে একটা পার্কে এক বুড়োর ম্যাজিক দেখেছিলাম। তার হাত-সাফাইয়ের কোনো তুলনা নেই। মঞ্চের ম্যাজিকের অর্ধেকই আজ যন্ত্রপাতির সাহায্যে হয়, সেইজন্য তাতে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। ভারতীয় ম্যাজিক হল আসল ম্যাজিক, যেখানে মানুষের দক্ষতাই সম্পূর্ণ কাজটা করে। তাই আমি কলেজের পড়া শেষ করে, এইসব ম্যাজিক সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়ি। সুবিধে ছিল বাবা এসব বিষয়ে খুব উদার ছিলেন। আমি একটা নতুন কিছু করছি, এটাতে তিনি খুশিই হয়েছিলেন। আসলে আমাদের পরিবারে নানান লোকে নানান কাজ করে এসেছে চিরকালই। ডাক্তার, উকিল, গাইয়ে, অভিনেতা, সাহিত্যিক— সবরকমই পাওয়া যাবে আমাদের এই বর্মন পরিবারে, আর তাদের মধ্যে অনেকেই রীতিমতো সফল হয়েছেন। যেমন আমি হয়েছিলাম জাদুতে। আমার সব রাজা-রাজড়াদের কাছ থেকে ডাক আসত। প্রাসাদের ঘরে ফরাসের উপর বসে ম্যাজিক দেখাতাম— সব লোক হাঁ হয়ে যেত। রোজগারও হয়েছে ভালো। কোনো ধরাবাঁধা ফী ছিল না আমার। কিন্তু যা পেতাম, সেটা প্রত্যাশার অনেক বেশি।'

চা এসে গিয়েছিল। ফেলুদা একটা কাপ তুলে নিয়ে বলল, 'এবার আপনার পাণ্ডুলিপির কথা বলুন। শুনেছি, ভারতীয় জাদু নিয়ে আপনি একটা বড় কাজ করেছেন।'

'তা করেছি,' বললেন সোমেশ্বর বর্মন, 'আমি যা করেছি, তেমন আর-কেউ করেছে বলে আমার জানা নেই। এ-নিয়ে আমি প্রবন্ধ-টবন্ধও লিখেছি, এবং তার ফলেই আমার পাণ্ডুলিপির ব্যাপারটাও জানাজানি হয়ে গেসল। সেই কারণে সূর্যকুমার আমার কাছে আসে। নইলে তার ত জানার কথা নয়। অবিশ্যি জাদুকর হিসেবে সে আমার নাম আগেই শুনেছে।'

'সে কি আপনার পাণ্ডুলিপিটা কিনতে চায়?'

'তাই ত বলে। সে সোজা আমার বাড়িতে চলে এসেছিল। আমার বেশ ভালো লাগে ছেলেটিকে, দেখেছি কেমন একটা স্নেহ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওর অফারটায় আমি ঠিক রাজি হতে পারছি না। আমার ধারণা আমার কাজটা খুব জরুরি কাজ, এবং তার মূল্য বিশ হাজারের চেয়ে অনেক বেশি। সেইজন্যেই চাচ্ছিলাম পাণ্ডুলিপিটা আপনি একটু পড়ে দেখুন। আপনার ত নানান বিষয় পড়াশোনা আছে। সেটা আপনার কেসগুলো সম্বন্ধে পড়ে দেখলেই বোঝা যায়।'

'বেশ ত। আমি সাগ্রহে পড়ব আপনার লেখা।'

সোমেশ্বরবাবু তাঁর সেক্রেটারির দিকে ফিরে বললেন, 'প্রণবেশ, যাও ত খাতাটা একবার নিয়ে এস।'

সেক্রেটারি চলে গেলেন আজ্ঞা পালন করতে।

ফেলুদা বলল, 'আমরা কাল সূর্যকুমারের ম্যাজিক দেখতে গিয়েছিলাম।'

'কেমন লাগল?'

'মোটামুটি।' বলল ফেলুদা, 'তবে ভদ্রলোক হিপ্‌নোটিজ্‌মটা বেশ আয়ত্ত করেছেন। আর যা ম্যাজিক, সবই যন্ত্রের কারসাজি।'

সোমেশ্বরবাবু হঠাৎ সামনের প্লেট থেকে একটা বিস্কুট তুলে নিয়ে, সেটা হাতের মুঠোয় বন্ধ করে, পরমুহূর্তেই হাত খুলে দেখালেন বিস্কুট হাওয়া। তারপর সেটা বেরল লালমোহনবাবুর পকেট থেকে।

ফেলুদা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

'আপনি ম্যাজিক বন্ধ করে দিলেন কেন? আপনার ত অদ্ভুত হাত!'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি এখন পাণ্ডুলিপিটা নিয়েই কাজ করব। বইটা ছাপাতে পারলে মনে হয় কাজ দেবে। এ নিয়ে ত বই আর লেখা হয়নি।'

'তাহলে আমি খাতাটা নিলাম।' বলল ফেলুদা, 'আমি পরশু ফেরত দেব। এইরকম সন্ধ্যাবেলা।'

'বেশ, তাই কথা রইল।'

ফেলুদা পরদিন সকালেই বলল, তার নাকি পাণ্ডুলিপি পড়া শেষ হয়ে গেছে। সে সারারাত পড়েছে। 'ভদ্রলোকের হাতের লেখা মুক্তোর মতো— অ্যান্ড ইট্স এ গোল্ডমাইন। ছেপে বেরোলে, একটা প্রামাণ্য বই হয়ে থাকবে। বিশ কেন, পঞ্চাশ হাজার দিলেও এ পাণ্ডুলিপি হাত-ছাড়া করা উচিত নয়।'

সন্ধ্যাবেলা সোমেশ্বরবাবুকে গিয়ে আমরা সেই কথাটাই বললাম। ভদ্রলোক শুনে যেন অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। বললেন, 'আপনি আমার মন থেকে একটা বিরাট চিন্তা দূর করে দিলেন। আমি দোটানার মধ্যে পড়েছিলাম, কিন্তু আপনি যখন পড়ে এত প্রশংসা করলেন, তখন আবার আমি মনে বল পাচ্ছি। প্রণবেশ পাণ্ডুলিপিটাকে টাইপ করছে— ও-ও অনেকবার বলেছে যে এতে আশ্চর্য সব তথ্য আছে। আমার বন্ধু অনিমেষও সেই একই কথা বলেছে। এবার নিশ্চিন্তে সূর্যকুমারকে না বলে দিতে পারব। ভালো কথা, কাল আমার ঘরে চোর এসেছিল।'

'সে কী!'

'আমার ঘুমটা ভেঙে যায়। আমি "কে"? বলতেই পালায়।'

'এর আগে কখনো চুরি হয়েছে কি?'

'কক্ষণো না।'

'আপনার ঘরে কোনো ভ্যালুয়েব্ল জিনিস আছে কি?'

'আছে। কিন্তু সেটা আমার সিন্দুকে থাকে। সিন্দুকের চাবি আমার বালিশের নিচে থাকে। আর সেটা সম্বন্ধে আমার বাড়ির লোকের বাইরে কেউ জানে না।'

'আমি জানতে পারি কি? আমার অদম্য কৌতূহল হচ্ছে।'

'নিশ্চয়ই পারেন।'

ভদ্রলোক উঠে দোতলায় গেলেন। তারপর মিনিট তিনেক পরে এসে একটা ছ'ইঞ্চি লম্বা জিনিস আমাদের সামনে টেবিলের উপর রাখলেন। সেটা একটা বংশীবাদক শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি।

'পঞ্চরত্নের তৈরি।' বললেন সোমেশ্বরবাবু, 'তার মানে হিরে, পদ্মরাজ, নীলকান্ত, প্রবাল আর মুক্তো। এর কত দাম আমি জানি না।'

'অমূল্য,' বলল ফেলুদা। 'এবং অপূর্ব জিনিস। এ-জিনিস কবে থেকে আছে?'

'এটা পাই রঘুনাথপুরের রাজা দয়াল সিং-এর কাছে। নাইনটিন ফিফটি সিক্সে। আমার ম্যাজিক দেখে খুশি হয়ে দেন আমাকে জিনিসটা।'

'আপনাদের বাড়িতে দারোয়ান নেই?'

'তা আছে বৈকি। তাছাড়া চারজন চাকর আছে। চোরের মনে হয় চাকরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।'

'যদি না চোর বাড়ির লোক হয়।'

'এ যে আপনি সব্বনেশে কথা বলছেন!'

'আমরা গোয়েন্দারা এরকম কথা বলে থাকি। সেটা সিরিয়াসলি নেবার কোনো দরকার নেই।'

'তাও ভালো।'

'আপনি বোধহয় বিপত্নীক?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার ওই একটিই ছেলে?'

'না। নিখিল আমার ছোট ছেলে। বড়টি— অখিল— উনিশ বছর বয়সে বি.এ. পাস করে বিদেশে চলে যায়।'

'কোথায়?'

'সেটা বলে যায়নি। আমাদের ফ্যামিলিতে ভবঘুরেও রয়েছে কিছু কিছু। অখিল ছিল তাদের মধ্যে একজন। অস্থির চরিত্র। বলল, জার্মানি গিয়ে চাকরি করবে। তারপর বেরিয়ে পড়ল। এ হল নাইনটিন সেভেনটির কথা। তারপর আর কোনো যোগাযোগ করেনি। ইউরোপেই কোথাও আছে হয়ত, কিন্তু জানবার কোনো উপায় নেই।'

'আপনার সেক্রেটারি প্রণবেশ এই কৃষ্ণটার কথা জানেন?'

'হ্যাঁ। সে ত আমার ঘরের ছেলের মতোই। আর তাকে ত আমার সব কাগজপত্র, করেসপন্ডেন্স ঘাঁটতে হয়।'

'যাই হোক্, এবার এটা তুলে রেখে দিন। এমন চমৎকার জিনিস আমি কমই দেখেছি।'

'আমি তাহলে সূর্যকুমারকে না বলে দিই।'

'নির্দ্বিধায়।'

ফেলুদা উঠে পড়ল।

'আমি একবার বাড়ির আশপাশটা ঘুরে দেখতে চাই। চোর কোন্ কোন্ জায়গা দিয়ে আসতে পারে, সেটা একবার দেখা দরকার।'

'সবচেয়ে সুবিধে বারান্দা দিয়ে। আসলে আমার দারোয়ান একটু কর্তব্যে ঢিলে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

বাড়ির বারান্দা যে দিকে, সে দিকেই একটা বাগান রয়েছে। তবে সেটাকে খুব যত্ন করা হয় বলে মনে হল না। বাড়ির চারিদিকে বেশ উঁচু কম্পাউন্ড ওয়াল, সেটা টপ্‌কে পেরোনো সহজ নয়। দেয়ালের দু'ধারে গাছপালাও বিশেষ নেই।

ফেলুদা মিনিট পনেরো ঘোরাঘুরি করে বলল, 'চোর সম্বন্ধে ঠিক শিওর হওয়া গেল না। বাড়ির চোর না বাইরের চোর, সে-বিষয় সংশয় রয়ে গেল।'

ক্রমশ

'গোরস্থানে সাবধান!' কিছু কথা, কিছু কল্পনা

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

প্রস্তাবনা

ফেলুদার এই গোয়েন্দাগিরি ড্যালহাউসি, চৌরঙ্গী, পার্কস্ট্রীট এবং পার্ক স্ট্রীটের গোরস্থান, রিপন লেন, আলিপুর আর নিউ আলিপুরের মধ্যেই আবদ্ধ। কেবল তদন্তের শেষ কলকাতার পগার পারে, পেনেটিতে। 'গ্যেরস্থানে সাবধান' গল্পের শুরু ঝড় দিয়ে, আর শেষ ঝড়ের গতিতে পাঁচদিনে।

সব গোয়ন্দা কাহিনীই আসলে লেখক-লেখিকা আর পাঠক-পাঠিকার মধ্যে বুদ্ধির লড়াই। তাই গোয়েন্দা গল্পের গুণাগুণ যাচাই করার একটা কষ্টিপাথর হল যে তার লেখক বা লেখিকা সমস্যা সমাধানের জন্যে দরকারি ক্লু বা সংকেতগুলো পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য চতুরভাবে কাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছেন কিনা। সবশেষে দেখা দরকার যে লেখক-লেখিকা গল্পের স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে দরকারি খবরাখবর আর খুঁটিনাটি দিয়ে সেটাকে জীবন্ত আর উপভোগ্য করে তুলতে পেরেছেন কিনা। এগুলো দেখবার জন্য প্রথমেই বইয়ের গল্পকে নখদর্পণে না দিয়ে উপায় নেই!

গোরস্থানে সাবধান! চুম্বক

একদিন বিকেলে লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু (আমি এরপর সর্বত্রই লালমোহন সম্পর্কে ঐ নামটাই ব্যবহার করবো) তাঁর ড্রাইভার-চালিত সবুজ রঙের সদ্য-কেনা সেকেন্ডহ্যান্ড মার্ক-টু অ্যামবাসাডোর সা-রে-গা-মা-ওয়ালা হর্ন বাজিয়ে বালিগঞ্জে ফেলুদার বাড়িতে সদর্পে হাজির হলেন। ফেলুদা যথারীতি নির্মমভাবে তাঁর গাড়ীর রঙ আর হর্ন নিয়ে মন্তব্য করলেন। কিন্তু জটায়ু তা গায়ে না মেখে কেবল বিকট হর্নটা বদলাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, ফেলুদা আর তোপ্‌সেকে তাঁর গাড়ি করে একটু বেড়িয়ে আসার অফার দিলেন।

ফেলুদা তখন জটায়ুর গাড়ি করে তাঁর বহুদিনের ইচ্ছেমতো তোপ্‌সেকে ড্যালহাউসি স্কোয়ারের সেন্ট জন্‌স চার্চ-সংলগ্ন ছোট কবরখানায় জোব চার্নকের সমাধি দেখাতে নিয়ে যায়। সেখানে চার্নক সম্বন্ধে ফেলুদা নানান খবর দিলেও এটা বলেননি যে তাঁর সমাধিটা প্রাচীন কলকাতার টিকে-থাকা স্থাপত্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আদিম সেন্ট জন্‌স চার্চের কবরখানাতেই। হঠাৎ এমন প্রচন্ড ঝড় ওঠে যে ফিরতি পথে ফেলুদা তোপ্‌সেকে সাউথ পার্ক স্ট্রীটের গোরস্থান দেখাতে পারলেন না।

পরেরদিন সকালে খবরের কাগজ থেকে ফেলুদারা জানলেন যে আগের দিনের ১২৫ কিলোমিটার বেগের প্রচন্ড ঝড়ে সাউথ পার্ক স্ট্রীটের গোরস্থানে একটা গাছ পড়ে নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বলে এক প্রৌঢ় আহত হয়েছেন। খবরটা দেখে প্রশ্ন, ভদ্রলোক সেই সন্ধ্যেয় গোরস্থানে

গিয়ে কী করছিলেন? এই হল 'গোরস্থানে সাবধান' রহস্যের সূত্রপাত।

সেইদিনেই বিকেলে ফেলুদা, তোপ্‌সে আর জটায়ুকে নিয়ে অকুস্থলে হাজির হয়ে দেখলেন যে গোরস্থানের দক্ষিণ সীমানায় গাছ পড়ে ভেঙে-যাওয়া একটা ছোট সমাধির গায়ে খান খান হয়ে যাওয়া মারবেল স্মৃতি-ফলকের কেবলমাত্র 'GOD' কথাটা লেগে আছে। ঠিক এই সময়েই জটায়ু কবরের গায়েই ডালপালা দিয়ে ঢাকা একটা গর্তে পড়-পড় হতেই বোঝা গেল যে কেউ বা কারা কোনো মতলবে ঐ গর্তটা খুঁড়েছে!

ফেলুদা স্মৃতি-ফলকের খন্ডগুলোকে পাশাপাশি সাজিয়ে বুঝলেন যে ভাঙা কবরটা টমাস গডউইন বলে এক সাহেবের, যাঁর জন্ম ১৭৭৮ সালে আর মৃত্যু ১৮৫৮-য়। জটায়ু এইবার আবার চমক দিলেন একটা মানিব্যাগ পেয়ে, যাতে এন এম বিশ্বাসের লেখা কয়েকটা ভিজিটিং-কার্ড, সাউথ পার্ক স্ট্রীটে গোরস্থান আর গড়ের মাঠের মনুমেন্ট খোলার খবর দেওয়া দুটো অতি পুরনো কাগজের কাটিং, নানান হিজিবিজির সঙ্গে 'ভিক্টোরিয়া' লেখা এক টুকরো কাগজ, অক্সফোর্ড বুক কোম্পানির একটা ক্যাশ মেমো আর মোটে সাঁইত্রিশ টাকা ছিল। ফেলুদাও তারপর কোটের ব্রাউন রঙের একটা ছেঁড়া বোতাম আর একটা রেসের বই পাশাপাশি জায়গা থেকে খুঁজে পেলেন।

এইসব নিয়ে ফেলুদারা পরদিন সকালে সেই 'চলমান-বিশ্বকোষ' সিধুজ্যাঠার শরণাপন্ন হলেন। তিনি গডউনের নাম আর জীবনের সাল-তারিখ শুনেই, টক্ করে বললেন যে তাঁর মেয়ে শার্লট তার বাবার মৃত্যুর পর দু'এক বছরের মধ্যে 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ তাঁর সম্বন্ধে একটা তাজ্জব কাহিনী লেখে। তিনি নবাব আসফ-উদ-দৌল্লা বা তাঁর আমলের ক্লোদ মার্তিনিয়ের দের অব্দি না-পিছিয়ে জানালেন যে তাঁর নাতি সাদত আলির আমলে লখ্‌নৌয়ের অলিগলিও সাহেব ফৌজি, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, আঁকিয়ে, ইস্কুল মাস্টার, নাপিত ইত্যাদিতে ভরে গিয়েছিল। সবাইয়ের লক্ষ্য ছিল সেই খামখেয়ালি নবাবকে হাত করে, রাতারাতি আমীর হওয়া।

এঁদের মতোই যুবক টমাস গডউইন সাদত আলির শেফ হয়ে মন-পসন্দ নানান খানা খাইয়ে, মাইনে আর মহার্ঘ বকশিস পেয়ে হঠাৎ বড়লোক বনে কলকাতায় চৌরঙ্গীতে রেস্টোরেন্ট খুলে আর জেন ম্যাডক বলে একটি মেয়েকে বিয়ে করে এদেশে থেকে যান। টম লাগাম-ছেঁড়া জুয়োর নেশায় প্রথমে লখ্‌নৌ, আর পরে কলকাতায় সর্বস্বান্ত হয়ে মারা যান। এইখানেই শার্লটের লেখা শেষ।

সিধুজ্যাঠা ফেলুর মুখে গ্রেভ ডিগিংয়ের কথা শুনে চমকে উঠে বললেন যে ব্যাপারটা তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকছে, কারণ গডউইনের কবরের কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক বা রিসেল ভ্যালু নেই। তারপর ফেলুদার কাছ থেকে সার্কুলার রোডের কবরখানায় শার্লটের সঙ্গে তাঁর বড় ছেলে ডেভিড আর তার ছেলে অ্যান্ড্রু আর তার বৌয়ের সমাধির কথা জানলেন। তবে ফেলুদার তদন্তকে তিনি আজগুবি বলে উড়িয়ে দিলেন।

সিধুজ্যাঠার কাছ থেকে ফেলুদারা পার্ক হসপিটালে ডাঃ শিকদারের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই খালাস হওয়া নরেন বিশ্বাসের ঠিকানা নিয়ে, নিউ আলিপুরে এন বিশ্বাস আর জি বিশ্বাস লেখা বাড়িতে হাজির হতেই, নরেন বিশ্বসের ভাই 'জি' অর্থাৎ গিরিন বিশ্বাস তাঁদের তার খাটে-শোয়া দাদার কাছে নিয়ে গেলেন।

ফেলুদা তাঁকে তাঁর মানি ব্যাগ ফেরত দিয়ে জানলেন যে তিনি আর তাঁর ভাই গিরিন দু'জনেই প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরিজিতে গোল্ড মেডেলিস্ট। আলোচনা প্রসঙ্গে আরও জানা গেল যে নরেন বিশ্বাস পুরনো কলকাতা নিয়ে চর্চা করেন বলেই ঝড়ের দিন গোরস্থান গিয়েছিলেন। তারপর তাঁর কার্ডের নামের আদ্যাক্ষর আর নরেন্দ্রনাথ নামের গরমিলের কথা ফেলুদা বলতেই জবাব পেলেন যে কার্ডটার 'এম' কথাটা ছাপার ভুল। কিন্তু ফেলুদার প্রশ্নে ভদ্রলোক টমাস গডউইন সম্বন্ধে কিছু জানেন না বলে ভালো করলেন। অগত্যা ফেলুদা তাঁকে তার কার্ড দিয়ে বললেন যে পরে তিনি গডউইনের কোনো খবর-টবর পেলে যেন তাকে জানান।

ফেলুদারা এরপর অক্সফোর্ড বুক শপে নরেন বিশ্বাসের 'ভিক্টোরিয়া'র কোনো হদিশ না-পেয়ে, জটায়ুর

তাগিতে ব্লু-ফক্সে গেলেন। সেখানে জটায়ু হঠাৎ মুখ-ভর্তি স্যান্ডউইচ নিয়ে 'ঈশ্বরের জয়' বলে আটকে গেলেন। কারণ রেস্টোর‍্যান্টের পেছনে রাত্তিরের ব্যান্ড-বাজিয়েদের স্ট্যান্ডের তলায় 'গিটার-ক্রিস গডউইন' সাইনবোর্ড দেখেন, যা ফেলুদা আর তোপসে সেদিকে পিঠ করে থাকায় দেখেনি।

ফেলুদা অবিলম্বে ব্লু-ফক্সের ম্যানেজারের কাছ থেকে ক্রিসের ঠিকানা নিয়ে ১২/১ রিপন লেনের এঁদো বাড়ীতে সদলে হাজির হলেন। সেখানে দোতলায় ক্রিসের বাবা মার্কাসের কাছ থেকে জানা গেল টমাস গডউইন তাঁর গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার। তাছাড়া মার্কাস বললেন যে তাঁর কাছে শার্লটের একটা আইভরি কাস্কেট ছিল, যেটা তাঁর ওপরতলার ভূত-প্রেত নাবানো জোচ্চোর আরাকিসটা টমাসের প্রেতাত্মাকে ডাকবে বলে আগের দিন ধার নিয়ে গেছে। তবে তিনি কাস্কেটে কী রয়েছে তা খুলে দেখেননি।

মার্কাসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফেলুদা তোপসে আর জটায়ুকে নিয়ে সটান ওপরতলায় আরাকিসের ডেরায় গিয়ে পৌঁছে দেখেন যে, সে তার সাঙ্গোপাঙ্গর সঙ্গে অন্ধকার ঘরে টমাসের প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা কইছে। ফেলুদা তখন তার চাকরকে ঘুস দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই লোমহর্ষকভাবে টমাসের কাস্কেট হাতিয়ে, জটায়ু আর তোপসেকে নিয়ে আরাকিসদের কলা দেখিয়ে সরে পড়ল।

পরদিন সকালে ফেলুদা শার্লটের কাস্কেটে দুটো তামাকের পাইপ, একটা সোনার চশমা, একটা নস্যির কৌটো আর শার্লটের লেখা চারটে বাঁধানো ডাইরি পেলেন। ডাইরিগুলো পড়ে ফেলুদা জানলেন যে মরার আগে টমাস কাস্কেটের অন্য জিনিসগুলো শার্লটকে দিলেও, সাদত আলির দেওয়া পেরিগ্যাল রিপিটারটী রাইফেল নয়, আসলে পকেট ঘড়ি! যেটা শার্লটকে তাঁক কফিনের সঙ্গে পুঁতে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। সে আদেশ শার্লট যথারীতি পালনও করেছিলেন।

শার্লটের ডায়রি থেকে ফেলুদা আরও খোঁজ পেলেন যে তার ভিক্টোরিয়া বলে এএকজন ভাইঝি বা বোনঝি ছিল, যে কোনও কারণে তার ঠাকুরদাকে অসন্তুষ্ট করে। তবে তিনি মরার আগে তাকে ক্ষমা করে যান।

তাছাড়া শার্লট তার বড়ভাই ডেভিড ছাড়া তার অন্য ভাই জনের কথা লিখেছিলেন, যিনি বিলেতে গিয়ে আত্মহত্যা করেন। ডায়রি পড়ে ফেলুদা আরও বুঝলেন
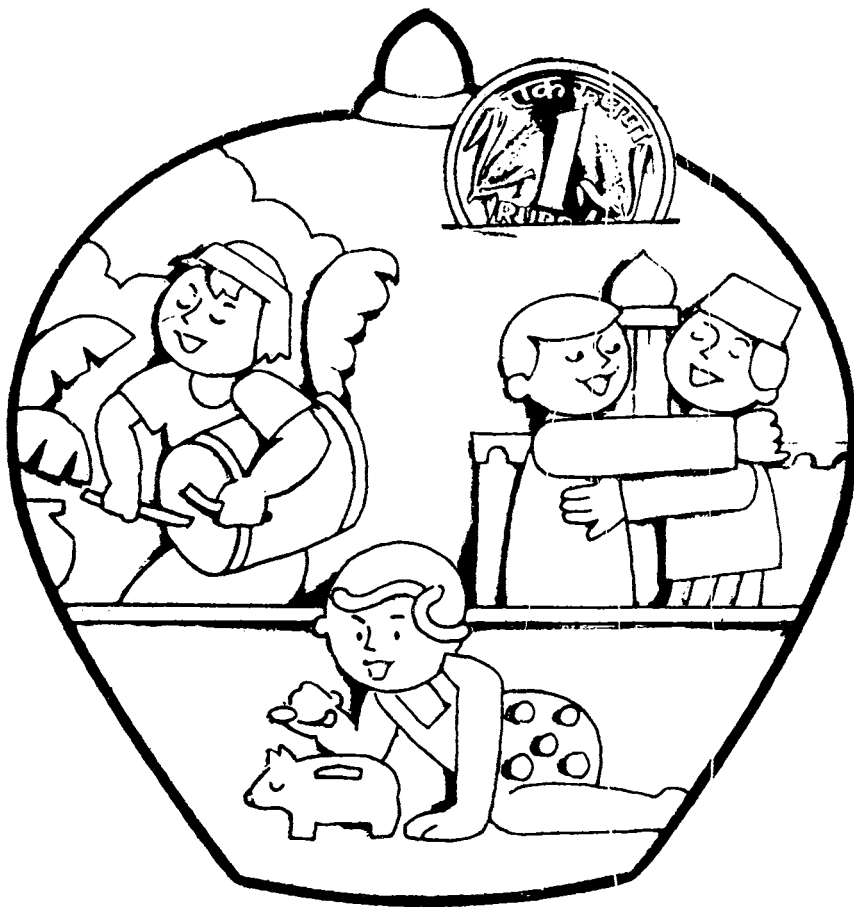
যে আরাকিস দামি চুনি-পান্না বসানো নস্যির কৌটোটা কাস্কেট থেকে হাতিয়ে, তার বদলে ভুয়ো বাক্স রেখে দিয়েছিল।

এরপর জটায়ু এলে, আবার অভিযান শুরু। ফেলুদা তাঁকে পেরিগাল রিপিটার কবর খুঁলে পাওয়া যেতে পারে বলাতে তিনি অবশ্য কিছুই বুঝলেন না। ফেলুদা কাস্কেটটা ব্রাউন পেপারে মুড়ে হাতে নিয়ে প্রথমে পার্ক অকশন হাউসের বিকাশবাবুর সঙ্গে কথা বলে জানলেন যে পেরিগ্যাল রিপিটারের হাড়হদ্দ বলতে পারেন—এমন একজন লোক হলেন ঘড়ি-সংগ্রাহক কোটিপতি অবাঙালি ব্যবসায়ী মহাদেব চৌধুরী, যাঁর আলিপুর পার্ক রোড আর পেনেটিতে বাড়ি আছে।

ফেলুদা দুটো বাড়ীর ঠিকানা নিয়ে তোপ্‌সেদের বললেন যে তারা এসপ্ল্যানেডে ন্যাশানাল লাইব্রেরির রিডিং রুমে নাবিয়ে, পার্ক স্ট্রীটের গোরস্থানে কোন কিছু রিপোর্ট করবার আছে কিনা দেখে, তাঁকে খানিকটা বাদে তুলে নিলে, তাঁরা সেখান থেকে সবাই রিপন লেনে যাবেন।

জটায়ু এতক্ষণে আঁচ করেছেন যে ফেলুদা একটা দামি ঘড়ির তল্লাশ করছে। তাই এসপ্লানেড যাবার রাস্তায় ট্রাফিক জ্যামে তাদের গাড়ি যখন কিছুক্ষণ আটকে পড়ে,
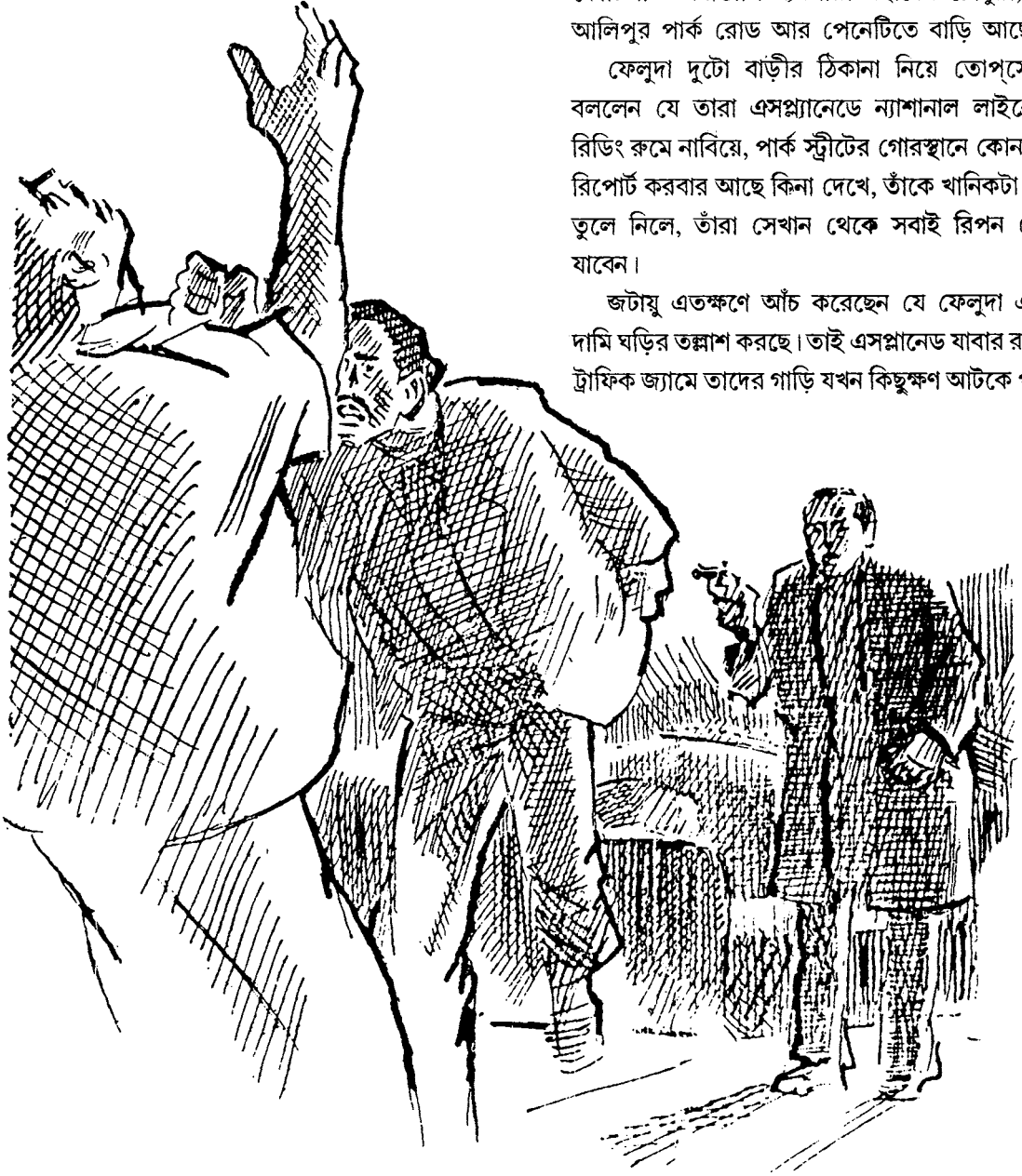
তখন জটায়ু তাঁর ঠাকুরদাদার থেকে পাওয়া পুরনো ট্যাক-ঘড়িটা ফেলুদাকে তাঁর অনেকদিনের কিছু দেবার ইচ্ছেমতো ফেলুদাকে প্রেজেন্ট দেবেন বলে জানালেন। আর এও বললেন যে সেটা পেরিগ্যাল পিটার'-ও হতে পারে।

খানিক পরে ফেলুদাকে ছেড়ে এসে গোরস্থানে ঢুকে জটায়ু টমাসের কবরের কাছে গিয়েই 'কং' বলে মুর্চ্ছা আর পতন। তোপ্‌সে বুঝলো কারণটা সেই কবরের পাশে গর্তের মধ্যে একটা মড়ার খুলি। বারদশেক ঝাঁকানি খেয়ে জটায়ুর জ্ঞান ফিরলে, তাঁরা তক্ষুনি ফেলুদাকে নিয়ে আবার গোরস্থানে এসে সেখানে একটা কোদাল ছাড়া আর-কিছু দেখতে পেলেন না।

এরপর রিপন লেন। মার্কাস কাস্কেট ফিলে পেয়ে যত-না খুশি, তার চেয়ে বেশি আহ্লাদ করলেন দেখে যে ফেলুদা তার সামনে উপস্থিত জোচ্চোর আরাকিসকে বোকা বানিয়েছে বলে। আর আরাকিস ফেলুদার জেরায় তখুনি ওপর থেকে আসল নস্যির কৌটো ফেরৎ দিয়ে সটকে পড়ল। কিন্তু ফেলুদা মার্কাসের কাছ থেকে তাঁর পরিবারের সম্বন্ধে আর কোনও খবর পেলেন না।

রিপন লেন থেকে নিজামে মাটন রোল খেয়ে, ফেলুদা একটা কাজে বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ডে ঢুকলেন। জটায়ুরা ঘুরতে ঘুরতে ফ্যাংক রসে ঢুকে দেখেন যে সেখানে গিরিন বিশ্বাস তাঁর দাদার জন্য ওষুধ কিনতে এসেছে। ভদ্রলোক ফেলুদার সঙ্গে মোলাকাতের ইচ্ছের কথা বললে, তোপ্‌সে তাঁকে ফোন করে ফেলুদার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে বলে। ইতিমধ্যে জটায়ু তোপ্‌সেকে বললেন যে তিনি ফেলুদার মতিগতি কিচ্ছু বুঝছেন না। তোপ্‌সে 'তথৈবচ' বলে মন্তব্য যোগ করলেন যে সবকিছু দেখে-শুনে তার মনে হচ্ছে যে ফেলুদা ছাড়া আরও একজন কেউ শার্লটের ডায়রি পড়েছে।

বোর্ন এন্ড শেফার্ড থেকে ফেলুদা জটায়ুর ড্রাইভারকে সোজা আলিপুর পার্ক যেতে বললেন, কারণ ফোটোর দোকান থেকেই ফোনে তিনি মহাদেব চৌধুরীর সঙ্গে পাকা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছেন। ফেলুদারা যখন মহাদেব চৌধুরীর বাড়ি ঢুকলেন, তখন একসঙ্গে অনেকগুলো চাইমিং ক্লক পর পর ছ'টা বাজার শব্দে তাঁদের তাক লাগিয়ে দিলো। একজন কর্মচারী তাঁদের আপিস-ঘরে বসিয়ে জানালো তাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ঘড়ির বাজনার পর নিস্তব্ধতার মধ্যে তাঁরা শুনলেন যে চৌধুরী চেঁচিয়ে কাউকে টাকা আগাম নিয়েও ঘড়ি না-দেওয়াতে ধমক দিতে দিতে তাকে আরও কিছু টাকা দিয়ে, পরদিনই মালের ডেলিভারি দিতেই হবে বলে হুকুম করছেন।

লোকটা টাকা নিয়ে চলে যাবার পর, ফেলুদারা মহাদেব চৌধুরীর সামনে যেতেই তিনি ফেলুদা কী ঘড়ি এনেছেন তা দেখতে চাইলেন। ফেলুদা জবাব দিলেন যে তিনি ঘড়ি বেচতে নয়, চৌধুরীর কাছ থেকে পেরিগ্যাল রিপিটার সম্বন্ধে খবরা-খবর জানতে এসেছেন। মহাদেব চৌধুরী ফেলুদার এই আস্পর্ধায় রেগে কাঁই হলেও, শেষপর্যন্ত বললেন যে এই পকেট-ওয়াচের কারিগর বিলেতের আঠারো শতাব্দীর শেষদিকের ফ্রান্সিস পেরিগ্যাল, যিনি তার শিল্পে তখন একজন দুনিয়ার সেরা ওস্তাদ ছিলেন। আর পেরিগ্যাল রিপিটারের দাম তাঁর মতোন গোয়েন্দার জানার কৌতুহল বৃথা। ফেলুদা তখন

উঠে পড়ার উপক্রমের সময়, মহাদেববাবু মোলায়েমভাবে তাকে জানিয়ে দিলেন যে এরপর সে তাঁর ব্যাপারে নাক গলাবার চেষ্টা করলে, তাঁর কাছে অন্য রিপিটার-ও আছে—যার আওয়াজ পেরিগ্যাল ঘড়ির মতো সুরেলা নয়।

বাড়ি ফেরার পর ফেলুদা জটায়ুকে পরদিন সকাল সকাল আসতে বললেন।

খানিক পরে তোপসে দেখলে ফেলুদা তাঁর সব তদন্তের বিপদজনক পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত পুরনো হান্টিং বুট-জোড়া বার করেছে। দেখে বুঝল ফেলুদা নিশীথ অভিযানে যাবে। পরে ফেলুদা জানালেন তাঁর গন্তব্যস্থল পার্ক স্ট্রীট গোরস্থান, উদ্দেশ্য পাহারা, সঙ্গী ০.৩২ কোল্ট। তাঁকে নিরস্ত্র করার জন্যে তোপ্‌সে বললে যে তাঁর গোরস্থানে যাওয়া পন্ডশ্রম, কারণ ঘড়ি যাদের নেবার তারা সেটা এতক্ষণে সরিয়ে ফেলেছে। ফেলুদার জবাব 'নেয়নি'। তা না-হলে কেউ ওভাবে কোদাল ফেলে পালায় না।

পরদিন সকাল সকাল জটায়ু হাজির। ঘরে ঢুকেই জটায়ু ফেলুদার তিন বছরের সিনিয়ার হিসেবে তাঁর ঠাকুরদাদার কুক-কেলভি ঘড়িটা 'উইথ মাই ব্লেশিংস অ্যান্ড কম্‌প্লিমেন্টস্‌' বলে তাকে দিলেন।

এমন সময় টেলিফোন না-করেই গিরিন বিশ্বাসের আবির্ভাব। তিনি এসেই বললেন, তাঁর দাদার মাথায় গাছ পড়েনি, আসলে তাঁর বজ্জাত বড় ছেলে প্রশান্ত তাঁর উইল থেকে বাদ পড়বার ভয়ে তাকে লাঠি-পেটা করে মারতে গিয়েছিল, যা তিনি ঘুণাক্ষরে কাউকে বলবেন না। তাই গিরিনবাবুর কলকাতা থেকে দু'দিনের জন্যে বাইরে যাবার আগে ফেলুদাকে ব্যাপারটা তদন্তের ভার নেবার জন্য অনুরোধ করতে এসেছেন। ফেলুদা তাঁর প্রস্তাবে গররাজি হওয়াতে, বিরক্ত মুখে চলে গেলেন।

তারপর ফেলুদা তাঁর সারাদিনের প্রোগ্রাম দিলেন। প্রথমে নরেন বিশ্বাস, তারপর পর পর বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড আর পার্ক স্ট্রীট গোরস্থান আর মাঝখানে তাঁর প্রেসিডেন্সির কলেজ-ফ্রেন্ড সুহৃদের বাড়ি থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনের—১৯৫৫-র শতবার্ষিকী সংখ্যা উঠিয়ে নেওয়া। এর মধ্যে দুপুরবেলার গোরস্থানে যাওয়া থেকে জটায়ু আর তোপসে বাদ। কিন্তু পরে গোরস্থানে ভিজিটে ফেলুদা তাদের দু'জনকে সঙ্গে নেবে, কারণ তাদের সেই কবরখানার মাঝ রাত্তিরের অ্যাটমোসফিয়ারের অকল্পনীয় অভিজ্ঞতা দেওয়া একান্ত দরকার।

এই কথাবার্তার পর তাঁরা বেরিয়ে পড়ে প্রথম নরেন বিশ্বাসের কাছে গেলেন। তিনি ফেলুদার উইলের প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না, ভিক্টোরিয়ার কথা উঠতে একটা আষাঢ়ে গল্প ফাঁদলেন। অগত্যা ফেলুদা অ্যান্ড কোম্পানি নিউ আলিপুর থেকে সুহৃদের বাড়ির থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন তুলে আর বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড থেকে একটা বড় লাল খাম তুলে বাড়ী ফেরার পর জটায়ুকে রাত দশটার মধ্যে গাড়ি নিয়ে ফিরে আসতে বললেন।

রাত দশটার আগেই ফেলুদা আর তোপ্‌সে রেডি আর পাক্কা সাহেবের মতোন পাঙ্কচুয়াল জটায়ু নির্ধারিত সময়ে কাঁটায় কাঁটায় হাজির।

তিনজনেই কালো পোশাকে বেরিয়ে পড়েন। গোরস্থানের খানিকটা দূরে গাড়ি পার্ক করে, ফেলুদা হরিপদ ড্রাইভারকে চুপি চুপি কিছু জরুরি ইনস্ট্রাকশান দেবার পর, তাঁরা আধখানা মেঘে ঢাকা ভাঙা চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় মেন গেট দিয়ে গোরস্থানে ঢুকে, টমাস গডউইনের কবরের কাছাকাছি একটা সমাধির গম্বুজের তলায় ঘাপটি মেরে বসে রইলেন।

বেশ অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর, তাঁদের কানে ঝুপ-ঝুপ ঝুপ-ঝুপ্‌ করা কোদাল দিয়ে মাটি খোঁড়ার আওয়াজ আসতে লাগল। তারপর দুটো ওবেলিস্কের মাঝখান দিয়ে একটা টর্চের নাচানো আলো দেখা গেল। তখন ফেলুদা একাই সেই দিকে এগিয়ে গেলেন। এরপর ঢং ঢং করে কাছাকাছি কোনো ঘড়িতে রাত বারোটা বাজার শব্দ। মিনিট কয়েক পরে তোপ্‌সে আর জটায়ুও টমাস গডউইনের কবরের দিকে এগাতেই, তাঁদের হঠাৎ মুখের ওপর চাপ, ব্যাস, আর কিছু মনে নেই'

জ্ঞান ফিরলে তোপসে দেখলে সে একটা সাজানো বৈঠকখানায় বসে, পাশে অজ্ঞান জটায়ু, খানিকটা দূরে সোফায় নির্ভয়-মুখে ফেলুদা আর আশপাশে

পাহারাদার। সময়টা শেষরাত, তাই বিলিতি কায়দায় 'গুড মর্ণিং' বলে ঘরে ঢুকলেন মহাদেব চৌধুরী ধরে আনা ফেলুদাদের তাঁর পেরিগ্যাল রিপিটার পাওয়ার নাটকীয় মুহূর্তটা দেখাবেন বলে।

এরপর একজন লোক সাফ-করা ঘড়িটা মহাদেব চৌধুরীর হাতে দেবার সময় জটায়ু আবার অজ্ঞান। কিন্তু মহাদেব চৌধুরী ঘড়িটা দেখেই 'স্কাউন্ড্রেল সুইন্ডলার' ইত্যাদি বলে চেঁচাতেই, ওঁর লোকেরা কাঁধ অব্দি চুল আর ঝোলাগুঁফো একটা প্যান্ট-কোট পরা লোককে ঘরে আনল।

মহাদেব চৌধুরীর ধমকে লোকটা বললে যে কবর থেকে যে ঘড়ি পেয়েছে তাই এনেছে। তারপর সে একটা পুরনো চিঠি তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিলে।

চৌধুরী ব্যাপারটা বুঝে রিভলভার নিয়ে ফেলুদার দিকে এগিয়ে বললেন যে পেরিগ্যাল রিপিটরিটা অবিলম্বে দিতে। তবে তখন না থাকলে তার কাছে সেটা তাঁর হতে না-আসা পর্যন্ত ফেলুদার নিস্তার নেই।

এই সময় উইলিয়াম পালাতে শুরু করতেই চৌধুরীর ছোঁড়া গুলি তাকে মিস্ করে একটা দাঁড়ানো ঘড়িতে গিয়ে লাগলো। কিন্তু উইলিয়ামের পালানো হল না, তাকে পাকড়াও করে ঘরে ঢুকলেন কয়েকজন পুলিশ নিয়ে এক ইনস্পেক্টার, আর তাঁদের পেছনে হরিপদ ড্রাইভার।

নাটকটা শেষ করলেন ফেলুদা। তাঁর ঝোলার লাল খাম থেকে বোর্ণ অ্যান্ড শেফার্ডের তোলা ভিক্টোরিয়া গডউইন আর বাঙালি-ক্রিশ্চান পি সি বিশ্বাসের বিয়ের
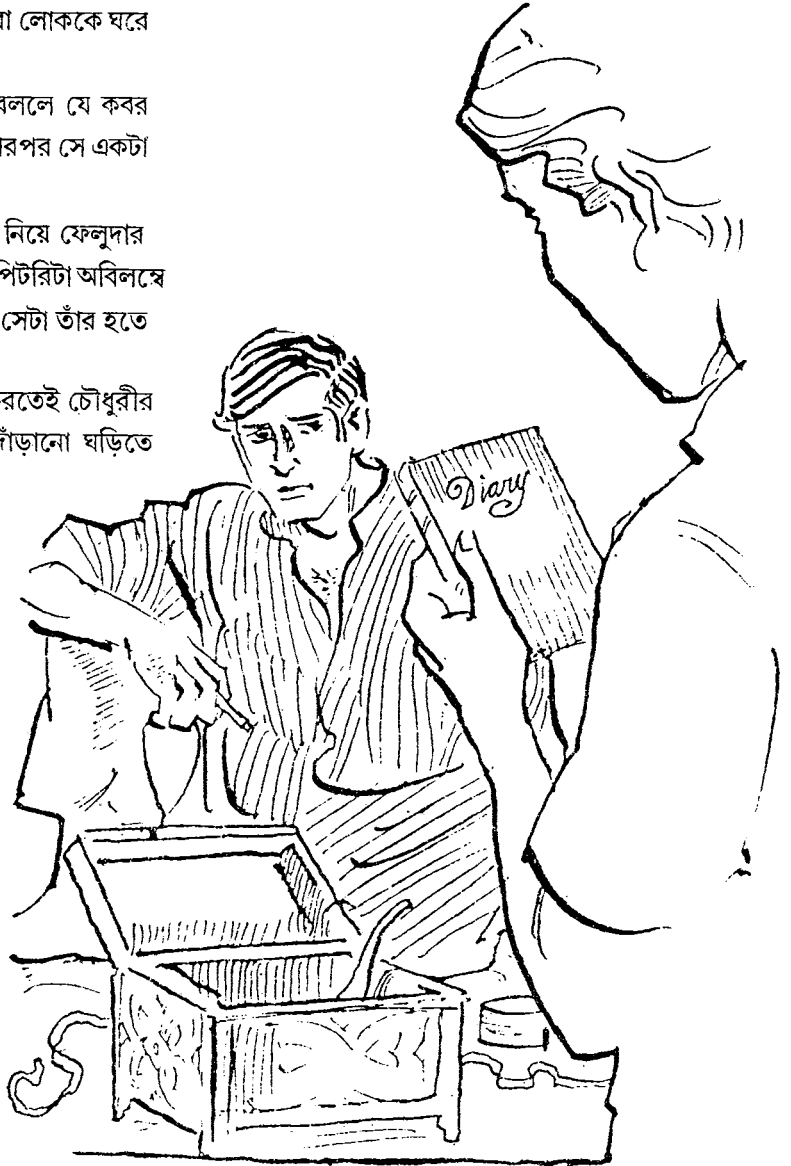
ছবি খুলে দেখালেন যে বিয়ের বরের সঙ্গে উইলিয়ামের কী আশ্চর্য মিল! তারপর উইলিয়ামের পরচুলা আর গোঁফ খুলতেই দেখা গেল যে সে-ই পি সি বিশ্বাসের নাতি উইলিয়াম গিরিন বিশ্বাস, মাইকেল নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের ছোটভাই। এইভাবে মহাদেব চৌধুরীর পেনিটির বাড়িতে 'গোরস্থানে সাবধান!'-এর রহস্যের ওপর যবনিকাপাত হল।

ভোর সকালে গাড়িতে বাড়ি ফেরার রাস্তায় শেষ দুটো কথা। তার একটা হল নরেন্দ্রনাথকে ভিক্টোরিয়ায় চিঠিটা ফেরৎ দেওয়া। আর দ্বিতীয়টা হল, তারপর আর - একবার পার্ক স্ট্রীটের গোরস্থানে যাওয়া, যা শুনে জটায়ু 'আ-হা-বা-র' বলে আঁৎকে উঠলেন। ফেলুদা তখন তাঁকে আশ্বস্ত করবার জন্য তার বাঁ-পায়ের হান্টিং বুটের ফলস্ সুকতলার নীচের খোপ থেকে তুলোর মোড়কে সযত্নে রাখা ঝকমকে পেরিগ্যাল রিপিটারটা বার করলেন, যেটা বাঁচাতেই তাকে সাবধানে পা ফেলার জন্যে গত রাত্তিরে সে গোরস্থানে ওই লোকেদের সঙ্গে যুৎ করে লড়তে পারেননি।

গল্প যাচাই

এইবার লেখার প্রস্তাবনায় আমি গোয়েন্দা কাহিনীর যে গুণাগুণগুলোর কথা বলেছি, সেগুলো যাচাই করার পালা।

প্রথমত, স্থান। 'গোরস্থানে সাবধান!' উপন্যাসের পটভূমি কেবল কলকাতা বলে, তাতে স্থানের বিষয়ে একটা আঁটসাঁট ভাব এসেছে।

দ্বিতীয়ত, কাল। উপন্যাসের সময় মাত্র পাঁচদিন, গল্পের গতি দুরন্ত, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত রোমাঞ্চকর, লেখার স্টাইল ঝকঝকে আর চাঁচাছোলা। তাই বইটা শুরু করলে, শেষ না করে থামা যায় না।

তৃতীয়ত, পাত্র-পাত্রী। ঐতিহাসিক চরিত্র ছাড়া এই গল্পে কোনো পাত্রী নেই। পাত্র কয়েকজন। তবে আমি কেবল তাদের মধ্যে দু'জনের কথা বলব যাদের ওপর গল্পটার রস আর মজা বারো আনা নির্ভর করছে।

এঁদের মধ্যে প্রথম হলেন ফেলুদা। ওঁর তদন্তের মার-প্যাঁচ বইটাতে দিব্বি খুলেছে। সত্যজিৎ গল্পতে গোড়া থেকেই সন্ধানী পাঠক-পাঠিকাদের নজরের জন্য ক্লুগুলো একটু উদার হাতেই তাঁর ফন্দিমতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছেন। ফলে, অন্যদের কথা জানি না, আমি বইটা পড়তে পড়তে গিরিন বিশ্বাসকেই আসামী বলে সন্দেহ করেছিলাম। তবে সে কীভাবে গডউইন আর তাঁর পেরিগ্যাল রিপিটারের কথা জেনেছিল, তা ঠাওর করতে পারিনি। ফেলুদার ক্যারদানি এই যে তিনি গডউইনের বাঙালী বংশধরদের হদিশ বার করে, আর নরেন্দ্রনাথ আর গিরিন বিশ্বাসের নাম-বৈষম্য ভেদ করে, তাদের আসল পরিচয়টা বের করে ফেলেছিলেন।

এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি অবশ্যই রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু, যিনি শুধু তাঁর অনুপম ব্যক্তিত্বই নয়, এই বইয়ে অন্য দিক থেকেও গল্পটাকে জমজমাট করে তুলেছেন। যেমন, তদন্তের ব্যাপারই ধরা যাক গোড়া থেকেই জটায়ু অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও ফেলুদাকে রহস্যের গোলকধাঁধার থেকে বার হতে আর তার সমাধানের সঠিক পথের খেই ধরিয়ে দিয়েছেন। ব্যাপারটা খুলে বলি।

প্রথম, জটায়ু গল্পের শুরুতেই গোরস্থানে পড়-পড় হওয়াতে, ফেলুদারা চট করে আঁচ করলেন যে কেউ বা কারা কোনো মতলবে টমাস গডউইনের কবর খুঁড়তে এসেছিল।

দ্বিতীয়, সিধুজ্যাঠার দেওয়া খবরের ভিত্তিতে ফেলুদা যখন টমাস গডউইনের কোনো জীবিত বংশধরের হদিশ পাচ্ছিলেন না, তখন জটায়ুই ব্লু-ফক্স রেস্তোঁরায় ক্রিস গডউইনের নাম আবিষ্কার করে তাঁকে রহস্যের তদন্তের মোড় ঘোরাতে রাস্তা দেখালেন।

তৃতীয়, জটায়ুর ঠাকুরদাদা লেট প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সূত্রে পাওয়া কুক-কেলভির টাঁক-ঘড়ি বা তাঁর কথায় 'পেরিগ্যাল পিটার'ই ফেলুদার হাতে পড়ে শত্রুপক্ষের মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলে।

চতুর্থ হল তাঁর ড্রাইভার হরিপদ, যে ফেলুদার কথামতো সঠিক সময়ে পেনেটিতে সশস্ত্র পুলিশ না নিয়ে গেলে, ফেলুদাদের সমূহ বিপদ হত।

সবশেষে আসছে ফেলুদার মটর গাড়ি। এটা

হামেহাল হাজির না থাকলে, ফেলুদা প্রায় অচল হয়ে পড়তেন।

আমার মতোন নিশ্চয়ই অনেকেই বলবে যে সত্যজিতের ফেলুদা নিয়ে গল্প-উপন্যাসগুলোতে তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি হল জটায়ু, যাঁর অবিস্মরণীয় আবির্ভাব ঘটে 'সোনার কেল্লা'য়, রাজস্থানে যাওয়ার রেলের কামরায় 'তং মাত কর, তং মাত কর' কথাগুলো দিয়ে। এই সদা হাস্যময়, সতত উদ্যমশীল, কারণে অকারণে ভয় পাওয়া আর মূর্চ্ছা যাওয়া, বারবার বোকামি করেও খাতির নদারৎ, সৎ আর বন্ধু বৎসল লোককে কেউ ভালো না বেসে পারে না। এমনকী ফেলুদা তাঁকে যখন-তখন বোকামির জন্য কড়াভাবে ঠাট্টা করলেও, কখনোই দাবাতে পারেননি।

শেষে বলি, জটায়ুকে ফিল্মে জলজ্যান্ত করে রেখে গেছেন অতুলনীয় সন্তোষ দত্ত। জন টেনিয়েলের আঁকা অ্যালেসের মতোন, সন্তোষ দত্ত ছাড়া জটায়ুকে এখন ভাবাই সম্ভব নয়। এই কথাটা সত্যজিতের গোয়েন্দা গল্পের আর কারুর পক্ষে বলা যায় না।

সত্যজিতের সব লেখার অর্থ ছোট ছোট খুঁটি-নাটিতেও কড়া নজরের কথা সবাই জানেন। এই কথাটা, বইয়ের অন্যান্য ব্যাপার ছাড়া সাউথ পার্ক স্ট্রীটের গোরস্থানের ব্যাপারে কত সত্যি, তা দেখা যাক। টমাস গডউইনের সমাধিটা সত্যজিৎ কল্পিত হলেও, এই উপন্যাসে নাম করে যেসব কবরের কথা বলেছেন, তার মধ্যে দু'একটা ছাড়া সবই ঠিক। যেমন ওখানে মার্গারেট এলিস আর সুসান এলিসের কবর রয়েছে। কিন্তু সত্যজিতের বর্ণিত মেরি এলিসের কবর নেই। তেমনিই ফেলুদারা শেষবার রাত্তির দশটার পর যে গম্বুজওয়ালা সমাধির তলায়, লুকিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, সেটা, সামুয়েল কাথবার্ট বর্নহিলের নয়, ক্যাপ্টেন কাডবার্ট থর্নহিলের। যাইহোক মোদ্দা কথাটা হল যে সত্যজিৎ রায় নিজে পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানে বারবার গিয়ে সরেজমিনে তদারকি করেই, তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দিয়ে তার এমন নিখুঁত আর খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন।

আমি যে ওপরের সামান্য বিচ্যুতির কথা লিখলাম, তা বলা দরকার যে সেগুলো আমার এই গোরস্থানে বহুবার ঘোরার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নয়। আমার সোর্স হচ্ছে ১৮৪৮ সালে কলকাতায় ছাপা ডবলিউ-এইচ-হোমস কোম্পানি প্রকাশিত 'দি বেঙ্গল অবিচুয়ারিজ, বিশ্বাস করা শক্ত যে এই বইয়ে সারা ভারতের প্রায় দেড়শো গোরস্থান ছাড়াও, সাউথ পার্ক স্ট্রীট বেরিয়াল গ্রাউন্ডের প্রতিটি কবর আর সমাধির মৃতদের পুরো নামধামের বর্ণনা আছে। সত্যজিতের আর দুটো ত্রুটির কথা বলি। এর মধ্যে একটা হল নরেন বিশ্বাসের কাছে এই গোরস্থান খোলার পুরনো খবরে কাগজের কাটিং থাকা সম্ভব নয়। কারণ, এই গোরস্থান খোলা হয় ১৭৬৭ সালের ২৫শে অগস্ট, আর ভারতের প্রথম খবরের কাগজ 'বেঙ্গল গেজেট' জেমস অগাস্টাস হিকি কলকাতা থেকে বার করেন ১৭৮০ সালে।

দ্বিতীয়টা হল 'মর্মর' কথাটা ফার্সি নয়, সংস্কৃত। আর Marmoreal-এর মূল ল্যাটিন। আমি অবশ্য এইসব বললাম সত্যের খাতিরে। তবে এর কিছুই গল্পের জোর বা আকর্ষণকে বিন্দুমাত্র ব্যাহত করে না।

কথা শেষ কিছু কল্পনা

'গোরস্থান সাবধান!' পড়া শেষ করে আমার মনে হল যে এর গল্প নিয়ে সত্যজিৎ যদি একটা ছবি করতেন, সেটা কী অসাধারণ ব্যাপার হত। কলকাতার মধ্যেই ক্যামেরা চালিয়ে এমন একটা দৃষ্টিনন্দন ছবি করা যেত, যা 'মহানগর'-এর কলকাতার থেকে আলাদা, আর যা ভাষা দিয়ে ফোটানো যায় না। আমার যাকে বলে এক ছিদেমও শিল্পদৃষ্টি নেই। কিন্তু তবুও কী বলতে চাইছি, তা গল্পের অন্যান্য সব ব্যাপার ছাড়া পার্ক স্ট্রীটের গোরস্থান সম্বন্ধে কিছু বলে একটি আভাষ দিই।

যেমন সত্যজিৎ দেখাতে পারতেন যে সাউথ পার্ক স্ট্রীটের গোরস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক সম্পদে সমৃদ্ধ। ১৭৯০ সালে এখানে গোর দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবার পর, এর যে কী অপরূপ সৌন্দর্য ছিল, তা উনিশ শতকের গোড়ার অনেক প্রত্যক্ষদর্শী সাহেব-মেমসাহেবদের লেখায় জ্বলজ্বলে হয়ে রয়েছে।

এই গোরস্থানের পূর্ব থেকে পশ্চিমে আর উত্তর

থেকে দক্ষিণে প্রয়োজনীয় ব্যবধানে লোকজনের ঘোরাফেরার জন্য সোজা টানা-টানা রাস্তা ছিল। এই রাস্তাগুলোর দুপাশে ছিল সারিসারি ছায়াতরু।

এই গোরস্থানে সাধারণ কবর ছাড়াও ছিল অজস্র পিরামিড, ওবেলিস্ক আরকিউপোলা ও গম্বুজওয়ালা সুন্দর সুন্দর সমাধির সমারোহ। উইলিয়াম হান্টারের ভাষায় এইসব কবর আর সমাধির নিচে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন সেই সব মানুষ, যাঁরা found Calcutta a swamp and turned it into a city। কবরগুলো দেখিয়ে দেখিয়ে বলা যেত এখানে সমাধিস্থ হয়েছেন কত বিরাট বিরাট ব্যক্তিত্ব হেস্টিংসের আমলের ইলাইজা ইম্পে, ক্লেভারিং আর-মনমন, উইলিয়াম জোন্সের মতোন মহাপণ্ডিত, ওয়ালটার স্যাভেজ ল্যান্ডরের 'বিয়াত্রিচ', অষ্টাদশী রোস আইলমারের মতোন কত সুন্দরী আর ডিরোজিওর মতোন দার্শনিক ও বিদ্রোহী।

১৮৯৯ সালে যখন হান্টারসাহেব তাঁর 'Some Calcutta Graves' বলে বড় প্রবন্ধ ছাপান, তখনই এই গোরস্থানের সমাধিগুলো দেখাশোনার অভাবে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। তার ৭৮ বছর পরে সত্যজিৎ যখন এই উপন্যাস লেখেন, তখন তার দশা আরও শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দু'দিন আগে এই গোরস্থানে আবার গিয়ে দেখলাম যে ভারতের ক্রিশ্চান গোরস্থান সংরক্ষণের কর্তৃপক্ষ এর ঝোপঝাড় কেটে, পুরনো রাস্তা মেরামত করে, সমাধিগুলোর সংস্কারের কাজে হাত দিতে শুরু করেছেন।

তবে ব্যাপারটা সময়ের প্রলেপে আবৃত ভগ্নপ্রায় গোরস্থানে মহান বিষাদমণ্ডিত সৌন্দর্যকে সত্যজিৎ রায় অমর করে রেখে যেতে পারলে, কী ভালোই না হত! কিন্তু এখন কি কেউ এই বই নিয়ে ফিল্ম করবার চেষ্টা করবেন? জানি না।

ফেলুদার সঙ্গে আড্ডা

সুজয় সোম

তারপর ফেলুদা বলল, 'গোড়া থেকেই জানি, সিনেমার ফেলুদা আমাকেই সাজতে হবে।'

'কী করে জানলে?'

আলটপ্‌কা প্রশ্নটা করেই বুঝতে পারলাম, বোকামি করেছি। কারণ, সব ব্যাপারে অত 'কী করে' বা 'কেন'র জবাব দেওয়া যে-কারো পক্ষেই মুশকিল। ন্যায্য কারণ বা প্রমাণ না-থাকলেও, মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা ও ইন্‌টিউশনকে কাজে লাগিয়ে অনেক কথা ভাবে, এমনকি তাই নিয়ে মন্তব্য করে!

হাতের সিগারেটটা ছাইদানে গুঁজে, ঠিক সাড়ে তিন মিনিট পর ফেলুদা বলল, 'এটা ঠিক, 'সন্দেশ' পত্রিকায় যখন 'ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি' কিম্বা 'বাদশাহী আংটি' পড়েছি, ফেলুদার গল্প নিয়ে যে সিনেমা হবেই, এ-কথা মনে হয়নি। 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' বা 'সদানন্দের খুদে জগৎ' বা 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' পড়ে যে মজা পেয়েছি, আনন্দ পেয়েছি, ঠিক সেটাই ঘটেছে ফেলুদা-কাহিনীর বেলায়। মানিকদা ছোটদের জন্য গল্প লেখা শুরু করে, বয়স্ক-পাঠকদের শুধু যে দলে টেনেছেন তাই নয়, অনেক বড়দেরি হারিয়ে-যাওয়া ছোটবেলাটা ফিরিয়ে দিয়েছেন। অবিশ্যি মানিকদার পরিবারের অন্তত দু'জন লেখক এই কাণ্ডটা আগেই করেছেন। ছোটদের জন্য সুকুমার রায় ও লীলা মজুমদারের সব লেখা বড়রাও দারুণ উপভোগ করে। তার মানে, সব-বয়েসের পাঠকদের মুঠোয় ভরে ফেলার ক্ষমতাটা মানিকদার রক্তের মধ্যেই ছিল। আচ্ছা বল্‌ তো, নিজের লেখালেখির কোনও পটভূমি তো ছিল না, এমনকি সিনেমায় দুনিয়া-জুড়ে অমন নাম-ডাক হবার পরে, ৪০ বছর বয়েসে, মানিকদা হঠাৎ ছোটদের জন্য লিখতে শুরু করলেন কেন?'

'না-করে উপায় ছিল না যে! ব্যাপারটা তাঁর রক্তের মধ্যে কেবলি ছট্‌ফট্‌ করত। একটুখানি জিরোতে দিতো না। জ্বালিয়ে খাচ্ছিল!'

'এগ্‌জ্যাক্টলি!' হৈহৈ করে উঠল ফেলুদা, 'একদম ঠিক বলেছিস। একে বলে গুব্‌রে পোকার ঘুরঘুরুনি। সে-জন্যেই বাপ্‌-ঠাকুর্দার 'সন্দেশ' পত্রিকা

রি-ভাইভড্ হলো, মানিকদা বাধ্য হলেন 'সন্দেশ'-এর জন্য গল্প-উপন্যাস লিখতে। জানিস, রক্ত হচ্ছে জলের চেয়ে বেশি জমাট।'

'তুমি তো বরাবর ডিটেক্‌টিভ গল্পের পোকা! কন্যান ডয়েল থেকে—'

'কন্যান ডয়েল আর আগাথা ক্রিস্টি থেকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার।' আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ফেলুদা বলল।

'এই চারজনেরি গল্প পড়েছি কম-বেশি। চারজনে চাররকম! তাই না ফেলুদা?'

কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভেবে নিয়ে, উদাস গলায় ফেলুদা বলল, 'এঁদের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে লীলুপিসির গোয়েন্দা-গল্প!'

আমি তো অবাক!

'কন্যান ডয়েল বা শরদিন্দু ছাপিয়ে লীলা মজুমদার! গোয়েন্দা-গল্পে?'

'কী জানিস, একটা ডেফিনিট ফর্মুলা মেনে দুনিয়া-জুড়ে লেখকরা গোয়েন্দা-গল্পের চাষ করেন। তাঁদের মধ্যে কন্যান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি বা শরদিন্দুবাবু দুর্দান্ত। কিন্তু লীলুপিসি হেঁটেছেন একেবারে আলাদা রাস্তায়। ওই-সব চিরকেলে ফর্মুলাকে তোয়াক্কা করেননি। গুপি-পানু-ছোটমামার গল্পগুলোতে বিদ্যে-বুদ্ধি-ডিটেকশন বা রোমাঞ্চময় অ্যাডভেঞ্চার যতই থাক্, তার চাইতে ঢের বেশি জায়গা পেয়েছে অফুরন্ত সরসতা, শিল্প-সাহিত্যের নানান ম্যাজিক, এমনকি... স্রেফ ইয়ার্কি-ফাজলামো। তাই শার্লক হোমস্ বা ব্যোমকেশ বক্সী বা ফেলু মিত্তিরের গল্প আমার যতই মন-জুড়ে থাকুক, মন-খারাপ হলে আমি পড়ি 'খ্যাপা সাহেবের হীরে' বা 'নেপোর বই' বা 'সমাদ্দারের অদৃশ্যকরণ'! লীলুপিসির লেখার এই যে ফুর্তিটা, এই রসটা 'ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি'তেও দিব্যি টের পেয়েছিলাম, ৩০ বছর আগেই।'

'আমার কী মনে হয় জানো, ফেলুদা-কাহিনীতে কন্যান ডয়েল আর লীলা মজুমদার—এই দু'জনেরি সাংঘাতিক প্রভাব আছে। এমনকি সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা ও সাহিত্য-সৃষ্টির পেছনে সবচেয়ে জোরালো খুঁটি বলতে তাঁর পিসি লীলা মজুমদারের রচনাবলী!'

'বাঃ! তারপর?'

'অবিশ্যি সত্যজিৎ রায়ের জীবনদর্শন, মন-মেজাজ বা তাঁর শিল্প-সৃষ্টির কাজে রায়-পরিবারের আরও তিনজন লেখকের বে-পরোয়া উস্‌কানি দেখতে পাই! তাঁর বাবা সুকুমার রায় এবং দুই কাকা সুবিনয় রায় ও সুবিমল রায়।'

'পুরুষে পুরুষে রক্তের ধারার মধ্যে টগ্‌বগ্ করে ইতিহাস বয়ে চলে, সেটা জানিস তো?'

ফেলুদা একটা সিগারেট ধরাল। চারমিনার নয়, পশ্চিমের ৫৫৫। আর তখুনি শ্রীনাথ ঘরে ঢুকল দু' পেয়ালা লিকার-চা ও ডালমুট নিয়ে। এই ডালমুটটা ফেলুদা কিনে আনে নিউ মার্কেটের কলিমুদ্দির দোকান থেকে।

থালা থেকে এক মুঠো ডালমুট তুলে নিয়ে ফেলুদা বলল, '১৯৬০ দশকেই
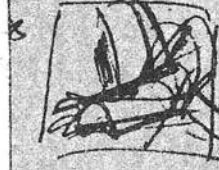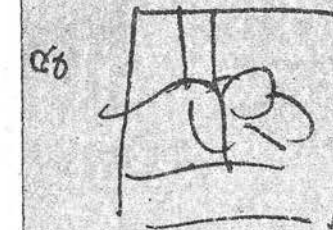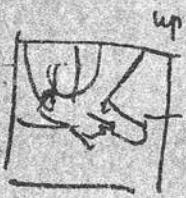
প্রোফেসর শঙ্কু আর গোয়েন্দা ফেলুদার গপ্পো পড়তে পড়তে মনে হয়েছে—এই দুটো চরিত্রের মধ্যেই মানিকদা লুকিয়ে আছেন! তাঁর প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব, দর্শন ও আগ্রহের যে বিরাট ব্যাপ্তি, তাই দিয়ে তিনি বানিয়ে তুলেছেন শঙ্কু এবং ফেলুদাকে। মানিকদার জীবনের স্বপ্ন আর বাস্তব ঘেঁটে গেছে ওই দু'জনের মধ্যে।'

'ফেলুদার সঙ্গে তোমার কোনও মিল খুঁজে পাওনি?'

'না-না, গল্পের ফেলু মিত্তিরের সঙ্গে আমার সেভাবে কোনও মিল... না, 'শেয়াল-দেবতা রহস্য' অব্ধি পাইনি। মিল খোঁজার চেষ্টাও করিনি। অবিশ্যি গল্পগুলো পড়ার আনন্দটা বেজায় উপভোগ করেছি। তবে ফেলুদাকে নিয়ে ছবি করতে হলে যে আমি ছাড়া গতি নেই, পেশাদার অভিনেতা হিসেবে এটা মনে হয়েছে।'

'বটে!'

'তারপর ১৯৭১ সালের পুজোয় 'দেশ' পত্রিকায় 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' পড়তে বসে, মানিকদার আঁকা ইলাস্ট্রেশন দেখে মনে হলো—আরে, যা ভেবেছি তাই—ফেলুদা তো মানিকদারই প্রোজেক্‌শন! ছবিতে ফেলুদাকে একদম মানিকদার মতো দেখাচ্ছে! সচেতনভাবে হোক্ বা না-হোক্, নিজেকেই এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়! ক'দিন পরে সে-কথাটা তাঁকে বলেও ফেললাম। অমনি মানিকদা বলে উঠলেন, "কিন্তু লোকে যে বলছে আমি তোমাকে ভেবে এঁকেছি।" মনে আছে, সেদিন রাত্তিরে বাড়ি ফিরে 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল'-এর সব ইলাস্ট্রেশন আবার খুঁটিয়ে দেখতে বসলাম। তারপর উপন্যাসটা আবার পড়তে শুরু করলাম। সেদিন রাতে আর ঘুমোবার সময় পেলাম না!'

'এটা ১৯৭১ সালের পুজোর সময় ঘটেছে। তারপর দু'বছরও ফুরোয়নি, ১৯৭৩-এর পুজোর আগেই তো জেনে গেছো 'সোনার কেল্লা' ছবি হচ্ছে!'

'সেটা ১৯৭৩-এর আগস্ট মাস। মানিকদার বাড়িতে গিয়ে দেখি 'খেরোর খাতা'য় আমার পোর্ট্রেট আঁকছেন—আমার পরচুলো কেমন হবে! মানিকদা বললেন, "কুশল চক্রবর্তী বলে ছ'-সাত বছরের একটা ছেলে পেয়েছি। চৌকোস্ ছেলে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শের আফগান' নাটক থেকে খানিকটা অভিনয় করে দেখাল। দারুণ একেবারে! তার ওপর ভালো ছবি আঁকে। কুশলকে পেলাম বলেই 'সোনার কেল্লা' ছবি করা যাক্, জাতিস্মর মুকুলের চরিত্রে ওকে ভালো মানাবে। ফেলুর ভূমিকায় তোমারও একটা ব্রেক হবে।" কী জানিস—'

ফেলুদাকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, 'ওফ্! দারুণ মানিয়েছে তোমাকে! সটাং বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা, একেবারে ঠিক-ঠাক্ ফেলুদা। বাঙালি ছেলেপুলেদের স্বপ্নের ডিটেকটিভ! আহা, তোমার ডাকনামেই নাম-ডাক!'

'জানিস, 'সোনার কেল্লা'র শুটিং-এর সময় থেকেই ভারি ফুর্তি পাচ্ছিলাম একটা ব্যক্তিগত...কিম্বা বলতে পারিস...পারিবারিক কারণে।'

'পারিবারিক কারণে!'

'বুবু আর মিতিল...আমার দুই ছেলে-মেয়ের জন্য, ওদের দেখার মতো কোনও ছবি 'সোনার কেল্লা'র আগে করিনি। ওরা ওদের বাপের অভিনয় সিনেমার পর্দায় উপভোগ করতে পারে না—এটা যে বাবা হিসেবে আমার কাছে কতটা দুঃখজনক, তোকে বলে বোঝাতে পারব না। ফেলুদা সাজতে পেরে, আমার সেই ক্ষোভ খানিকটা মিটেছিল।...কী রে, ডালমুট নে।'

এক থাবা ডালমুট তুলে, মুচকি হেসে বললাম, 'সিনেমার ফেলুদা যে তোমাকেই সাজতে হবে, এটা সত্যজিৎ রায় জানতেন 'ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি' গল্পটা লেখার আগে থেকেই!'

'ফাজলামো হচ্ছে!'

'নিত্যানন্দ দত্তের 'বাক্স-বদল' বলে একটা ছবিতে তুমি পার্ট করেছিলে, মনে আছে?'

'হ্যাঁ, নিতাই দত্ত—মানিকদার ছবিতে আগে সহকারী পরিচালক ছিলেন, ওঁকে তো বহুকাল ধরে চিনি। ১৯৫৭ সালে নিতাই দত্তই প্রথম আমাকে মানিকদার কাছে নিয়ে গেছিলেন। 'বাক্স-বদল' ছবিটা করেছি ১৯৬৪ সালে, তখনও ফেলুদার গল্প লেখা হয়নি, তাতে কী?'

'নিত্যানন্দ দত্ত 'বাক্স-বদল'-এর পরিচালক, মূল গল্পটা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। চিত্রনাট্য কে লিখেছেন?'

'সত্যজিৎ রায়।'

'চিত্রনাট্য লিখেছেন বলেই হয়তো, ছবির সব চরিত্রের মেকআপ, কস্টিউম...সবই তো সত্যজিৎ রায় এঁকে দিয়েছিলেন! এমনকি যদ্দুর জানি, পরিচালনার কাজেও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন!'

'তা বটে!'

'সেই 'বাক্স-বদল' ছবিতে তুমি সেজেছিলে সাইকায়াট্রিস্ট। একটা দৃশ্যে দার্জিলিঙের সেই তে-মাথা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে তুমি বই-পড়ার ভান করছো! মনের ব্যারামের ডাক্তারটি তখন ছদ্মবেশে, মনে আছে?'

'ক্যারি অন্।'

'গত ৩০ বছর ধরে যতবার 'বাক্স-বদল' দেখেছি, ওই দৃশ্যে ছদ্মবেশী তোমাকে দেখেই বরাবর 'ফেলুদা! ফেলুদা!' বলে মনে মনে চেঁচিয়ে উঠেছি! দার্জিলিঙের ওই তিন রাস্তার মোড়ে তোমার সেই দুষ্টুমির দৃশ্যেই ফেলুদা-চরিত্রের ভিৎ পোঁতা আছে। মনে রেখো, আমি এটা লক্ষ্য করেছি 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' ছাপা হবার আগেই। ওই দৃশ্যের ছদ্মবেশী ডাক্তার লোকটাকেই শেষপর্যন্ত দেখেছি ফেলুদার বর্ণনায়, ফেলুদার ইলাস্ট্রেশনে!'

'বাপ্ রে! এ তো সাংঘাতিক থিসিস!' একপেশে হাসি-মুখে ফেলুদা বলল, 'তোর কথাটা উড়িয়ে দিচ্ছি না। তদন্ত করে দেখতে হবে।'

'শুনেছি, অপু বা নরসিং বা গঙ্গাচরণের চরিত্র কেমন হবে, সে-বিষয়ে তুমি নিজেই কতকগুলো সূত্র আবিষ্কার করেছিলে, যেগুলো সত্যজিৎ রায় মেনে
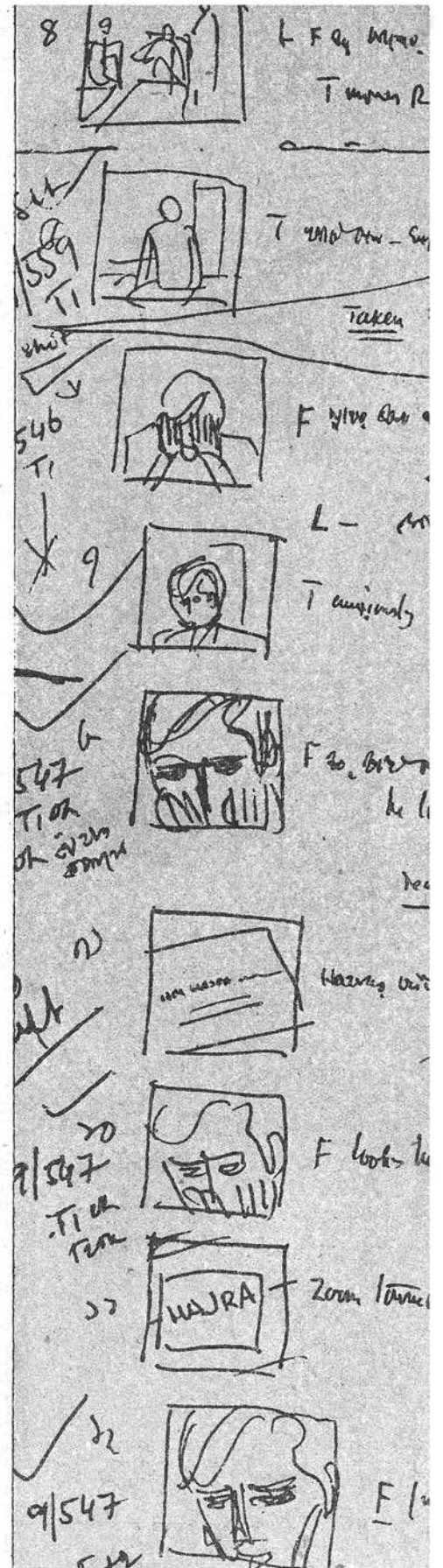
নিয়েছিলেন। যেমন, গঙ্গাচরণের হাঁটা-চলা, দাঁড়ানো, কথা বলার ঢঙ, এমনকি চশমাটা!'

'চশমাটা খুঁজে-পেতে আমি-ই কিনেছিলাম। চক্রবেড়িয়া হকার্স কর্নার-এর পেছনে, পুরনো মালের বাজার থেকে। মানিকদাকে দেখাতেই, হৈহৈ করে অ্যাক্‌সেপ্ট করলেন!'

'ঠিক তেম্‌নি ফেলুদাকে তিলে তিলে বানানোর গপ্‌পোটা শুনি। ফেলুদাতে তোমার কন্‌ট্রিবিউশন কতখানি?'

আবার একটা ঢ্যাঙা-সিগারেট ধরালো ফেলুদা। কপালে চারটে ঢেউ-খেলানো দাগ ফুটে উঠল।

'দ্যাখ্‌, সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে আমার ছিল অ-বাধ স্বাধীনতা! যাকে বলে শিল্পীর স্বাধীনতা। শিল্পের স্বাধীনতা। আমার মনের স্বাধীনতা। চিত্রনাট্য খুঁটিয়ে পড়ে, আলোচনায় বসতাম। তাঁর ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনাটা মেলানো। বরাবর দেখেছি, শিল্পীদের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তাকে অতিশয় গুরুত্ব দিতেন মানিকদা। চরিত্র নিয়ে আলোচনায় বসে বা শুটিং-এর সময় কখনও তাঁকে পণ্ডিতি ফলাতে দেখিনি। কোনও জ্ঞান-ট্যান দিতেন না। দরকার হলে, খুব সহজ কথায় বা ছোট্ট দু'-একটা নির্দেশে ধরিয়ে দিতেন চরিত্রটা। অম্‌নি সেই চরিত্রের বা ঘটনাটার তাৎপর্য বুঝে ফেলতাম টুপ্‌ করে। এমনকি কোনো কিছু মনোমতো না-হলে, সঙ্গে সঙ্গে দারুণ একটা অন্য কিছু—চট্‌ করে ভেবে নিতে পারতেন। মোট কথা, মানিকদা আমার কাছে ঠিক কী চাইছেন, এটা টের পেতে বেশি সময় লাগত না। ব্যস্‌, অম্‌নি...'

'অম্‌নি তোমার মনের ভেতরে একগাদা আলো জ্বলে উঠত?'

'ঠিক তাই। তুই তো মানিকদার ছবির শুটিংয়ে আমাকে দেখেছিস— তোর মনে হয়নি—আমি আমার মতো প্রাণ খুলে অভিনয় করে যাচ্ছি? মানিকদার শুটিং-ফ্লোরে তোর ফেলুদাদার আত্মবিশ্বাস এমন বেড়ে যেতো, প্রায় যা-খুশি করে যেতাম!'

'যা-খুশি করে যেতে!'

'জানি তো—কোনও ভুল হলে, তা সে যত ছোট্ট ভুল-ই হোক্‌, মানিকদা শুধ্‌রে দেবেন। তাছাড়া ফেলুদার আগে সত্যজিৎ রায়ের ছবির 'ন' টা চরিত্রে পার্ট করা হয়ে গেছে। অপু বা উমাপ্রসাদ বা অমলের জন্য এন্তার খেটে-খুটে, তোড়জোড় করে যেভাবে চরিত্রদের বানাতাম, ফেলুদার বেলায় অত-কিছু করতে হয়নি। একই খেলা খেলতে খেলতে... আমার মনকে সামালাবার জন্য কতগুলো অভ্যেস—তদ্দিনে আপনা থেকেই রপ্ত হয়ে গেছিল!'

'গল্পের একটা মন-গড়া চরিত্রকে সিনেমায় জ্যান্ত করে তোলার যে গোপন মন্ত্রটা...'

'সে তো যে-কোনও সাফল্যেরই গোপন মন্ত্র থাকে, যেটা শিখতে না-পারলে, লবডঙ্কা! আমার অভিনয় দেখে লোকের এমন বিশ্বাস হবে... মনে হবে এটা

সত্যি, এই তো ব্যাপার? দর্শকদের এই ধোঁকা দেবার কাজটা খুব শক্ত! অপুকে জ্যান্ত করার সময়—তখন তো আমি আনাড়ি অভিনেতা—অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে, একটা সাইকো-বায়োগ্রাফি বানিয়েছিলাম। অপু-চরিত্রের জীবন-চরিত! চিত্রনাট্যের যতটা সময়, তারমধ্যে অপুর দুটো দৃশ্যের মধ্যিখানে যে দৃশ্যগুলো নেই, ওই সময়টাতে অপু কী করছিল, কী ভাবছিল... এ-সবের খুঁটিনাটি না-জানলে চলবে কেন? তারি সঙ্গে অপুর ছোটবেলা, বড় হওয়া, পরিবেশ, কোন্ পাড়ায় থাকে, বন্ধু কারা, কী পরে, কী খায়—সব জানতে হবে। এইভাবে কত কষ্ট করে, এক-একজন মানুষকে বানিয়েছি তখন। জ্যান্ত করেছি। ফেলুদার বেলায় আমার মনের ভেতরের প্রসেসগুলো দেখলাম—কেমন আপনা থেকেই চালু হয়ে গেল! ফেলুদা একজন থিঙ্কিং পার্সন। মানসিকভাবে লোকটাকে...স্রেফ এই একটা ক্লু দিয়ে ধরার চেষ্টা করলাম। দেখে যেন ফেলু মিত্তিরকে একজন চিন্তাশীল মানুষ বলে মনে হয়। ব্যস, আর কিচ্ছু ভাবিনি। চরিত্রটা দিব্যি নিজের এগোবার রাস্তাটা খুঁজে পেয়ে গেল। 'সোনার কেল্লা'র চার বছর পর 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবিতে যখন অভিনয় করেছি, মনে মনে একটা ব্যাপারেই সচেতন ছিলাম—ফেলুদার চরিত্রটা যাতে বদলে না-যায়। হাঁটা-চলা, আদপ-কায়দা, হাবভাব, কথা বলার ঢঙ বা অভিব্যক্তিতে—যেন ফেলু মিত্তিরকে ঠিক আগের মতোই দেখানো যায়।'

ডালমুট খেতে খেতে ফেলুদার কথা শুনছিলাম। খালি একটা ক্লু-এর ওপর অমন একখানা চরিত্রকে দাঁড় করিয়ে রাখা, খুব সোজা কথা নয়। কিন্তু একটা ব্যাপার মনের মধ্যে খচ্‌খচ্ করতে লাগল! বললাম, 'আমার মনে হয়েছে 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবিতে ফেলুদার চরিত্রে একগাদা জিনিস বদলেছে! খুব সচেতনভাবেই পাল্টানো হয়েছে ফেলুদাকে!'

'পাল্টানো হয়েছে!'

'ভেবে দ্যাখো, 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ তুমি কর্ডের প্যান্টের সঙ্গে খাদির পাঞ্জাবি পরেছো। আর পায়ে চটি। হাঁটা-চলাও 'সোনার কেল্লা'র সায়েব-ফেলুদার তুলনায় বেশ আলাদা, ধীর পদক্ষেপ! এর অবিশ্যি ন্যায্য কারণও আছে। তুমি নির্ঘাৎ এটা সচেতনভাবে করেছো।'

'পরিবেশ! পরিবেশ!' ফেলুদা বলে উঠল।

'বেনারসের সরু সরু গলি-ঘুঁচি আর ঘিঞ্জি বাজারের জন্যই ফেলু মিত্তিরের হাঁটা-চলা পাল্টে গেল? অমন ধীর-গতি হয়ে গেছিল?'

'সে তো হবেই। পরিবেশ-ই তো মানুষকে পাল্টে দেয়। 'সোনার কেল্লা'য় যে সারাক্ষণ কোট-প্যান্ট পরে, সায়েব সেজে, রাজস্থান চষে ফেলা! হুড়মুড় করে বে-পরোয়া অ্যাডভেঞ্চার! ওখানে স্পিড তো বেশি থাকবেই, সব-কিছুরই। দুটো ছবির ছন্দ আর লয়টাই যে আলাদা! তাই ফেলুদাকেও তোর অন্যরকম লেগেছে।'

'অবিশ্যি ধীরে-সুস্থে হাঁটার একটা ইয়ে আছে। মানুষটাকে থিঙ্কিং টাইপ বলে

প্রমাণ করতে... কিঞ্চিৎ সুবিধে পেয়েছো। সেই এফেক্টটা বানাতে, তুমি কন্‌সাস ছিলে অবশ্যই।'

এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ফেলুদা বলল, 'বলেছি তো, সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে এক্সেলেন্স-এর যে রূপটা দেখিস, গোটা ছবিটার মধ্যেই একটা উৎকর্যতা—'

'শিল্পের উৎকর্যতা বা চলচ্চিত্র বোধ-টোধের কথা বলছো?'

'হ্যাঁ, সেই চলচ্চিত্র-বোধটা, খাঁটি শিল্পের উঁচু মাপটা... এমনভাবে গোটা ছবিকে জাপ্‌টে ধরে, সব-কিছুই একটা নিজস্ব ছন্দে, একটা ডেফিনিট রাস্তায় এগিয়ে যায়! কাশীর গলি-ঘুঁচিতে ফেলুদা যে আর-কোনও পোশাকে ঘুরে-বেড়াতে পারে, এটাই মনে হবার কোনও সুযোগ নেই। তবে 'সোনার কেল্লা' ছবির গোড়ার দিকে, কলকাতা-পর্বে, যখন মুকুলের বাবা দেখা করতে এলেন, তখনও ফেলুদা প্যান্ট আর পাঞ্জাবি পরেছিল। রাজস্থানের শীতের জন্য বা অমন ছোটাছুটির জন্য, পরে ফেলুদাকে সায়েব সাজতে হয়েছে !'

'তা বটে!'

'বরাবরই মানিকদা ছিলেন আপ-টু-ডেট। সেই ১৯৭০ দশকের গোড়ায় কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালি যুবকদের ক্যাজুয়াল ফ্যাশান ছিল প্যান্টের সঙ্গে পাঞ্জাবি পরা, এটা জানিস তো?'

'ঠিক।'

'মনে রাখিস, ভালো সিনেমায় প্রত্যেকটা চরিত্র তার নিজস্ব দাবিতে অভিনীত হয়। তার ওপর মানিকদার সঙ্গে আমার...এক ধরনের গভীর বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল তিলে তিলে। একটা দুর্দান্ত র‍্যাপোর্ট তৈরি হয়েছিল। দেখেছি তো, মানিকদা খুব ভালো অ্যাসেস করতে পারতেন। যে-কোনও ব্যাপারে। শিল্পী হিসেবে এত অনেস্ট, এত ইন্‌টিগ্রিটি ছিল, নিজের কাজটাকে এত বেশি শ্রদ্ধা করতেন... আমার শিল্পের শিক্ষা তো ৩৪ বছর ধরে ওই পাঠশালাতেই! আমার অনুভূতিকে, আমার কল্পনা-শক্তিকে মানিকদা বারে বারে যেভাবে উস্‌কে দিতেন, সে তোকে বলে বোঝানো যাবে না! ৩৪ বছর... চাট্টিখানি কথা!'

'আচ্ছা ফেলুদা, 'সোনার কেল্লা'র শুটিং-এর আগে তোমাকে কি রিভল্‌ভার চালানো প্র্যাক্‌টিশ করতে হয়েছিল?'

'কেন? আমাকে তার আগে কোনো ছবিতে রিভল্‌ভার হাতে দেখিসনি?'

'দেখেছি। তবে 'সোনার কেল্লা'র মতো বাস্তব-ধর্মী পিস্তলের অ্যাক্‌শন—তোমার আগের কোনও ছবিতেই ছিল না!'

'দ্যাখ, কাঁচা বয়েস থেকেই ওই বন্দুক-জাতীয় জিনিসের প্রতি আমার একটা প্রেম ছিল। থাকে না এক-একটা বিষয়—খুব ফ্যাসিনেট করে কম-বয়েসে? মনের মধ্যে টান ধরায়! হয়েছে কি, আমার বাবার একটা নিজস্ব রিভল্‌ভার ছিল। গুরুত্বপূর্ণ চাকরি করতেন, তাঁর নিজের প্রোটেক্‌শন-এর জন্য। ফলে রিভল্‌ভার জিনিসটাকে ছোটবেলাতেই খুব কাছ থেকে দেখেছি। বাবা সেটা নাড়াচাড়া করছেন, পরিষ্কার করছেন! গুলি-ভরা অবস্থায় আমাকে ওটা হাতে নিয়ে দেখতে

দিয়েছেন কত বার! সে-বয়েসে কী যে রোমাঞ্চময় অভিজ্ঞতা! তাছাড়া ইশকুল-জীবনে এন. সি. সি করেছি। ন্যাশানাল ক্যাডেট্ কোর্। যুদ্ধ-বিদ্যে শেখার সেই পাঠশালায় বন্দুক চালানোর তালিম পেয়েছি। ফলে রিভল্ভার বা রাইফেল—'

'গল্পের ফেলুদা তো তিন মাসে শিখে, রাইফেল কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছিল! দুর্দান্ত টিপ্ রিভল্ভারে!'

'আমি অবিশ্যি অতটা চৌকোস্ ছিলাম না। তবে বন্দুক-টন্দুকের ব্যাপারে আমার ওই প্রেমটা ছিল, দুর্বলতা ছিল, কিন্তু কোনোরকম ভয়-টয় ছিল না। নতুন করে রিভল্ভার চালানো শিখতে হয়নি। ফেলুদার দুটো ছবিতেই দিব্যি...'

'এমনকি মগনলাল মেঘরাজকে শায়েস্তা করতে, অতগুলো গুলি ছোঁড়ার জন্যেও তোমাকে অ্যাক্শনটা অভ্যেস করতে হয়নি?'

'ও-সব বন্দুক-পিস্তলের ব্যাপারটা সাঁতার-শেখার মতো। বারে বারে নতুন করে...'

'বারে বারে নতুন করে হাত বা মন পাকাতে হয় না?'

'একেবারেই না। ও, তোকে তো বলেছি, মেশিন জিনিসটা আমাকে ভীষণ টানে। বরাবর। বিশেষ করে গাড়ির মেশিন। ওই প্রেমটা দারুণ কাজে লেগেছে নরসিং-এর পার্ট করার সময়!'

'আমাকে অবিশ্যি মন্দার বোস বলেছিল—রিভল্ভার এবং উট, এই দুটো ব্যাপারেই শুটিং-এর সময় তুমি খুব নার্ভাস ছিলে!'

হো-হো করে হেসে উঠল ফেলুদা।

'কামু মুখুজ্যে লোকটা মন্দার বোসের চাইতেও ডেন্জারাস! ওকে একদম বিশ্বাস করবি না। দারুণ ফুর্তিবাজ, রসের লোক, পাজির পা-ঝাড়া! যখন-তখন যাকে-তাকে নিয়ে গপ্পো বানাতে ওস্তাদ! এমনকি প্র্যাক্টিক্যাল জোক্ করতে কামুর জুড়ি মেলা ভার! কী মর্মান্তিক সব প্র্যাক্টিক্যাল জোক্... বিশ্বাস করবি না, ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়! শিউরে উঠতে হয়! ও-ব্যাটা... কাঁকুড়গাছির কাঁকড়া-বিছে!'

'রাজস্থানের মরুভূমিতে 'সোনার কেল্লা'র শুটিং-এর ফাঁকে তুমি খানতিনেক ছড়া লিখেছিলে। তারমধ্যে একটা ছড়ার প্রথম লাইনটা—যদ্দুর মনে পড়ছে : 'সকাল থেকে উটের ভয়ে ছিলাম সবাই সিঁটিয়ে'... ঠিক বলছি?'

'শোন্, উট নিয়ে শুটিং-এর আগে থেকেই আমরা নিজেদের মধ্যে নানারকম মজা করতাম। উটকে তো...সেভাবে সিরিয়াসলি নেওয়া যায় না। উটের অ্যাপিয়ারেন্সটাই দারুণ মজাদার! সেই ফান্-টা, হিউমার-টা ধরা পড়েছে ছড়ার মধ্যে!... তোর কি চা-তেষ্টা পেয়েছে?'

ফেলুদা কি কথা ঘোরাতে চাইছে? চায়ের কথায় কান না-দিয়ে, হুড়মুড় করে বলে উঠলাম, 'উটের দৃশ্যে সরাসরি অভিনয় করার আগে, তুমি কখনও কোনও উটের ধারে-কাছে গেছিলে? যদি না-গিয়ে থাকো, তাহলে অমন সাবলীলভাবে উটের পিঠে চাপ্‌লে কীভাবে? নাকি শুটিং-এর আগের দিন, কিম্বা ফাইনাল

শট্-এর একটু আগে উটে-চড়া প্র্যাক্‌টিশ করেছিলে?'

বাঁ-হাতের তেলোর চাপে ডানহাতের আঙুল মট্‌কাচ্ছিল ফেলুদা। আল্‌তো হেসে বলল, 'আমি যে কম-বয়েস থেকেই ঘোড়ায় চাপাতে ওস্তাদ ছিলাম, সেটা তো জানিস। উটের ব্যাপারে কখনও কিছু বলিনি?'

'কিছু তো মনে পড়ছে না!'

'ছোটবেলায় এন্তার উটের পিঠে চড়েছি। উটের পিঠেই মানুষ হয়েছি বলতে পারিস। আমার বাবার পোষা উট ছিল।'

'উট পুষেছেন তোমার বাবা!'

'তবে আর বলছি কী! যা—শ্রীনাথকে ঝপ্ করে চা দিতে বল্।'

ক্রমশ

দাদা ট্র্যাডিশনে নতুন মানুষ ফেলুদা

মহাশ্বেতা দেবী

ফেলুদাকে বাংলা সাহিত্যে আসতেই হত। কেননা আমরা, বাঙালী পাঠকরা, বরাবর কোনো না কোনো দাদাকে পেয়েছি। বলতেই হবে, সবচেয়ে বেশি পেয়েছি, সেই সব গল্প-বলিয়েদের, যাঁদের গল্পের গরু গাছে ওঠে। এ বিষয়ে ত্রৈলোক্যনাথের ডমরুনাথের তুলনা নেই। তিনি এক বিশাল 'গাঁজাখুরি বলব, বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ব'।

পরশুরামও অবিশ্বাস্য সব গল্প বলে গেছেন। তারপর ইতিহাসের নিয়মেই এলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা! আর ঘনাদার পর টেনিদাই কি কম?

কিন্তু ফেলুদার স্রষ্টার সঙ্গে যখন ক্বচিৎ কদাচ বিশাল আড্ডা হত, তখন অভিজ্ঞতা বিনিময় করতাম।

তিনিও 'প্লাজা' বা অন্যত্র লাইন দিয়া বাস্টার কীটন, বা লরেল-হার্ডি, অবশ্যই চ্যাপলিন দেখতেন। আমিও তাই।

ভালো ভালো ব্রিটিশ বা হলিউডী কমেডি তিনিও উপভোগ করতেন,আমিও।

ভূত ও অলৌকিক, কলাবিজ্ঞান ইত্যাদি বই। ম্যাগাজিনের মধ্যে পেঙ্গুইন বা অ্যর্গোসি দুজনেই পড়তাম।

এমন অনেক অভিজ্ঞতা বিনিময় হত বটে, কিন্তু সব কিছুর পর তিনি হলেন সত্যজিৎ রায়। আমি সেই ফেকলু থেকে গেলাম।

কেন, কেন তিনি ফেলুদার গোয়েন্দা কাহিনী লিখতে গেলেন; কেন?

ফেলুদা একজন পরিশীলিত, ভদ্র, সভ্য গোয়েন্দা। সে যে-সব বিষয়ে জানে, যাতে তার স্রষ্টারও গভীর অনুরাগ।

স্রষ্টা কি হতে চেয়েছিলেন সৃষ্টি? পারতেন না। পৃথিবীর গোয়েন্দা সাহিত্যে অত ঢ্যাঙা কোনো গোয়েন্দা হয় না।

আছে, আরো কথা আছে। ফেলুদার ক্লায়েন্টরা সাধারণত পরিশীলিত, ভদ্র, সভ্য, মনে-প্রাণে বাঙালী। তবে ফেলুদা-কাহিনী ও তার চিত্ররূপে আধিপত্য করে শিশুরা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শৈশব-শিশু-শিশুদের মনোজগত বিষয়ে তাঁর অবসেসিভ উদ্বেগ ছিল। রোমাঞ্চ-রহস্যের নামে তারা যে খিচুড়িসাহিত্য পড়ে, সাধারণত তাতে শিশুর প্রতি শ্রদ্ধা দেখা যায় না, তাতে ভেজালও বিস্তর।

আত্যন্তিক উৎকণ্ঠা থেকেই তিনি শিশুদের মনে রহস্য ও রোমাঞ্চের বিষয়ে একটা সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করবেন বলেই ফেলুদাকে সৃষ্টি করেন। পরিবেশ দূষণের ব্যাপারটা বাইরে যত মনোজগতেও তো তত। শিশুদের জন্য নির্মল একটি মনো-পরিবেশ রচনার ইচ্ছাও তাঁর ছিল।

শিশুদের প্রতি ভালবাসা, তা থেকেই ফেলুদা। আর ফেলুদার মাধ্যমে তিনি যে বিশাল শিশুজগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেন, সে এক বিশাল পুরস্কার। তা নিজেও বলতেন।

ফেলুদা তার পূর্বসূরীদের মতো গল্প বলিয়ে দাদা নয়, সে অ্যাকশান-নায়ক। ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ এই স্রষ্টা ফিরিয়ে আনছিলেন। দুষ্টেরা শাস্তি পায়। সামান্য মানুষদের সাধারণ আশা-আকাঙ্খা সম্মান পায়। শেষ অবধি এক সুস্থ মূল্যবোধে আস্থা ফেরে। স্রষ্টা এ সব ইচ্ছে করেই করেছেন।

এ জন্যই ফেলুদাকে আমাদের দরকার। কেননা স্রষ্টার ভাবমূর্তি তাঁর দৈর্ঘ্য ছাড়াচ্ছিল। চলচ্চিত্র জগতে ওয়ান অ্যান্ড ওনলি হবার হ্যাপা হয়তো একেক সময়ে তাঁকে ক্লান্তও করত।

তখন ফেলুদাকে নিয়ে পালিয়ে যেতেন। নিউটনের একটা বেড়াল ছিল। কার্ক ডগলাসের ছিল সীল মাছ। ফেলুদার স্রষ্টা যদি অরণ্যে-পাহাড়ে-এখানে-ওখানে হারিয়ে যেতে পারতেন, বেঁচে যেতেন।

কোথাও তাঁর হারিয়ে যাবার জায়গা ছিল না বলেই তাঁকে ফেলুদাকে সৃষ্টি করতে হয়েছিল। ওটা তাঁর এসকেপ ছিল, মনোমত বয়সীদের লেখনী দিয়ে কাছে টেনে এনে হারোনো শৈশব-বাল্য ও কিশোর বয়সকে আবার কাছে পেতেন।

লেখক সত্যজিৎ রায়কে ফেলুদার গল্প লিখতেই হত। স্রষ্টার শৈশব ও কৈশোর জানি না। কিন্তু ফেলুদা কোনো অঙ্কের নিয়মে লেখা নয়। কোনো চলচ্চিত্রে গভীর জ্ঞানী ও উজ্জ্বল মেধার মানুষেরও সৃষ্টি নয়।

যে সত্যজিৎ একদা (হয় তো পরেও) ব্রিটিশ হিউমারে মজা পেতেন, এম. আর. জেমস বা ওয়েল্‌স,

ড্যাশিয়ল হ্যামেট বা রে ব্র্যাডবারি পড়েছেন গভীর আনন্দে, করবেটের দুনিয়া যাঁর ভালো লাগত, ফেলুদা মাধ্যমে তিনি তাকেই তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয়বার অনুভব করেছেন সেই তরুণ বয়সের অতীতকে।

ফেলুদা তো ওঁর মধ্যেকার লুকানো শিশুটির কাছে একটা আনন্দের হাট খুলে দেয়। ওয়েল্‌সের সেই অদ্ভুত দরজা খুলে গেল। সত্যজিৎ ঢুকে গেলেন। ছোটদের জন্যে লিখে, ছোটদের পত্র পেয়ে তিনি গভীর, গভীর আনন্দ পেতেন।

সত্যজিৎ গেলেন। ফেলুদাকেও নিয়ে গেলেন। আবার কোনোদিন কেউ কি সত্যজিতের মত দায়িত্ববোধে,মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনবার তাগিদে অন্য কোনো দাদাকে সৃষ্টি করবেন?

দেখাই যাক। প্রতিশ্রুতি তো অনেক দেখি। তবে ফেলুদার ব্যাপারটা নিছক গল্পের বাইরে অনেক বড়, যে জন্য এত কথা বললাম।

স্রষ্টা নেই, তবু সৃষ্টির মধ্যে আছেন। ফেলুদার মধ্যেও আছেন।
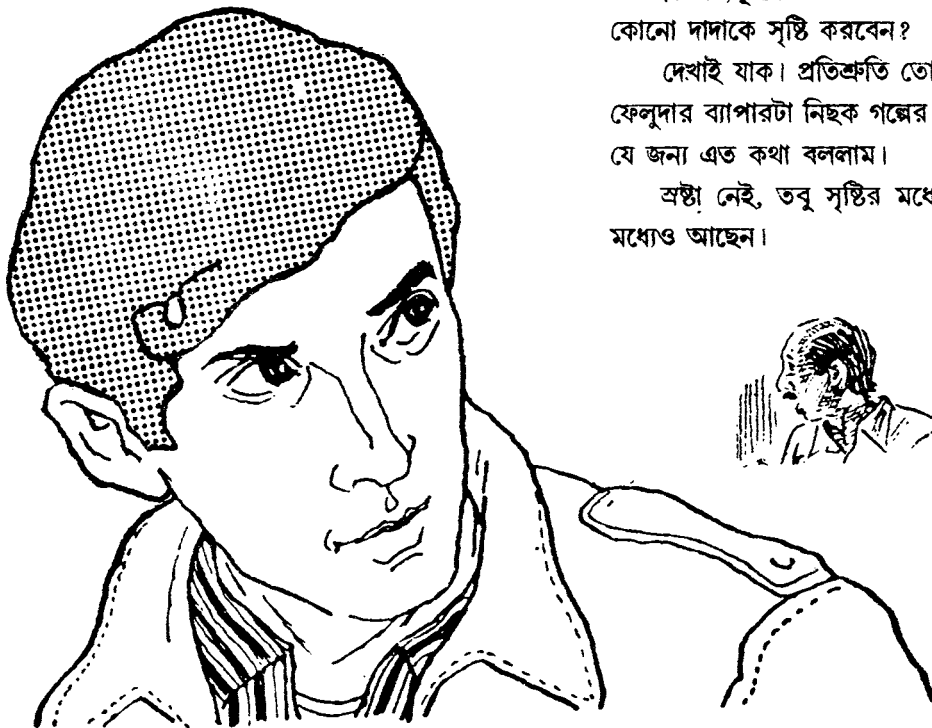
ঐক্যই শক্তি

'বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি
বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—
ইহাই ভারতবর্ষের অর্ন্তনিহিত ধর্ম।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প শ্চি ম ব ঙ্গ স র কা র

ফেলুদা
ফোটো অ্যালবাম
স ন্দী প রা য়
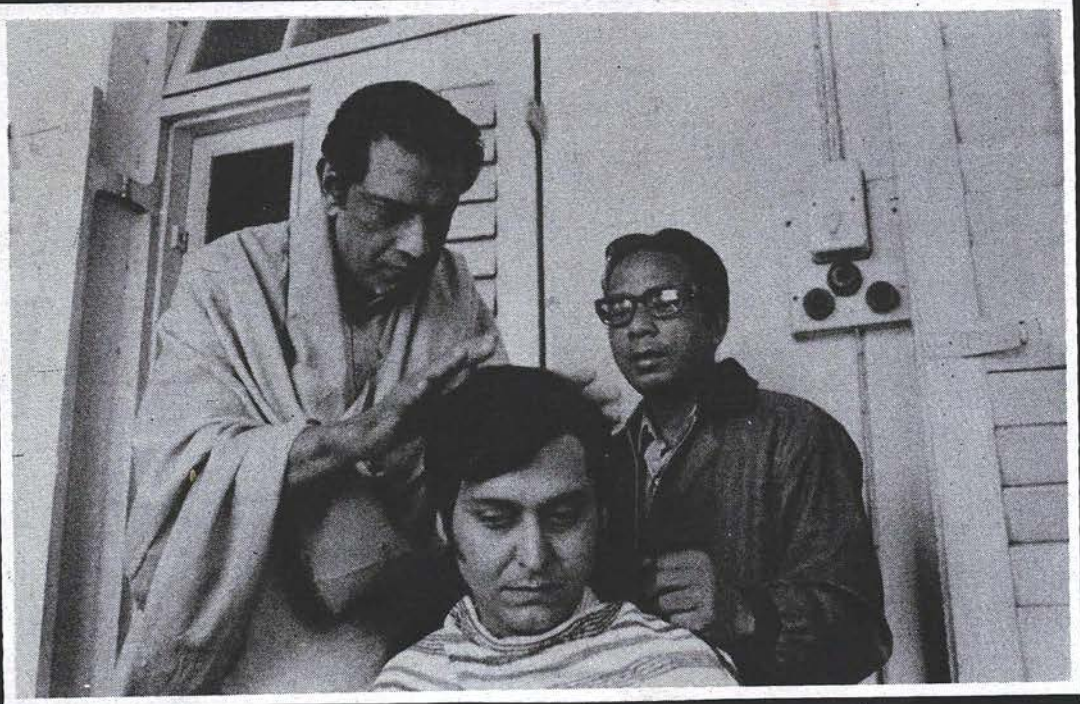
`সোনার কেল্লা` ছবির শুটিং-এর আগে আমাদের বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে মেক-আপ টেস্ট। সৌমিত্র (ফেলুদা) চট্টোপাধ্যায়ের পরচুলা ঠিক করে দিচ্ছেন বাবা। পাশে দাঁড়িয়ে মেক-আপ ম্যান অনন্ত দাশ।

সন্তোষ (জটায়ু) দত্ত-র রাখা ঝোলা গোঁফটা কতখানি ছাঁটতে হবে, সেটা দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
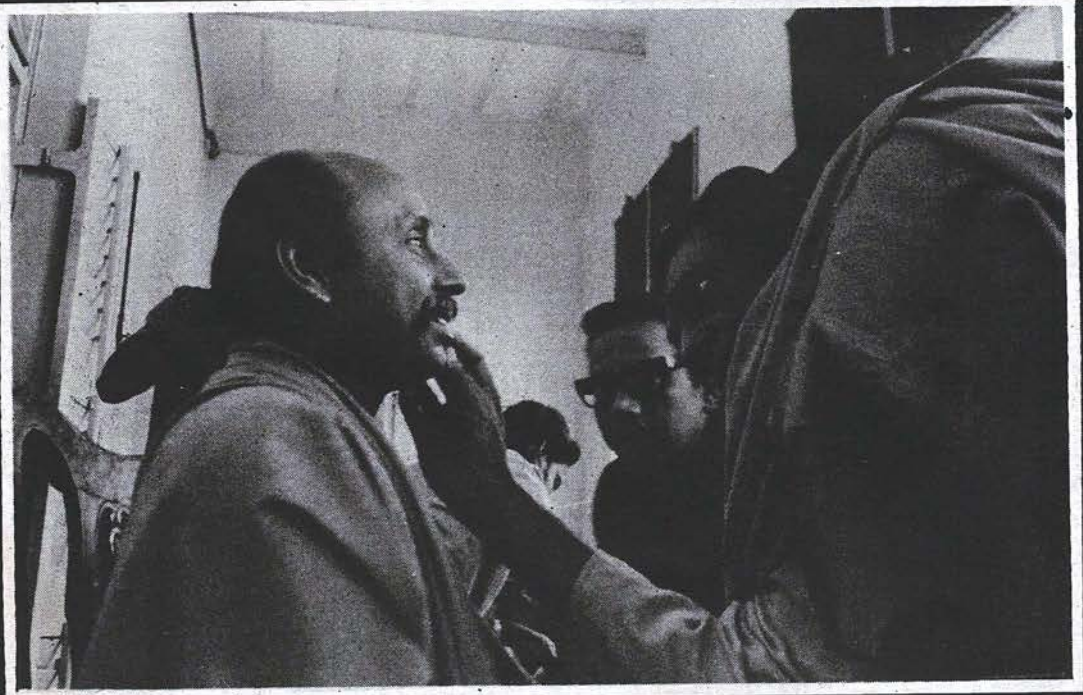
এবার শ্রীমান কুশল (মুকুল) চক্রবর্তীর চুল কাটার পালা।

'সোনার কেল্লা'র পুরো পরিচয়লিপি বাবা এঁকেছিলেন। তারমধ্যে একটি তাঁকে আঁকতে দেখা যাচ্ছে, ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে মুকুলের ঘরের সেট-এ বসে।
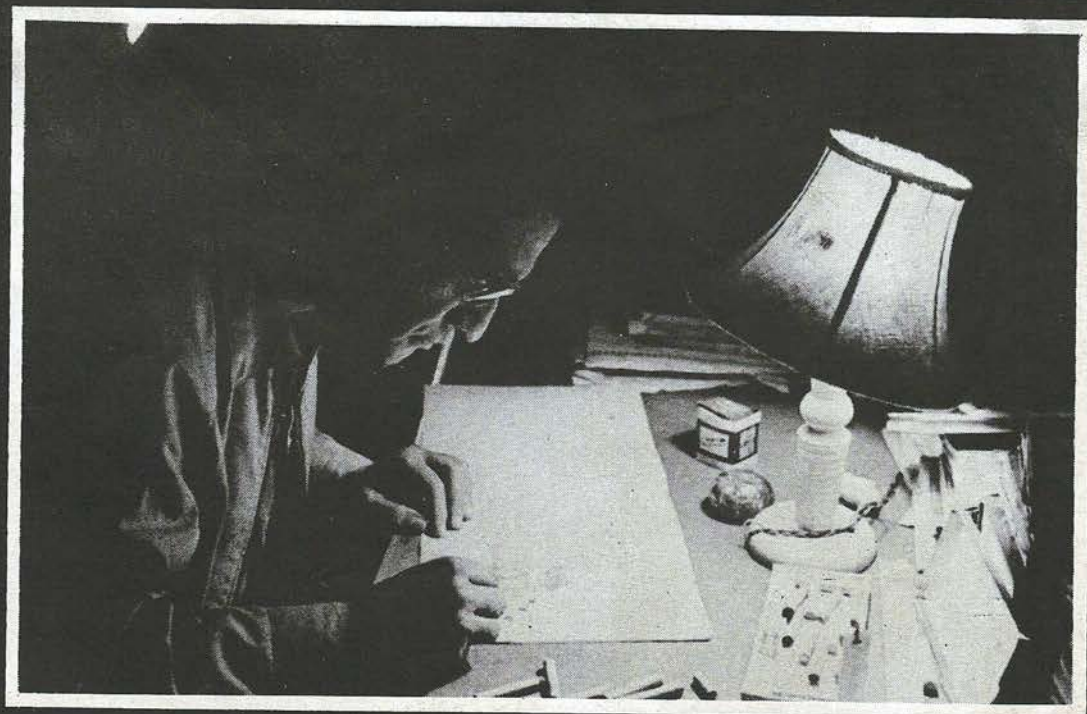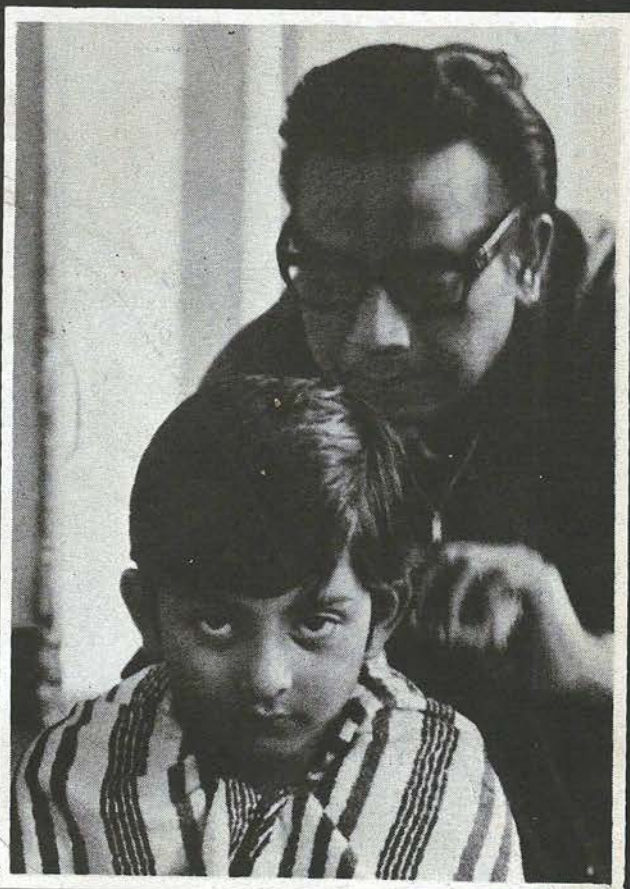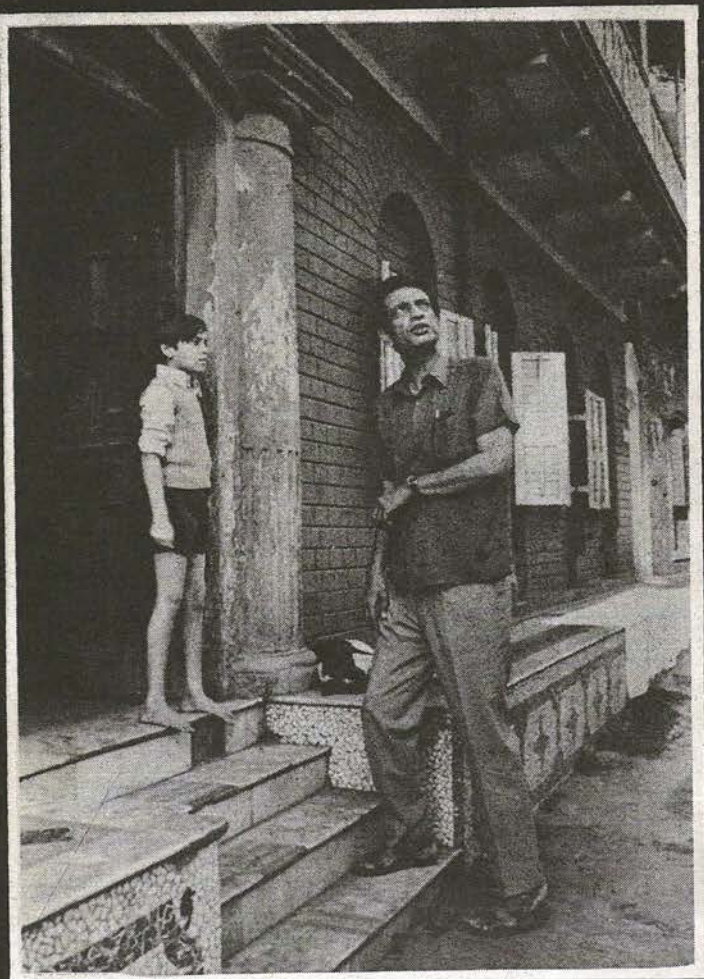
পদ্মপুকুর রোডে তোলা হচ্ছে কিডন্যাপিং-এর দৃশ্য। দু'নম্বর মুকুল (শান্তনু বাগচী) ছাড়াও সেখানে এসে হাজির হয়েছেন 'সোনার কেল্লা'র দুই মোক্ষম ভিলেন, মন্দার বোস (কামু মুখোপাধ্যায়) ও অমিয়নাথ বর্মন (অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়)।

পদ্মপুকুর রোডে শুটিং-এর শেষে সকলে ঘেরাও!

স্টুডিওতে ফেলুদার বাড়ির সদর দরজার সামনে সিদ্ধার্থ (তোপ্‌সে) চট্টোপাধ্যায় তার মানিককাকার নির্দেশ শুনতে ব্যস্ত।
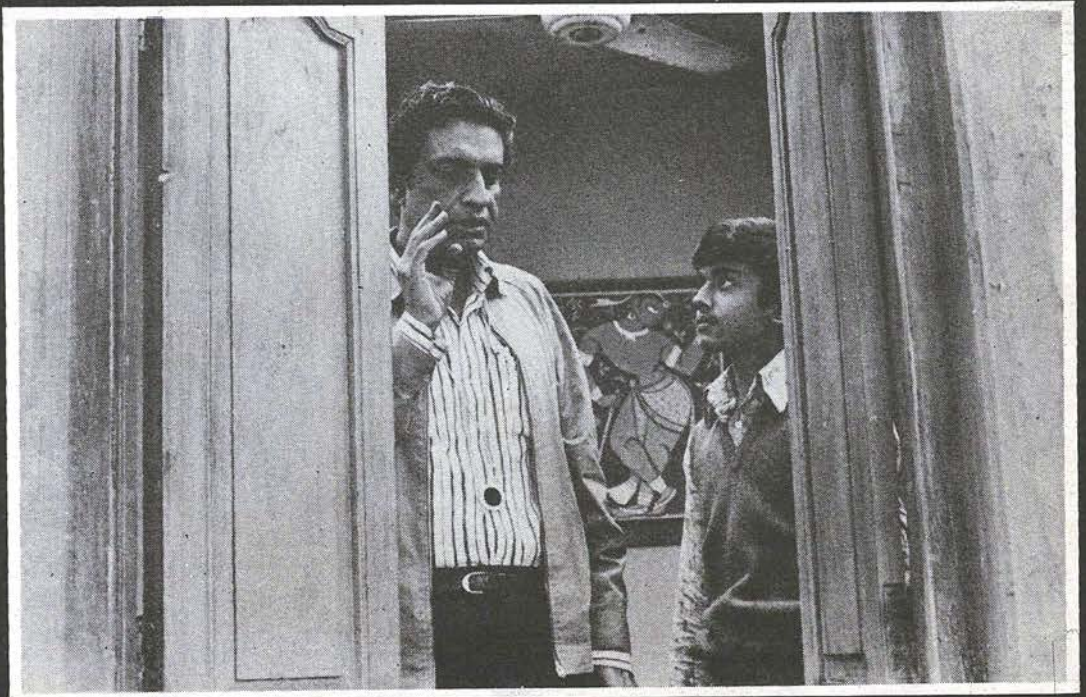
ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে তৈরি নকল ট্রেনের ভেতর শুটিং।

'উইলিয়াম জেম্‌স হার্শেল কে ছিলেন?'—সিধুজ্যাঠার ভূমিকায় হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বাবা ডায়লগ পড়ে শোনাচ্ছেন।

হাওড়া স্টেশনে ফেলুদাকে নিয়ে শুটিং।

'সোনার কেল্লা'র সব ট্রেনই যে নকল, তা কিন্তু নয়। নিচের ছবিতে দিল্লি-কালকা মেল-এর এক কামরায় কাজ চলছে। দিল্লি থেকেই আমরা সদলবলে রাজস্থান রওনা হই।
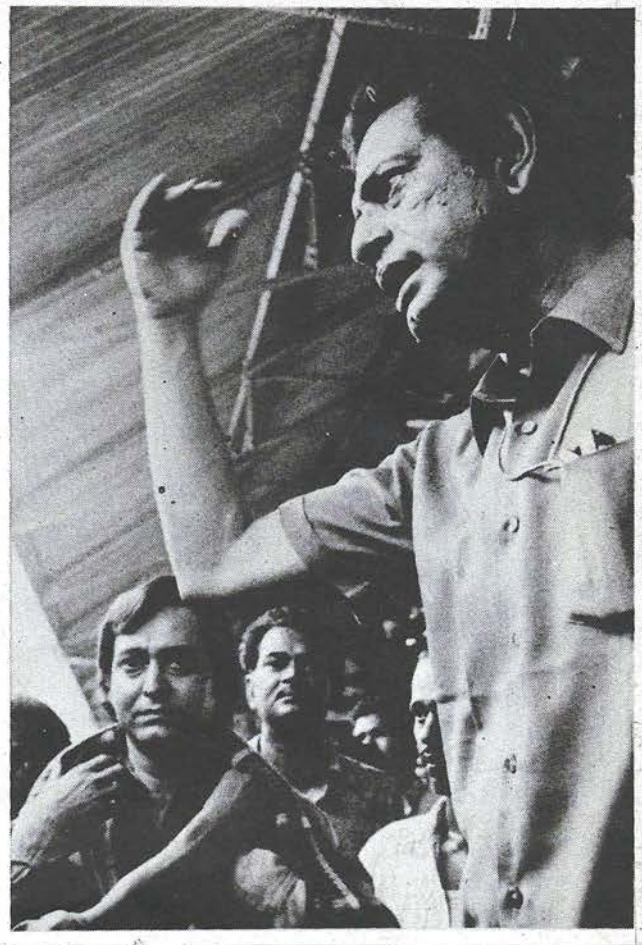
রাজস্থান। যোধপুর থেকে জয়সলমীর যাবার পথে লাঞ্চ-ব্রেক। বাসের
মাথার উপর চাপানো বাক্সের বহর দেখেই বুঝতে পারছ আমরা কতজন ছিলাম!

(চলবে)

জটায়ুর ভুল যখন তখন

প্রলয় শূর

ভুল করেছি, ভুল লিখেছি ভুল বলেছি, ভুল খেলেছি— ভুলেও কেউ আমরা স্বীকার করি না। আমাদের চেনা-জানার মধ্যে একটি মাত্র লোকই তা স্বীকার করেন, হাসি-মুখে মেনে নেন, কৃতজ্ঞতায় শুধরে নেন। লোকটির নাম লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু। রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক জটায়ু এক অসম্ভব জনপ্রিয় লেখক। নতুন বই বেরনোর পরদিন থেকে একটানা তিন মাস বেস্টসেলার লিস্টে নাম থাকে। বেশি লেখেন না। বছরে দুটো উপন্যাস, একটা বৈশাখে একটা পুজোয়।

'বোসপুকুরে খুনখারাপি' গল্পে তোপ্‌সে বলছে, আজকাল জটায়ুর লেখায় তথ্যের ভুল আগের চেয়ে অনেক কম থাকে। কারণ উনি শুধু যে ফেলুদাকে পাণ্ডুলিপি দেখিয়ে নেন তা নয়, সম্প্রতি নিজেও অনেকরকম এনসাইক্লোপিডিয়া ইত্যাদি কিনেছেন!

'অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য'র শেষে লালমোহনবাবু বলে বসলেন, 'এন্ডস ওয়েল দ্যাট অল্‌স ওয়েল।'

আর ঐ গল্প যখন শুরু হচ্ছে, লালমোহনবাবু খুব ডাঁটের মাথায় ফেলুদাকে বলেছেন, 'আপনি তো আমার লেখা শুধরে দেন, সেটা আর এবার থেকে দরকার হবে না।'

কারণ ওঁদের পাড়ায় এক গ্রেট স্কলার এয়েচেন, নাম মৃত্যুঞ্জয় সোম। 'বোধহয় হাবার্ট ইউনিভার্সিটির ডবল এম.এ. বা ওই ধরনের একটা কিছু।'

ফেলুদা মুখ না-তুলে পারল না, 'হাবার্ট নয় মশাই, হাভার্ড হাভার্ড'।

জটায়ু বললেন, 'আমার 'হণ্ডুরাসে হাহাকার'টা পড়তে দিয়েছিলুম। চৌত্রিশটা মিসটেক দেখিয়ে দিলেন। তবে বললেন, ভেরি এনজয়েব্‌ল।'

চৌত্রিশটা মিস্‌টেকে কি আসে যায়, তাঁর বই যে লোকে এনজয় করে, পড়ে মজা পায়, খুশি হয়, ছোটরা তাঁর বই হাতে পেলে লাফিয়ে ওঠে, এই সাক্‌সেসটাই বা কম কিসে?

'জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা' গল্পে পানিহাটিতে রাত বারোটার সময় লালমোহনবাবু ফেলুদার ঘরে এসে বললেন, 'বারান্দায় গেসলুম। চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে মশাই— উপ্‌চে পড়ে আলো।'

ফেলুদা বললেন, 'উপ্‌চে নয়, উছলে।'

'জয়বাবা ফেলুনাথ'-এ যখন আমরা মছলিবাবার খবরটা পড়ি, 'বাবাজী নাকি প্রয়াগ থেকে গঙ্গাবক্ষে ভাসমান অবস্থায় বারাণসীতে এসে পৌঁছেছেন' তখন লালমোহনবাবু বললেন, 'হয়ত সেই একেবারে তিব্বতে গঙ্গার সোর্স থেকে ভাসা শুরু করেছেন, ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়।'

ফেলুদা বলেন, 'গঙ্গার সোর্স তিব্বতে, এখবর কে দিল আপনাকে।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'ও হো হো সরি — ওটা বোধহয় ব্রহ্মপুত্র। যাইহোক তিব্বত না হোক হিমালয় তো।'

বিকাশবাবু জানিয়েছেন, রুকুর কাছে জটায়ুর খানতিনেক বই আছে! ওঁরই লেখা পড়ে রুকু বলেছে মছলিবাবার গায়ের রঙটা কঙ্গোর গঙ্গোরিলার মতো কালো।

'সাবাস' বলে উঠলেন লালমোহনবাবু, 'তুমি 'গোরিলার গোগ্রাস' পড়েছ রুকুবাবু?'

গঙ্গোরিলা জটায়ুর লেখা 'গোরিলার গোগ্রাস'-এর নব্বই ফুট লম্বা অতিকায় রাক্ষুসে গোরিলার নাম। গল্পের

আইডিয়াটা কিং কং থেকে নেওয়া, সেটা লালমোহনবাবু নিজেও স্বীকার করেন।

তাঁর ধারণা গণেশটা আসলে চুরিই যায়নি। ওটা অম্বিকাবাবু আফিং-এর ঝোঁকে সিন্দুক থেকে বার করেছেন, আর তারপর নেশা কেটে যাবার পর ওটার কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। তাহলে সেটা এখন আছে কোথায়?

'ওঁর তালতলার চটিটা দেখেছ? ওঁর পায়ের চেয়ে চটিজোড়া কতখানি বড় সেটা লক্ষ করেছ? একজন বুড়ো মানুষ পায়ে চটি দিয়ে বসে থাকলে কে আর চটি খুলে তার ভেতরে সার্চ করতে যাবে বলো?'

তোপ্‌সের সন্দেহ হয়। 'আপনার নতুন গল্পে এরকম একটা ব্যাপার থাকছে বুঝি?'

লালমোহনবাবু মুচকি হেসে বলেন, 'ঠিক ধরেছ। তবে আমার গল্পে গণেশের বদলে একটা দু হাজার ক্যারেটের হীরে।'

'দু হাজার?' তোপ্‌সের চক্ষু তো চড়কগাছ! 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হীরে স্টার অফ আফ্রিকা কত ক্যারেট জানেন?'

লন্ডনের জমজমাট রাস্তা অক্সফোর্ড স্ট্রিটে জটায়ু

'কত?'

'পাঁচশো। আর কোহিনুর হল মাত্র একশো দশ।'

লালমোহনবাবু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'দু হাজার না হলে গল্প জমবে না।'

'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে' সেই গলিটার দু'দিকে দোকান, ছোট ছোট হোটেল রেস্টোরান্ট। 'পাই শপ' কথাটা অনেক রেস্টোরান্টের গায়েই লেখা রয়েছে।

'কলকাতায় পাইস হোটেল ছিল এককালে বলে জানি।' চাপা গলায় মন্তব্য করলেন লালমোহনবাবু, 'পাই শপ তো কখনো শুনিনি'।

তোপ্‌সে তখন বলে, 'এ পাই টাকা আনা পাই না; পাই একরকম বিলিতি খাবার'।

পরে একসময় লালমোহনবাবু মন্তব্য করেন, 'আমাদের এই তদন্তে ওষুধপত্রের একটা বড় ভূমিকা আছে বলে মনে হচ্ছে'।

ফেলুদা বেশ জোর দিয়ে বললেন, 'শুধু ভূমিকা নয়, আমার ধারণা প্রধান ভূমিকা'।

'সেই যে সার্জিক্যাল অ্যাসিডের কথা অনীকেন্দ্র সোমের নোটবুকে লেখা ছিল সেটা কি—'

'সার্জিক্যাল নয়, লাইসার্জিক অ্যাসিড। এল এস ডি।'

রিসেপশন-এর দেয়ালে টাঙানো একটা নেপালী মুখোশের নাকের ওপর লালমোহনবাবু বারতিনেক হাত বুলিয়ে বললেন, 'ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদের নামটা কী যেন ভাই তপেশ?'

'বাকিংহাম প্যালেস?'

'ইয়েস, তবে এর সঙ্গে বোধহয় কম্পারিজন হয় না।'

'কার সঙ্গে?'

'আমাদের এই হোটেল লুমুম্বা।'

'লুম্বিনী।'

'লুম্বিনী।' একটু চুপ থেকে বললেন, 'এইখানেই তো জন্মেছিলেন তাই না?'

'কে?'

'গৌতম বুদ্ধ?'

'এই হোটেলে নয় নিশ্চয়ই।'

'কেন, বিফোর ক্রাইস্ট হোটেল ছিল না বলছ?'

'বাক্স-রহস্য'তে ফেলুদা আর শ্রীমান তপেশের জন্যে জটায়ু তাঁর লেটেস্ট বইটা নিয়ে এসেছেন। ফেলুদা জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কোন্ দেশ নিয়ে লেখা?'

জটায়ু উত্তর দিলেন, 'এটা প্রায় গোটা ওয়ার্লডটা কভার করিচি। ফ্রম সুমাত্রা টু সুমেরু।'

'এবারে আর কোনো তথ্যের গণ্ডগোল নেই তো?'

'নো স্যার। আমাদের গড়পার রোডে বদন বাঁড়ুজ্যের বাড়িতে ফুল সেট এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিয়া রয়েছে। প্রত্যেকটি ফ্যাক্ট দেখে মিলিয়ে নিয়েছি।'

ফেলুদার 'ব্রিটানিয়া না দেখে ব্রিটানিকা দেখলে আরো নিশ্চিন্ত হতাম,' কথাটায় কান না-দিয়ে লালমোহনবাবু বলে চললেন, 'একটা ক্লাইমেক্স আছে পড়ে দেখবেন — আমার হিরো প্রখর রুদ্রের সঙ্গে জলহস্তীর ফাইট।'

'জলহস্তী?'

'কিরকম থ্রিলিং ব্যাপার পড়ে দেখবেন।'

'কোথায় হচ্ছে ফাইটটা?'

'কেন, নর্থ পোলে। জলহস্তী বলচি না।'

'নর্থ পোলে জলহস্তী?'

'সে কি মশাইঃ ছবি দেখেননি? খ্যাংরা কাঠির মত লম্বা লম্বা খোঁচা খোঁচা গোঁফ, দুটো করে বাইরে বেরিয়ে আসা মুলোর মতো দাঁত, থ্যাপ থ্যাপ করে বরফের উপর দিয়ে ঃ

'সে তো সিন্ধুঘোটক। যাকে ইংরিজিতে বলে ওয়লরাস। জলহস্তী তো হিপোপটেমাস ঃ আফ্রিকার জন্তু।'

জটায়ুর জিভ লজ্জায় লাল হয়ে দু-ইঞ্চি বেরিয়ে এল, 'এঃ ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যা। ব্যাড মিসটেক। ঘোড়া আর হাতিতে গণ্ডগোল হয়ে গেছে।'

লালমোহনবাবু তোপ্‌সেকে বললেন, 'জানো ভাই রহস্য গল্প লেখা ছেড়ে দেব ভাবছি।...

তোপ্‌সে বলল, 'কেন? কী হল?'

'গত দুদিনের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটল সেসব কি আর বানিয়ে লেখা যায়, না ভেবে বার করা যায়? কথায় বলে না ট্রুথ ইজ স্ট্রঙ্গার দ্যান ফিকশান।'

'স্ট্রঙ্গার না, কথাটা বোধহয় স্ট্রেঞ্জার।'

ফেলুদা এসে অবধি সিমলা বা তার বরফ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্যই করেনি। আর ঠিক তার উল্টোটা করছেন

কাঠমান্ডু শহরের দরবার স্কোয়্যারে কালভৈরবের মূর্তির সামনে জটায়ু

লালমোহনবাবু। যা কিছু দেখেন তাতেই বলেন, 'ফ্যানাস্ট্যাটিক।' তোপ্‌সে যখন বলল যে কথাটা আসলে 'ফ্যান্টাস্টিক' তাতে লালমোহনবাবু জানালেন, উনি নাকি ইংরেজি এত অসম্ভব তাড়াতাড়ি পড়েন যে প্রত্যেকটা কথা আলাদা করে লক্ষ্য করার সময় হয় না!

ডাইনিং রুমের এককোণে ব্যাণ্ড বাজছে, লালমোহনবাবু সেটাকে বললেন, কনসার্ট।

ফেলুদা জানতে চাইলেন, 'আপনি যে অস্ত্রের কথা বলছিলেন, সেটা কী হল?'

'একটা বুমেরাং। এক অস্ট্রেলিয়ান সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়েছিল কাগজে। আরো পাঁচরকম জিনিসের মধ্যে ওটাও ছিল। লোভ সামলাতে পারলুম না। শুনিচি ঠিক করে ছুঁড়তে পারলে নাকি শিকারকে ঘায়েল করে আবার শিকারীর হাতেই ফিরে আসে।'

'একটু ভুল শুনেছেন। শিকার ঘায়েল হলে অস্ত্র শিকারের পাশেই পড়ে থাকে। লক্ষ্য যদি মিস্ করে তাহলেই আবার ফিরে আসে।'

গল্পের শেষে সেই বিখ্যাত ম্যানুস্ক্রিপ্টটা দেখে

লালমোহনবাবু বলে উঠলেন, 'এ যে সেই বিখ্যাত ম্যানুস্‌প্রিন্ট'

এই লালমোহনবাবুর সঙ্গে ফেলুদা তোপ্‌সের প্রথম আলাপ হয়েছিল 'সোনার কেল্লা'য়। শুরুতেই ভুল। উটের কথা শুনে তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল, 'শিপ অফ দ্য ডেজার্ট। এ তো আমার স্বপ্ন মশাই। আমার 'আরক্ত আরব' উপন্যাসে আমি বেদুইনের কথা লিখেছি যে। তাছাড়া 'সাহারায় শিহরণ'-এও আছে। অদ্ভুত জীব। নিজের ওয়াটার সাপ্লাই নিজের পাকস্থলীর মধ্যে নিয়ে বালির সমুদ্র দিয়ে সার বেঁধে চলেছে। কী রোমান্টিক ওঃ।'

ফেলুদা জিজ্ঞেস করলেন, 'পাকস্থলীর ব্যাপারটা কি আপনার বইয়ে লিখেছেন নাকি?'

লালমোহনবাবু থতমত খেয়ে বললেন, 'ওটা ঠিক নয় বুঝি!'

ফেলুদা বললেন, 'জল আসে উটের কুঁজ থেকে। কুঁজটা আসলে চর্বি। ওই চর্বিকে অক্সিডাইজ করে উট জল করে নেয়। এক নাগাড়ে দশ পনের দিন ওই চর্বির জোরে জল না খেয়ে থাকতে পারে।'

লালমোহনবাবু কৃতজ্ঞ, 'ভাগ্যিস বললেন। নেক্সট এডিশনে ওটা কারেক্ট করে দেব।'

এই হলো জটায়ুর সততা। তাঁর গল্পের মধ্যে যতই গাঁজাখুরি থাকুক না কেন, তথ্যের ভুল শুধরে নিতে তাঁর কোনো লজ্জা নেই। পাঠককে টানটান উত্তেজনার মধ্যে ধরে রাখেন তিনি, কিন্তু সেই সুযোগে পাঠককে ঠকাতে চান না, —

'নেক্সট এডিশনে ওটা কারেক্ট করে দেব।' ক'জন লেখক এটা বলবেন? একজনও না। কারণ, খেলোয়াড় গায়ক অভিনেতা জাদুকর মন্ত্রী মডেল — সকলের চেয়ে বেশি অহমিকা যার, তার নামই তো লেখক। তার ধারণা, সে লেখক, সে কোনো ভুল করতেই পারে না। জটায়ু তা নন। খুব সাধারণ ব্যাপারেও নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি সচেতন। না-জানা নিয়ে কখনো চালাকি করেন না, যা আমরা সারাক্ষণই করি। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'হাজরা কিসের ডাক্তার বলুন তো?'

ফেলুদা বললেন, 'হাজরা একজন প্যারাসাই-কোলজিস্ট।'

'প্যারাসাইকোলজিস্ট?' লালমোহনবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল — 'সাইকোলজির আগে যে আবার প্যারা বসে সেটা তো জানতুম না মশাই। টাইফয়েডের আগে বসে সেটা জানি। তার মানে কি হাফ সাইকোলজি — প্যারাটাইফয়েড যেমনি হাফ টাইফয়েড?'

অথচ জটায়ু যে লেখাপড়া করেননি তা নয়। তিনি বুঝতে পেরেছেন, গ্লোবট্রটার লোকটা 'পাওয়ারফুলি সাসপিশাস'।

ফেলুদা জানতে চাইলেন, 'সাসপিশাস কেন?'

জটায়ু বললেন, 'কাল গাড়িতে যেতে যেতে খুব বাক্‌তাল্লা মারছিল। বলে, ট্যাঙ্গানায়িকায় নাকি নেকড়ে মেরেছে নিজে বন্দুক দিয়ে। অথচ আমি জানি যে সারা আফ্রিকার কোনো তল্লাটে নেকড়ে জানোয়ারটাই নেই। মার্টিন জনসনের বই পড়েছি আমি— আমার কাছে ধাপ্পা।'

'টিনটোরেটোর যীশু'তে লালমোহনবাবুর মনে হচ্ছে ছবিটার সঙ্গে কেমন যেন একটা নাড়ির যোগ অনুভব করছেন। কোন্ ছবি? টিনটোরেটো উচ্চারণ করতে গিয়ে বলে ফেললেন, 'টিরিনটারো'।

ওই গল্পে আরো অনেক কিছু উচ্চারণ করতে গিয়ে তাঁর আটকেছে। ক্রমাগত ভুলভাল বলে চলেছেন। আর্ট নিয়ে লেখাপড়া করার জন্যে তিনি জোগাড় করে এনেছেন অনুপম ঘোষ দস্তিদারের 'সমগ্র পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস' বইটা।. ফেলুদাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন 'এই যে নাম দেখছি এ বইয়ে—গায়োট্টো—।'

'গায়োট্টো লিখেছে নাকি?'

'তাই তো দেখছি। গায়োট্টো, বট্টিসেল্লি, মনটেগ্‌ন...।'

'আপনি ও বইটা রাখুন। আমি আর্টিস্টের নামের একটা তালিকা করে দেব — আপনি চান তো নামগুলো মুখস্থ করে রাখবেন। গায়োট্টো নয়, ইংরেজি উচ্চারণে জিয়োটো, ইতালির জ্যোত্তো। জ্যোত্তো, বত্তিচেল্লি, মানতেন্যা...।'

ভূদেব রাজা আর ফেলুদার কথাবার্তার মাঝখানে জটায়ু নিজের মনে মনে বিড় বিড় করেছেন,

'বত্তিজোত্তো... দাভিঞ্চেল্লি ।'

ওঁরা হংকং যাচ্ছেন। লালমোহনবাবু উৎসাহে ফেটে পড়ছেন ঠিকই, কিন্তু যেখানে যাচ্ছেন সে জায়গা সম্বন্ধে ধারণা এখনো স্পষ্ট নয়। জিজ্ঞেস করলেন, চীনের প্রাচীরটা দেখে আসার কোনো সুযোগ হবে কিনা। তাতে ফেলুদাকে বলতে হলো যে চীনের প্রাচীর পিপ্‌লস রিপাবলিক অফ চায়নায়, পিকিং হচ্ছে এর কাছে, আর হংকং হলো ব্রিটিশদের শহর। পিকিং হংকং থেকে অন্তত পাঁচশো মাইল।

'হত্যাপুরী' উপন্যাসে ওঁরা রেলওয়ে হোটেলে এসেছেন ডিনার খেতে। লালমোহনবাবু বললেন, 'রেলের খাওয়ার যা ছিরি হয়েছে আজকাল মশাই, আমি ভাবলুম রেলওয়ে হোটেলের খাওয়াও বুঝি সেই স্ট্যান্ডার্ডের হবে। সে ভুল ভেঙে গেছে। থ্যাঙ্কস টু ইউ।'

বিলাসবাবু হেসে বললেন, 'এবার সুফ্‌লেটা খেয়ে দেখুন'।

'কী খাবো সূপ প্লেটে? সূপ তো গোড়াতেই খেলুম।'

'সূপ প্লেট নয়। সুফ্‌লে — মিষ্টি।'

'রয়েল বেঙ্গল রহস্য'তে তিস্তা পেরোবার কিছু পর থেকেই পথের ধারে জঙ্গল পড়তে লাগল। লালমোহনবাবু একপাল ছাগল দেখে হঠাৎ 'হরিণ হরিণ' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। ফেলুদা বললেন, 'তাও ভালো, বাঘ বলেননি।'

এই 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য'তেই লালমোহনবাবুর বই উৎসর্গের ব্যাপারটা রয়েছে। ভদ্রলোক বিখ্যাত

মগনলালের ড্রাগের প্রভাবে
জটায়ুর দুর্দশা

লোকদের ছাড়া বই উৎসর্গ করেন না, আর তাদের বেশিরভাগই মারা গেছে এমন লোক। যেমন, 'মেরু মহাতঙ্ক' উৎসর্গ করেছিলেন 'রবার্ট স্কটের স্মৃতির উদ্দেশে'। 'গোরিলার গোগ্রাস' 'ডেভিড লিভিংস্টোনের স্মৃতির উদ্দেশে'। 'আণবিক দানব' (যেটা ফেলুদার মতে ম্যাক্সিমাম গাঁজা) 'আইনস্টাইনের স্মৃতির উদ্দেশে'। শেষটায় 'হিমালয় হৃৎকম্প' উৎসর্গ করতে গিয়ে লিখে বসলেন, 'শেরপা শিরোমণি তেনজিং নোরকের স্মৃতির উদ্দেশে'।

ফেলুদা তো ফায়ার! বললেন, 'আপনি জলজ্যান্ত লোকটাকে মেরে ফেলে দিলেন?'

লালমোহনবাবু আমতা আমতা করে বললেন, 'ওরা তো কনস্ট্যান্ট পাহাড়ে চড়ছে — অনেক দিন কাগজে নাম টাম দেখিনি তাই ভাবলুম পা-টা হড়কে গিয়ে বোধহয় ।'

দ্বিতীয় সংস্করণে অবিশ্যি উৎসর্গটা শুধরে দেওয়া হয়েছিল।

'ছিন্নমস্তার অভিশাপ'-এ লালমোহনবাবু বললেন, 'আপনি মশাই একেবারে ইন্‌কগ্নিটো হয়ে থাকুন, গোয়েন্দা জানলে আপনাকে নির্ঘাৎ ওই বাঘ সন্ধানের কাজে লাগিয়ে দেবে।'

ইন্‌কগ্নিটো অবিশ্যি ইনকগনিটোর জটায়ু সংস্করণ।

'রিপু বোঝেন?' জিজ্ঞেস করলেন ফেলুদা।

'মানে ছেঁড়া কাপড় সেলাই টেলাই করা বলছেন?'

'আপনি ফারসী-সংস্কৃত গুলিয়ে ফেলছেন, লালমোহনবাবু। আপনি যেটা বলছেন সেটা হল রিফু। আমি বলছি রিপু।'

'ওহো — ষড়রিপু? মানে শত্রু?'

'শত্রু। এবারে মানুষের এই ছটি শত্রুর নাম করুন তো।'

'ভেরি ইজি। কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ সাহচর্য।'

'হল না। অর্ডারে ভুল। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ সাহচর্য।'

এত ভুল যিনি করেন, সেই জটায়ু পাঠকের হৃদয়-জয়-করা লেখক। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কলমের জোরটা আসে বুদ্ধির জোর থেকে। ফেলুদার কার্ডটা হাতে নিয়ে যখন দেখলেন তাতে লেখা প্রদোষ সি মিটার, তিনি বললেন, 'কী অদ্ভুত নাম।'

'অদ্ভুত?'

'অদ্ভুত নয়। দেখুন না কেমন মিলে যাচ্ছে। প্রদোষ — প্র হচ্ছে প্রফেসন্যাল, দোষ হচ্ছে ক্রাইম, আর সি হচ্ছে টু সি — অর্থাৎ দেখা, অর্থাৎ ইনভেস্টিগেট অর্থাৎ প্রদোষ সি ইজ ইকুয়াল টু প্রফেসন্যাল ক্রাইম ইনভেস্টিগেটর।'

'নেপোলিয়নের চিঠি' গল্পে লালমোহনবাবু বলেছেন ইস্কুলে থাকতে ওর হিরো নাকি ছিল নেপোলিয়ন 'গ্রেট ম্যান, বোনাপার্টি'। কিন্তু গল্পের শেষে ফেলুদাকে তাঁর অতলস্পর্শী চিন্তাশক্তির জন্য তিনি একটি অনারারি টাইটেলে ভূষিত করেন। কী সেই টাইটেল? এ বি সি ডি।

'এ বি সি ডি?'

'এশিয়াজ বেস্ট ক্রাইম ডিটেক্টর।'

লেখাপড়ার সঙ্গে তাঁর ভালোরকম যোগ আছে। 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ' এর শুরুতেই বলছেন, 'রামমোহন রায়ের নাতির সার্কাস ছিল সেটা জানতেন?'

সার্কাস নিয়ে একটা রহস্য উপন্যাস লিখবেন, তাই ফেলুদার পরামর্শ অনুযায়ী বিষয়টা নিয়ে পড়াশোনা করছেন। হাজারিবাগ যাবার পথে তোপ্‌সে ওঁর কাছে সার্কাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য জেনে নিয়েছে। কে জানত আজ থেকে একশো বছর আগে বাঙালির সার্কাস ভারতবর্ষে এত নাম কিনেছিল? সবচেয়ে বিখ্যাত প্রফেসর বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস। এই সার্কাসে নাকি বাঙালি মেয়েরাও খেলা দেখাত। এমনকি বাঘের খেলাও!

ওঁর নতুন বইয়ের নাম 'ভ্যানকুভারের ভ্যাম্পায়ার'-এ ফেলুদার আপত্তি ছিল। ফেলুদা বলেছিলেন, ভ্যানকুভার একটা পেল্লায় আধুনিক শহর, ওখানে ভ্যাম্পায়ার থাকতেই পারে না। তাতে লালমোহনবাবু বললেন, হর্নিম্যানের জিওগ্রাফির বই তন্নতন্ন করে ঘেঁটে ওঁর মনে হয়েছে ওটাই বেস্ট নাম।

আর সাহস? যথেষ্ট সাহস আছে জটায়ুর। কাল

রাত্রে বাঘের ডাক শুনেও, একলা শুতে তিনি ভয় পান না। শুধু নিজের তিন সেলের টর্চটার বদলে, ফেলুদার পাঁচ সেলের টর্চটা নিয়ে নিজের ঘরে চলে যান।

'জয়বাবা ফেলুনাথ'-এ মগনলাল মেঘরাজের বাড়িতে অর্জুনের নাইফ থ্রোইং-এর সামনে যাবার আগে যদিও নার্ভাস হয়ে লালমোহনবাবু সরবৎকে 'বৎসর' বলে ফেলেছিলেন, তবু সেখানে এগিয়ে যাবার সাহস ক'টা লোকের থাকে? ওঁর হাঁটুতে হাঁটু লেগে খট্‌খট্ শব্দ হলেও, উনি বলেছিলেন, বেঁচে থাকলে প্লটের আর চিন্তা নেই। নাইফ থ্রোইং-এর শব্দ শুনেই তোপ্‌সের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। একটা একটা করে ছুরি তুলে নিচ্ছে অর্জুনের হাত, আর তার পরেই সে ছুরি ঘ্যাচাং শব্দ করে তক্তার কাঠ ভেদ করে ঢুকছে, যে তক্তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন লালমোহনবাবু।

রুকুর বইয়ের তাকে ছিল 'রক্তহীরক রহস্য'— জটায়ুর লেখা। তাতে আছে হিরো একটা হীরে লুকিয়ে রাখছে হাঁ করা এক কুমিরের স্ট্যাচুর মুখের মধ্যে, ভিলেন যাতে না-পায়। লালমোহনবাবু বললেন, 'ভাবতে পারেন, আমারই লেখা বই আর আমিই কিনা ফেল মেরে গেলুম। আর ফেলু মিত্তির হয়ে গেলেন হিরো।'

ফেলুদা উত্তর দিলেন, 'আপনি ভুল করছেন লালমোহনবাবু। তার চেয়ে বরং বলুন আপনি আপনার কলমের জোরে এমন একটি রহস্য ফেঁদেছেন যে বাস্তবে তার সামনে পড়ে ফেলু মিত্তিরের গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দেবার উপক্রম হয়েছিল। কাজেই আপনিই বা হিরো কম কিসে।'

এই গুণী মানুষটি, এই পরম বন্ধুটি অন্যের গুণের কদর করতে জানেন। যখন তখন তাঁর সবুজ অ্যামবাসাডারে ফেলুদা তোপসেকে নিয়ে যেখানে সেখানে বেরিয়ে পড়েছেন। 'গোঁসাইপুর সরগরম' গল্পে ফেলুদাকে তিনি বলেছেন, 'কী করে আপনার মাথায় এত আসে জানি না। আপনি থাকতে সংবর্ধনাটা আমাকে দেওয়ার কোনো মানেই হয় না।'

এই যে জটায়ুর ভুল নিয়ে লিখতে গিয়ে, ওঁর সম্পর্কে আরো অন্য কিছু কথাও বলে ফেললাম, এটাও কি কোনো ভুল করলাম? কে জানে!

ফেলুদা ওঁর নাম নিয়ে একটা হেঁয়ালি বানিয়েছিল, 'রক্তবরণ মুগ্ধকরণ, নদী পাশে যাহা বিঁধিলে মরণ।'

হেঁয়ালি না, আমরা বরং একটা খেয়ালী বানাই—'রক্তবরণ মুগ্ধকরণ হাস্যমুখে ভ্রান্তিবরণ!'

মাদ্রাজে হোটেলের লবির বইয়ের দোকানে জটায়ু

ফেলুদা

জ্যোতির্ময় দালাল

গ্রাহক নং ৩০৮১। বয়স ১৬ বছর

অপরাধী পায় না খুঁজে
পলায়নের পথ,
সাফল্যেরই শীর্ষে আসীন
ফেলুর বিজয়রথ!

আগাগোড়াই ফেলুর পাশে
যাচ্ছে দেখা যাকে
নামখানি যার পালটে, ফেলু
'তোপ্‌সে' বলে ডাকে।

ফেলুর বন্ধু লালমোহন
ঔপন্যাসিক মস্ত
থোড়, বড়ি আর খাড়া লেখায়
সদাই সিদ্ধহস্ত!

আমার ফেলুদা

দিবজ্যোতি চৌধুরী

গ্রাহক নং ১৬৮৮। বয়স ১২ বছর

বুদ্ধিতে তার জুড়ি মেলা ভার
মানেনি জীবনে কোনদিনও হার
জানি আমি তার শত্রু হাজার,
বুদ্ধির প্যাঁচে হারে বারবার
এমন ক্ষমতা আছে বলো কার?

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য
শত্রুরা তার দুগ্ধপোষ্য।

মহা দুশমন মগনলাল
তেড়ে আসে বারে বারে,
ফেলুদার কাছে বুদ্ধির প্যাঁচে
বারে বারে সেই হারে।

ফেলুদার সঙ্গে কিছুক্ষণ

শোভনীতা অধিকারী

গ্রাহক নং ২১১২। বয়স ১৫ বছর

'ব্যাস্ সব ঠিক আছে। আর হ্যাঁ। রুণা কোথায়? এইতো এখানে ছিল।'

'এই যে জ্যেঠু এখানে'— বলেই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলাম ফ্লোরের দিকে। জ্যেঠু আমাকে একধারে নিয়ে গিয়ে বসলেন। হাতে স্ক্রিপ্ট। ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিলেন আমার রোলটা। বলে দিলেন কখন কী করতে হবে। আর এটাও বললেন যে; আমার খুব একটা বড় পার্ট নেই। দুদিনেই হয়ে যাবে। আজই তার প্রথম দিন। আজ যে শটটা নেবেন, সেটা হলো আমার সঙ্গে ফেলুদার প্রথম দেখা হওয়ার দিন। বৈঠকখানায় ফেলুদা বসে আছেন। লাজুকমুখে আমি ঢুকব। ফেলুদা আমায় কাছে ডাকবেন। তারপর কিছু কথাবার্তা এবং তারপরেই কাট।

'সবই তো বুঝলাম কিন্তু ফেলুদা কোথায়?' জিজ্ঞাসা করলাম জ্যেঠুকে। উনি মুচকি হেসে বললেন, 'উনি ওদিকে বসে আছেন। গেলেই দেখতে পাবে।' তারপর উনি আমাকে ওখানে বসে স্ক্রিপ্টটা দেখতে বলে চলে গেলেন। আর বললেন একটু পরেই শুটিং শুরু হবে। আমি যেন কোথাও না যাই।

আমার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল ফেলুদাকে দেখার জন্য, তাকে কি আদৌ গল্পের ফেলু মিত্তিরের মতো দেখতে? বোধহয় নয়। গল্পের ছবিতে দেখা ফেলুদার চেহারা আমার চোখে ভাসছে। লম্বা শরীর, সুঠাম স্বাস্থ্য আর চোখে মুখে একটা ভীষণ বুদ্ধিদীপ্ত ছাপ। ঠিক এরকম দেখতে লোক কি জ্যেঠু পেয়েছেন? হতেই পারেনা। সত্যি গল্পের সঙ্গে বাস্তবের কত তফাৎ। হাতে আঁকা ফেলুদাকে দেখে মনে হয় ফেলুদার ঠিক এরকমই হওয়া উচিত। গল্পে উনি যা যা করেন বা যেরকম জটিল রহস্য সমাধান করেন, তা করতে ঠিক এরকমই চেহারা এবং বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দরকার, যেটা পরিষ্কার ফুটে ওঠে গল্পের ছবিতে।

'রুণা এদিকে তাড়াতাড়ি'— এইরে, জ্যেঠু ডাকছে, আমি ছুট লাগালাম। গিয়ে দেখি একটা জায়গায় সবাই বসে আছে। বোধহয় এক্ষুণি শট্ নেওয়া শুরু হবে। যারা বসে আছে প্রায় কাউকেই চিনি না একমাত্র জ্যেঠুকে ছাড়া। সবাই নিজেদের মধ্যে কথায় ব্যস্ত। ওমা, ওটা কে!! উনিও তো আমার ভীষণ ভীষণ পরিচিত। কত দেখেছি ওঁকে বইয়ের পাতায়। ঠিক বই থেকে উঠে আসা ফেলুদা! অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। একেবারে নিখুঁত চেহারা। এমনকি চুলের ভাঁজটিও একরকম। ওঁর সঙ্গে আমি কথা বলব, অভিনয় করব, ভাবতেই রোমাঞ্চ লাগছে।

এমন সময় পিছন থেকে জ্যেঠু আস্তে করে বললেন— কী, ফেলুদাকে পছন্দ হয়েছে? আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, 'খু-উ-ব'।

'তাহলে এবার ওদিকে চল। তোমার কাজটা হয়ে যাক।' জ্যেঠুর সঙ্গে গেলাম ওধারে। সেখানে একটা ঘর সাজানো হয়েছে। ফেলুদা, তোপসে ইত্যাদিরা ইতিমধ্যে সেখানে সোফায় গিয়ে বসেছেন। আমাকে জ্যেঠু দাঁড় করিয়ে দিলেন পর্দার পিছনে। তারপর ওদিকে চলে গিয়ে বললেন, 'স্টার্ট সাউণ্ড। অ্যাকশন।' আমি ঢুকে পড়লাম পর্দা ঠেলে। গিয়ে দাঁড়ালাম ফেলুদার চেয়ারের পাশে। ফেলুদা বললেন—

'তোমার নাম কী?'

'রুণা।'

'আমি কে জানো?'

'হ্যাঁ। ফেলুদা।'

'আর ইনি?'

'তোপ্সে। আচ্ছা তোপ্সে প্রথমে বলত আপনি ওর মাসতুতো দাদা। এখন বলে খুড়তুতো। ব্যাপারটা কী?'

জোরে হেসে উঠলেন ফেলুদা।

এরপর জ্যেঠুর 'কাট' বলার কথা, কারণ দৃশ্যটি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু কোথায় কী? জ্যেঠু তো 'কাট' বললেন না। উল্টে ফেলুদা হাসি থামিয়ে আমায়

পর্দা ঠেলে রুণা ঘরে ঢুকছে।
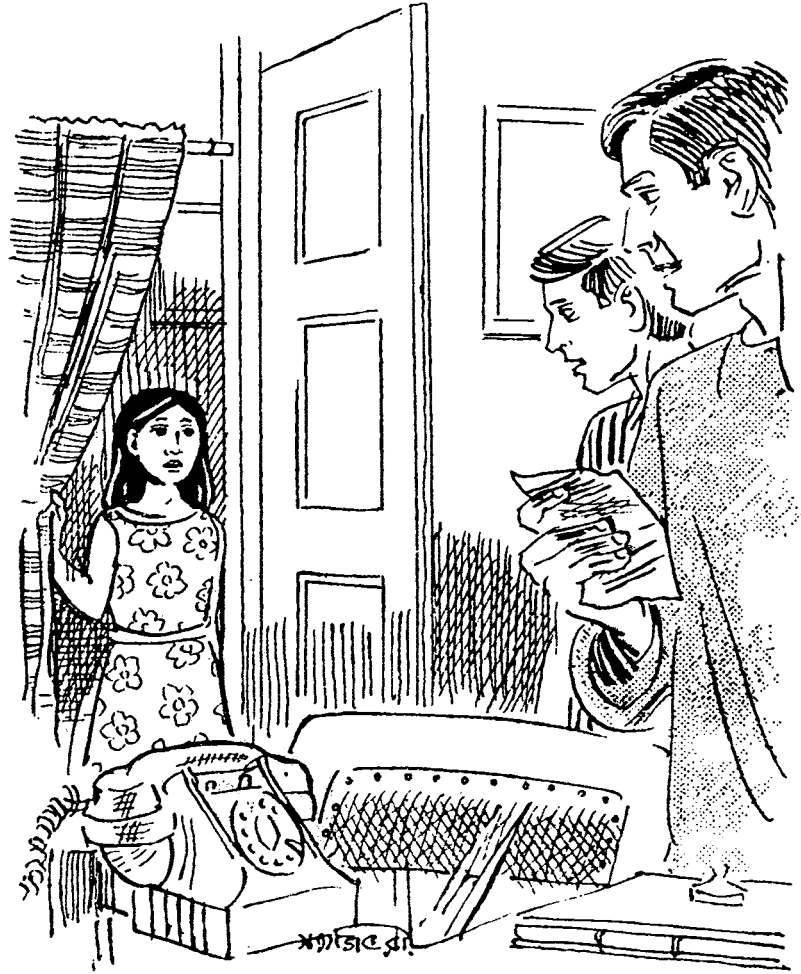
বললেন, 'তুমি তো ভীষণ ইনটেলিজেন্ট মেয়ে। এই সূক্ষ্ম ভুলটা ধরতে পেরেছ। তোমাকে আমার পরে কাজে লাগবে।'

ব্যাপারটা কী হল? দৃশ্য তো শেষ হবার কথা। আর এই ডায়লগ তো আদৌ স্ক্রিপ্টে নেই। তবে কি আমায় না জানিয়ে জ্যেঠু স্ক্রিপ্ট চেঞ্জ করলেন? কিন্তু জ্যেঠুই বা কোথায়? ওমা, জ্যেঠু তো আগের মতো ক্যামেরায় চোখ লাগিয়েই রয়েছেন। তবে কি শট এখনো চলছে? আর আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সেটা ভেস্তে দিচ্ছি?

মুহূর্তের মধ্যে এতকিছু ভেবে নিয়ে নিজের মন থেকে ডায়লগ তৈরি করে বলে ফেললাম ফেলুদাকে—

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি রাজি তো?'

'অবশ্যই। তবে কাজটা কী যদি বলেন, তবে একটু সুবিধা হত।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। সে তো বলতেই হবে।'

হঠাৎ কোত্থেকে যেন জ্যেঠু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কাট'। আর তারপরেই এগিয়ে এসে আমার হাতটা ধরে ভীষণভাবে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন 'ভীষণ ভাল করেছ। আমি তোমাকে জাস্ট পরীক্ষা করছিলাম। তাই আমি 'কাট' বলিনি। দেখছিলাম ক্যামেরার সামনে তোমার নার্ভ কতটা শক্ত থাকে। যাই হোক এখন তুমি সসম্মানে উত্তীর্ণ। এখন তোমায় আমি আসল স্ক্রিপ্টটা

দেব আর তুমি সেটা দেখে মুখস্থ করবে। কেমন?'

আর জ্যেঠুর সেই ভীষণ ঝাঁকুনি খেয়েই আমার ঘুমটা গেল ভেঙে। ঝাঁকুনিটা তো অন্য কেউ দিচ্ছে না। দিচ্ছে স্বয়ং আমার মা। ব্যাপারটা কী হল? এতো শুটিং-এর ফ্লোর নয়। বিছানা! তবে কি এতক্ষণ যা হল সব স্বপ্ন?

'অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্যে'র-এর শুটিং হচ্ছে। তাও আবার মানিক জ্যেঠুর পরিচালনায়। আমি তাতে রুণার পার্ট করছি। আর ফেলুদা!! তার সেই জীবন্ত মুখটা তো এখনো আমার চোখে ভাসছে। এ সব কি স্বপ্নেও সম্ভব? অবশ্য আগে আমার প্রায়ই মনে হতো ফেলুদার কোনও গল্পে আমার বয়সী কোনও ছোট মেয়ে নেই। তাই একটা ছোট্ট দুঃখ ছিল। কিন্তু কিছুদিন আগেই 'অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য' পড়ে আমার মনটা খুশিতে ভরে গিয়েছিল, কারণ তার একটা চরিত্র রুণা তো আমারই বয়সী। আর তখনই আমার খুব ইচ্ছে করছিল যদি গল্পটাকে নিয়ে ফিল্ম করা হয়, তবে আমিই যেন রুণার চরিত্রে মনোনীত হই। কারণ ফেলুদার সঙ্গে অভিনয় করার একটা দারুণ ইচ্ছা আমার মনে আগাগোড়াই ছিল। আমার সেই সুপ্ত ইচ্ছাটা তাহলে এতদিনে পূর্ণ হল। হলোই বা স্বপ্নে। তবুও তো...

ঘুম ভাঙা চোখে বিছানায় শুয়ে এসব ভাবছি, এমন সময় মা আবার বলল, 'বলিহারি ঘুম বটে। ডেকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না। দ্যাখ— তোর নামে 'সন্দেশ' থেকে চিঠি এসেছে। কী লিখেছে পড়ে দ্যাখ।'

ফেলুদা

সুমিত সুরাই

গ্রাহক নং ৩০৮১। বয়স ১৪ বছর

বাঙালি গোয়েন্দা নাম তার ফেলুদা
কর্মে সে অতিশয় দক্ষ।
কাজ করে ঠিকঠাক তাই এত হাঁকডাক
বুদ্ধিও তার অতি সূক্ষ্ম।
সহকারী দুই তার নাম শুনি বারবার
তারা হল জটায়ু ও তোপ্‌সে,
শুনে জটায়ুর কথা ভুলে সব জটিলতা
সবাই যে হেসে ফেলে আপ্‌সে।
এই হল ফেলুদাদা গোয়েন্দা মস্ত
কর্মে সে সুনিপুণ একেবারে চোস্ত।

নিছক গোয়েন্দা গল্প নয়

অনিমিখ পাত্র

গ্রাহক নং ২২০০। বয়স ১২ বছর

সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার প্রথম গল্প *ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি*। ফেলুদাকে পুরোপুরি পরিণত গোয়েন্দা রূপে আমরা দেখতে পাই *বাদশাহী আংটি*-তে। *বাদশাহী আংটি*-তে সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে গণেশ গুহ ও বনবিহারীবাবুকে কাবু করা, *গ্যাংটকে গণ্ডগোল*-এ শেষ পর্যন্ত জোঁকের হাতে অপরাধী শশধর বোসের নাকাল হওয়া, ইত্যাদি ফেলুদার গল্পকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। *সোনার কেল্লা* থেকে লালমোহনবাবু ওরফে রহস্য ঔপন্যাসিক জটায়ু ফেলুদার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রহস্যের সঙ্গে সরসতা বৃদ্ধি করেছেন। *রয়েল বেঙ্গল রহস্য*-তে বললেন, 'তড়িৎবাবু শেষ পর্যন্ত তড়িৎ পৃষ্ঠ হঁয়েই...'। *ছিন্নমস্তার অভিশাপ*-এ জল-মাটি-আকাশ খেলতে গিয়ে একটি আকাশের প্রাণীর নাম লালমোহনবাবু বলেছিলেন—'বেঙুর', অর্থাৎ ব্যাঙ, হাঙর ও বেলুনের সংমিশ্রণ। *রবার্টসনের রুবি*-তে বীরভূমের টেরাকোটা সম্বন্ধে জটায়ুর উক্তি—'ট্যারাকোঠা? অর্থাৎ ব্যাঁকা বাড়ী' ইত্যাদি ফেলুদার গল্পের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছে। ফেলুদার অ্যাড্‌ভেঞ্চার শুধুমাত্র রহস্যকাহিনী নয়; ফেলুদার মধ্যেও সরসতা আমরা দেখতে পাই *হত্যাপুরী*-তে, জটায়ুকে নিয়ে ফেলুদার লিমেরিক—

'বুঝে দেখ জটায়ুর কলমের জোর
রহস্য কাহিনীর ঘুরে গেছে মোড়
থোড় বড়ি খাড়া
লিখে তাড়াতাড়া
এইবারে লিখেছেন খাড়া বড়ি থোড়।'

অনেক গল্পেই রহস্যভেদের জন্য ফেলুদাকে বিভিন্ন হেঁয়ালি বা ধাঁধার সমাধান করতে হয়েছে। যেমন *সোনার কেল্লা*-য় মন্দার বোসের ঘর থেকে পাওয়া একটি সাংকেতিক বার্তার সমাধান করেন ফেলুদা:

IP 1625+U
U—M

অর্থাৎ— আমি পোকরান পৌঁছাচ্ছি বিকেল চারটে পঁচিশে; তুমি আমার সঙ্গে এসে যোগ দিও, মিত্তিরকে কাটিয়ে। আবার *রয়েল বেঙ্গল রহস্য*-তে তো ফেলুদা হেঁয়ালির সমাধান করে একটি আস্ত বাঘছাল উপহার পান। হেঁয়ালিটি হল—

'মুড়ো হয় বুড়ো গাছ
হাত গোন ভাত পাঁচ
দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে
ফাল্গুন তাল জোড়
তার মাঝে ভুঁই ফোঁড়
সন্ধানে ধন্দায় নবাবে।'

ছিন্নমস্তার অভিশাপ-এ হেঁয়ালির ছড়াছড়ি, 'কি খুঁজছি কি পাচ্ছি না'। এখানে কি = Key, অর্থাৎ 'চাবি খুঁজছি চাবি পাচ্ছি না' ইত্যাদি অসংখ্য হেঁয়ালির সাহায্যে ফেলুদা রহস্যের সমাধান করেন। আবার *বাদশাহী আংটি*-তে অপরাধী বনবিহারী সরকারের মুখে আমরা শুনতে পাই—'Steal মানে হরণ, Horn মানে শিং, Sing মানে গান, Gun মানে কামান, Come on মানে আইস, I saw মানে আমি দেখিয়াছিলাম।'

যেখানে অপরাধী ও গোয়েন্দার বুদ্ধি প্রায় সমান, সেখানে রহস্য দারুণ জমে ওঠে। *যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে*, *বাদশাহী আংটি* ইত্যাদিতে ফেলুদা ও ক্রিমিনালের বুদ্ধির প্যাঁচের লড়াই রীতিমত উপভোগ্য। অনেক সময় রহস্যভেদ করতে গিয়ে ফেলুদাকেও ক্রিমিনালের মতো কাজ করতে হয়েছে, যেমন *বাদশাহী আংটি*-তে ফেলুদা নিজে প্রথমেই আংটি সরিয়ে পিয়ারীলালের

হত্যাকারীকে ধরেন।

আবার *বাক্স-রহস্য*-তে ধমীজার বাক্স ফেরৎ দিতে গিয়ে হাত সাফাই করে অন্য একজনের ব্যাগের সঙ্গে বদলাবদলি করেন ফেলুদা।

রহস্যের পটভূমি লক্ষ্ণৌ, দার্জিলিং, লছমনঝুলা, ইলোরা, কাঠমাণ্ডু, পুরী, শ্রীনগর— বিভিন্ন স্থানে ফেলুদা গোয়েন্দাগিরিতে জড়িয়ে পড়েছেন, আর এইসব দর্শনীয় স্থানের নিখুঁত চিত্র ধরা পড়েছে কিশোর তপেশের মুগ্ধ দৃষ্টিতে।

তাই ফেলুদার গল্পগুলি শুধুমাত্র গতানুগতিক গোয়েন্দা গল্প নয়, তাতে ভরপুর জ্ঞানের খোরাক, সরসতা, হাসি আর বুদ্ধির খেলা, যাতে পাঠকও অংশীদার।

আমার চোখে ফেলুদা

সঞ্চিতা বসু

গ্রাহক নং ১৪৯১। বয়স ১৪ বছর

ভিনি-ভিডি-ভিসি অর্থাৎ 'এলাম, দেখলাম ও জয় করলাম'— এক কথায় প্রথম আবির্ভাবেই বাজিমাত করলেন সত্যজিৎ রায় ফেলুদাকে বাঙালী পাঠকের কাছে এনে। আমরা অর্থাৎ ক্ষুদে পাঠকরা— ফেলুদা বলতে অজ্ঞান, কারণ ফেলুদার যেমন বুদ্ধি, তেমনি পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, তেমনি সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা এবং তড়িৎ-সিদ্ধান্ত।

ফেলুদার আবির্ভাবের আগে আমরা বাংলা গল্পের মধ্যে যে সব গোয়েন্দার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নীহাররঞ্জন গুপ্তের কিরীটী-সুব্রত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোমকেশ আর হেমেন্দ্র কুমার রায়ের জয়ন্ত-মাণিক, এবং সঙ্গে হাইফেনের মতো পেটমোটা দারোগা সুন্দরবাবুর প্রলঙ্কর 'হুম' আওয়াজ। কিন্তু কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছিল— সব হয়েও হচ্ছিল না— ভাল লাগলেও মন ঠিক পুরোপুরি ভরছিল না।

সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সেই অভাবটা পূরণ করলেন। শুধু মনই ভরল না প্রাণও জড়িয়ে গেল। এতদিনের এতজনের মনোস্কামনা পূর্ণ করলেন পরিপূর্ণভাবে ফেলুদাকে আমাদের সামনে এনে। সেই সঙ্গে বাড়তি উপহার প্রখ্যাত রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক 'জটায়ু' ওরফে লালমোহন গ্যাঙ্গুলি আর খুদে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট তোপ্‌সে।

ফেলুদা একজন রহস্যভেদী— সেই কারণেই তাঁর কিছু বিশেষ গুণ আছে। প্রখর দৃষ্টিশক্তি, প্রবল বুদ্ধিমত্তা এবং রহস্যের জট খোলার জন্য তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি। তাঁর প্রতিটি রহস্যভেদের সাক্ষী হিসাবে থাকেন লালমোহনবাবু ও তোপ্‌সে। প্রত্যেক রহস্যভেদীরই কিছু না কিছু নেশা থাকে— ফেলুদারও নেশা হল সিগারেট খাওয়া এবং অবশ্যই সিগারেটটি চারমিনার।

রহস্যভেদ করার জন্য ফেলুদা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন— এবং তাঁর সঙ্গে আমরা উৎসুক শ্রোতারাও ঘুরেছি। তাঁর রহস্যভেদের বিভিন্ন কাহিনী পড়তে পড়তে ফেলুদা আমাদের অনেক কাছের মানুষ হয়ে গেছেন। আমরা অনেক নতুন জিনিস শিখেছি যেমন 'সোনার কেল্লা'য় জাতিস্মর মুকুলের কথা। ফেলুদাকে জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া বলে মনে হয়। আপাতদৃষ্টিতে ফেলুদা গম্ভীর হলেও তিনি অবশ্যই রসিক। গাম্ভীর্যের পর্দা যখন মাঝে মাঝে সরে যায় তখন আমরা তাঁকে অন্য রূপে পাই। ফেলুদার পাশে পাশে আমাদের সর্বদা হাস্যরস পরিবেশন করে যান লালমোহনবাবু— যিনি না থাকলে ফেলুদার গল্প জমত না।

ফেলুদা সত্যজিৎ রায়ের এক অপূর্ব সৃষ্টি। গোয়েন্দা জগতের অবিস্মরণীয় নাম। তিনি যা লিখে গেছেন ফেলুদাকে নিয়ে তা বাঙালী পাঠকের মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল ও অমর হয়ে থাকবে।

টার্গেট ঃ সোনার কেল্লা

দেবেশী চক্রবর্তী

গ্রাহক সংখ্যা ৩৩৫৯। বয়স ১৬ বছর
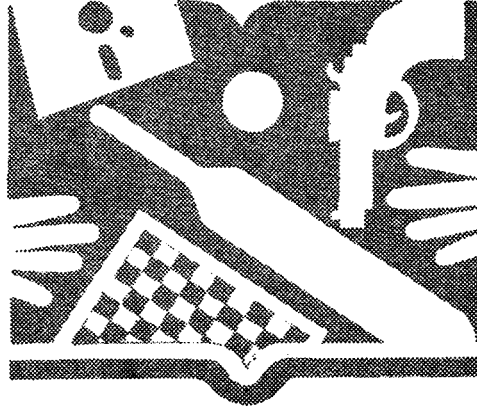
'গোরস্থানে সাবধান' আর জোব চার্নকের আসল ঘটনা

অ নি রু দ্ধ ধ র

ভাগ্যিস ঠিক সেই সময়েই কলকাতার প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি ফেলু মিত্তিরের গভীর অনুসন্ধিৎসা জন্মেছিল! নইলে 'গোরস্থানে সাবধান' তোপ্‌সের পক্ষে কোনওদিন লেখা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ!

ব্যাপারটা একটু খুলেই বলা যাক। তোপ্‌সে লিখছে: 'এখানে বলে রাখি ফেলুদার লেটেস্ট নেশা হল পুরোন কলকাতা। ফ্যান্সি লেনে একটা খুনের তদন্ত করতে গিয়ে ও যখন জানল যে ফ্যান্সি হচ্ছে আসলে ফাঁসি, আর ওই অঞ্চলেই দুশো বছর আগে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়েছিল, তখন থেকেই নেশাটা ধরে। গত তিনমাসে ও এই নিয়ে যে কত বই পড়েছে. ম্যাপ দেখেছে, ছবি দেখেছে তার ইয়ত্তা নেই। অবশ্য এই সুযোগে আমারও অনেক কিছু জানা হয়ে যাচ্ছে, আর তার বেশির ভাগটা হয়েছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে দুটো দুপুর কাটিয়ে।'

আর ঠিক সেই সময়েই সাউথ পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানে ঘটল এক দুর্ঘটনা। ঝড়ে সেমেট্রির একটা আম গাছের ডাল ভেঙে নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নামে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক গুরুতরভাবে জখম হন। ঘটনাচক্রে পরের দিনই তোপ্‌সে আর লালমোহনবাবুকে নিয়ে ফেলুদা সেই অকুস্থলে আবিষ্কার করে ফেলল সদ্য খোঁড়া এক গর্ত। গর্ত দেখেই ফেলুদা বলল, 'কেমন যেন খট্‌কা লাগছিল। ভাঙল আমগাছ, অথচ আমপাতার সঙ্গে জাম-কাঁঠাল কী করছে তাই ভাবছিলাম।'

জাম-কাঁঠাল পাতা দিয়ে যে-খটকার শুরু, সেই সন্দেহ থেকেই ধীরে ধীরে জমে উঠল এক জমজমাট রহস্য, অদ্ভুতুড়ে ক্রাইম। ফেলুদা এই ক্রাইম আর রহস্যের শেষ পর্যন্ত কিনারা কিন্তু করতে পারল তার পুরোন কলকাতার লেটেস্ট নেশার দৌলতে।

'গোরস্থানে সাবধান' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৭ সালে। সেই কাহিনী পড়েই আমরা প্রথম সঠিক উচ্চারণ করতে শিখেছিলাম আমাদের এই কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা ভদ্রলোকের নাম। জোব চার্নক। তার আগে, আমরা প্রায় সব্বাই-ই লালমোহনবাবুর মতো বলতাম জব চার্নক। ফেলুদাই আমাদের শেখালেন, 'জব হল কাজ, চাকরি, আর জোব হল নাম।'

গল্পের শুরুতেই প্রায় তিনশো বছর আগেকার এক বাস্তব চরিত্রের মুখোমুখি হয়ে পড়ি আমরা। যে-সে চরিত্র নয়, খোদ কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা। এই জোব চার্নকেরই সমাধি রয়েছে সেন্ট জন্‌স চার্চের কমপাউন্ডে।

আজ কলকাতা যে-চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার মূলে রয়েছে এই একটি মানুষের ভাবনা, কল্পনা। ১৯১৪ সালে আর্নল্ড রাইট তাঁর 'আর্লি ইংলিশ অ্যাডভেঞ্চারস্ ইন দি ইস্ট' বইয়ে যা লিখেছেন, সেটা বাংলায় অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায় তা হল, 'ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে আর-কিছু না-করুক, প্রায় একটা জলাভূমি

থেকে কলকাতাকে সৃষ্টি করার মধ্যে প্রমাণিত হয় বিদেশী লোকজনকে সফলভাবে চালিত করার ব্যাপারে তারা কত বড় মাপের প্রতিভা ছিল।'

১৯০২ সালে জি. ডবলিউ. ফরেস্ট নামের আর-এক সাহেবের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিলেই বোঝা যাবে জোব চার্ণক কিসের থেকে কী বানিয়েছিলেন। ফরেস্ট লিখছেন:'রোববার, ২৪ শে আগস্ট দুপুরবেলা প্রিন্সেস স্টিমার সুতানুটি ঘাটে এসে ভিড়ল। এখন যদি কেউ কলকাতার ঘাটে এসে জাহাজ ভেড়ায়, তাহলে তার চোখে পড়বে নানা মাপের জাহাজ বিশাল নদীর বুকে ভেসে আছে। বড় বড় জাহাজ পাড়ে নোঙর করে রাখা আছে। তাদের উঁচু-উঁচু মাস্তুলে আকাশ ঢেকে আছে। আরও দূরে, সবুজ সমতল পেরিয়ে সিটি অফ প্যালেসেজ-এর সৌধ-সারি।'

ভাবা যায়! আজ থেকে ৯৩ বছর আগেই এই চেহারা! অথচ চার্নক সেই রোববার কী দেখলেন? চার্নক তাঁর ছোট্ট জাহাজ থেকে দেখলেন সম্পূর্ণ অন্য এক দৃশ্য। নদীর ঘাট ছাড়িয়ে জমিটা কিছুটা উপরে উঠে গেছে। তারও পরে সবুজ জলাভূমি, যার মধ্যে রয়েছে ম্যালেরিয়ার যাবতীয় উপাদান। দিন-রাত বৃষ্টি হয়েই চলেছে। বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য এক জায়গা।

সেন্ট জন্স চার্চের কম্পাউন্ডে জোব চার্নকের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে ফেলুদা তোপ্সেকে প্রায় এই কথাই শুনিয়েছে। ফেলুদা বলেছে, 'কিন্তু ভেবে দ্যাখ তোপ্সে একটা সাহেব মশা মাছি সাপ ব্যাঙ বন বাদাড়ে ভরা মাঠের এক প্রান্তে গঙ্গার ধারে বসে ভাবল এখানে সে কুঠির পত্তন করবে, আর দেখতে দেখতে বনবাদাড় সাফ হয়ে গিয়ে সেখানে দালান উঠল, রাস্তা হল, রাস্তার ধারে লাইন করে গ্যাসের বাতি বসল, সেই রাস্তায় ঘোড়া ছুটল। আর একশো বছর যেতে না যেতে গড়ে উঠল এমন একটা শহর যার নাম হয়ে গেল সিটি অফ প্যালেসেজ । এখন সে শহরের কী ছিরি হয়েছে সেটা কথা নয়, আমি বলছি ইতিহাসের কথা।'

এইভাবেই 'গোরস্থানে সাবধান' কাহিনীতে একেবারে কলকাতার গোড়াপত্তনের দিনগুলোর ইতিহাস উঠে এসেছে ফেলুদার মুখে। আর সেই ইতিহাস বলার সেরা জায়গা যে জোব চার্নকের সমাধিক্ষেত্র — এ-তো বলাই বাহুল্য।

ফেলুদার সঙ্গে থেকে-থেকে কলকাতা-এক্সপার্ট তোপ্সে একফাঁকে আরও একটা ইতিহাস জানিয়ে দিয়েছে আমাদের। সেটা হল কলকাতার স্থাপত্য-ইতিহাস। তোপ্সে জানিয়েছে, বি বি ডি বাগে দুশো বছরের পুরোন সেন্ট জন্স চার্চের কম্পাউন্ডে জোব চার্নকের সমাধিটি নাকি কলকাতার প্রথম ইঁটের বাড়ি। সম্ভবত হবে ইংরেজদের তৈরি কলকাতার প্রথম ইঁটের বাড়ি।

॥ ৩ ॥

জোব চার্নকের সমাধিটি তৈরি করেছিলেন তাঁরই জামাতা চার্লস আয়ার। ১৬৯৩ সালে। ঠিক এই মুহূর্তে কেউ যদি উৎসাহ নিয়ে এই সমাধিক্ষেত্রে আসো তাহলে একটি কালো মার্বেল-ফলকে লেখা ক'টি লাইন চোখে পড়বে।

D. O. M.
Jobus Charnock, Armiger
Anglus, et nup in hoc
regno Bengalensi dignissim, Anglorum
Agens. Mortalitatis suae exuvias
sub hoc marmore deposuit, ut
in spe beatae resurectionis ad
Christi judicis adventum obdormirent.
Qui postquam in solo non
Suo peregrinatus esset dice.
Reversus est domum suae aeter—
nitatis decimo die Januurii 1692.

এই ফলক-লেখা পড়তে পারাটাই দুঃসাধ্য। লালমোহনবাবুর মতোই আমাদের প্রত্যেকের অবস্থা। কিন্তু ফেলুদাই জানিয়ে দিয়েছে এই এপিটাফের অর্থ। লালমোহনবাবুর সঙ্গে ফেলুদার কথাবার্তা থেকেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

'...সমাধির গায়ে একটা মার্বেলের ফলকের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ভদ্রলোক বললেন, 'এ তো দেখছি জোবও নয় মশাই— জোবাস্। ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

'জোবুস হল জোবের ল্যাটিন সংস্করণ,' বলল ফেলুদা। 'পুরো লেখাটাই ল্যাটিনে সেটা বুঝতে পারছেন না?'

'ল্যাটিন-ফ্যাটিন জানিনা মশাই; ইংরিজী নয় এটা বুঝতেই পারছি। নামের উপর ডি.ও.এম. লেখা কেন?'

'ডি.ও.এম. হচ্ছে ডমিনুস অমনিউম ম্যাজিস্টের। অর্থাৎ 'ঈশ্বর সকলের কর্তা'। আর তার নিচে যে কথাগুলো রয়েছে তার একটার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। Marmore। মর্মর-সৌধ জানেন তো? সেই মর্মর আর এই মারমোরে একই জিনিস — মার্বল। আর আরো মজা হচ্ছে এই যে, মর্মর কথাটা সংস্কৃত নয়, ফারসী।...'

॥ ৪ ॥

এতদূর পড়ার পর নিশ্চয়ই মনে হতে পারে কেবলমাত্র জোব চার্নক নিয়ে এতটা লেখা কেন? 'গোরস্থানে সাবধান' কাহিনীতে প্রথম তিনপাতার পর আর এই ভদ্রলোক সম্পর্কে একটিও উচ্চবাচ্য নেই। আর তা-ছাড়া ফেলুদার পুরনো কলকাতা সম্পর্কে চর্চার কারণেই, কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নকের সমাধিটা তোপ্‌সে আর লালমোহনবাবুকে নিয়ে ফেলুদা দেখতে গিয়েছিল। এই কাহিনীর ক্রাইম বা রহস্য যা, তার সবকিছুই তো ঘটেছে সাউথ পার্ক স্ট্রিট সেমেট্রির মধ্যে।

ক্রাইমটা মনে আছে তো? কারা যেন টমাস গডউইন নামের এক সাহেবের কবরের পাশে গর্ত করে গিয়েছিল। এর বেশি অবিশ্যি ফেলুদা প্রথম দিন বুঝতে পারেনি। টমাস গডউইন সম্পর্কে ফেলুদা জানতে গিয়েছিল সিধুজ্যাঠার কাছে।

ফেলুদা সিধুজ্যাঠাকে বলল, 'সেই সমাধির পাশে খালের মতো গর্ত। মনে হয় কেউ খোঁড়ার কাজ শুরু করেছিল।'

সিধুজ্যাঠার চোখ ছানাবড়া।

'বল কি হে! গ্রেভ-ডিগিং? এতো ভারি গ্রেভ সংবাদ দিলে হে তুমি। এতো অবিশ্বাস্য। টাটকা লাশ হলে খুঁড়ে বার করে শব ব্যবচ্ছেদের জন্য বিক্রি করে পয়সা আসে জানি। কিন্তু দুশো বছরের পুরোন লাশের কয়েকটা হাড় গোড় ছাড়া আর কী পাওয়া যাবে বল! তার না আছে প্রত্নতাত্ত্বিক ভ্যালু, না আছে রিসেল ভ্যালু।...'

সিধুজ্যাঠা 'গ্রেভ-ডিগিং' ব্যাপারটাকে অবিশ্বাস্য বললেও, হুবহু ঠিক এই ঘটনা ঘটেছিল এই কলকাতা শহরেই। সে-ক্ষেত্রেও দুশো বছরের পুরোন এক মৃতদেহের কবর খোঁড়া হয়েছিল। সেই কবর কার জানো? এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নকের। পুরোন কলকাতা যার নেশা সেই ফেলুদা এ-ব্যাপারটাকে জানবে না এটা ভেবে নেওয়া ভুল। যদিও 'গোরস্থানে সাবধান' কাহিনীতে তোপ্‌সে কোথাও বলেনি — ফেলুদা চার্নকের গ্রেভ-ডিগিংয়ের ব্যাপারটা জানত, কিন্তু যে-সূত্র ধরে ফেলুদা গোরস্থনের রহস্য উন্মোচন করেছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় চার্নকের গ্রেভ-ডিগিংয়ের ব্যাপারটাকেই মাথায় রেখে ফেলুদা প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত এগিয়েছে এবং রহস্যের কিনারাও করেছে।

ফেলুদা কীভাবে ঐতিহাসিক এক গ্রেভ-ডিগিংকে মডেল করে এগিয়েছে সে-প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে, চার্নকের কবর খোঁড়ার ঘটনাটা সবিস্তারে জেনে যাওয়া যাক। কেননা তোপ্‌সে এই ঘটনার কিছুই জানায়নি। সম্ভবত ফেলুদা এ-বিষয়ে তোপ্‌সের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেনি বলেই।

মাঝরাতে ফেলুদার গোরস্থান অভিযান।

১৮৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে, 'প্রসিডিংস অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল'-এ প্রকাশিত হয় রেভারেন্ড এইচ. বি. হাইড-এর একটি লেখা। লেখাটির নাম 'নোট অন দ্য মওসোলিয়াম অফ জোব চার্নক অ্যান্ড দ্য বোনস রিসেন্টলি ডিস্‌কভারড উইদিন ইট।'

দীর্ঘ ছ পাতার লেখা । এই লেখার একটি জায়গায় চোখ আটকে যাবেই। '...One may certainly therefore claim it to be the oldest example of British masonry now existing in Calcutta. The original Fort William itself was not begun till 1696 and was 3 years in building...।'

তোপ্‌সে কী জানিয়েছিল মনে আছে? বি বি ডি বাগে দুশো বছরের পুরোন সেন্ট জন্‌স চার্চের কম্পাউন্ডে জোব চার্নকের সমাধিটি কলকাতার প্রথম ইঁটের বাড়ি।

রেভারেন্ড হাইড ছিলেন তখন সেন্ট জন্‌স চার্চের সঙ্গে যুক্ত। চার্নক সম্পর্কে বেশ কিছু গুজব তাঁর কানে এসেছিল। শোনা যাচ্ছিল, তিনি নাকি স্ত্রীর মৃত্যুর পর অধার্মিক হয়ে পড়েন, Christianরা যাকে বলে 'heathen'। চার্নক নাকি স্ত্রীর কবরের উপর প্রতি মৃত্যুবার্ষিকীতেই মোরগ বলি দিতে শুরু করেন। এ-ছাড়াও চার্নকের চরিত্রের নানা দোষ নিয়েও নানা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। সন্দেহ তৈরি হয় চার্লস আয়ার-এর তৈরি সমাধিটি আদৌ চার্নকের সমাধি কি না? শ্বশুরের ভাঙা ইমেজ জোড়া দেওয়ার কারণেই চার্লস আয়ার হয়তো এই ক্রিশ্চান সৌধটি তৈরি করেন।

১৮৯৩ সালের নভেম্বর মাসে 'ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক ওয়ার্কস' পুরো সৌধটি সংস্কারের কাজে হাত লাগান। বিশেষত সৌধটির মেঝের অবস্থা তখন ছিল খুবই খারাপ। রেভারেন্ড হাইড এই সুযোগটা কাজে লাগালেন।

তিনি লিখছেন '...নতুন মেঝে তৈরির আগেই সুযোগটা কাজে লাগানো মন্দ নয়। কেননা, সামান্য একটু খুঁড়লেই হয়তো আদৌ মেঝের তলায় কোনও ভল্টের মধ্যে চার্নকের কফিন রাখা আছে কিনা তা জানা যাবে। কথিত আছে চার্নক আর তাঁর স্ত্রী একই সঙ্গে রয়েছেন পাশাপাশি কফিনে। চেষ্টা করলেই এই কথার সত্যতা ধরা পড়ে যাবে। অথবা কফিন প্লেটের অংশ বা অন্য কিছু যদি পাওয়া যায়, তাহলে সেটা হিস্টরিকাল ইন্টারেস্টে সাহায্য করবে। প্রায় চার ফুটের মতো মাটি খুঁড়ে ফেলা

গেল, কিন্তু কোনও ভল্টের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া গেল না। যা পাওয়া গেল— মাটি মাখামাখি ইঁটের টুকরো। বোঝা গেল, এখানে আগে ছিল একটা ইঁটের তৈরি কবর, যার কিছুটা আগে থেকেই ভেঙে গিয়েছে। এটা ভেঙেছে সম্ভবত তখন, যখন শ্রীযুক্ত আয়ার তাঁর স্ত্রী ক্যাথরিনকে ১৬৯৬ সালে কবর দেন তার পিতারই পাশে।...'

কলকাতার প্রথম 'গ্রেভ-ডিগিং'-এর ঘটনাটা তাহলে ঘটেছিল ১৮৯৩ সালে। ২১শে নভেম্বর, সোমবার।

॥ ৫ ॥

'গোরস্থানে সাবধান'-এর গ্রেভ ডিগিং ঘটল ২৪শে জুন। পরের দিন অর্থাৎ ২৫শে জুন বিকেলে সাউথ পার্ক স্ট্রিট সেমেট্রিতে এসে পৌঁছল ফেলুদা। সঙ্গে তোপ্সে আর লালমোহনবাবু।

পার্ক স্ট্রিটের দক্ষিণ কোণে লোয়ার সার্কুলার রোডের ক্রসিংয়েই রয়েছে এই গ্রেট সেমেট্রি বা সাউথ পার্ক স্ট্রিট সেমেট্রি। কলকাতায় সাহেবদের প্রথমদিকের গোরস্থান ছিল সেন্ট জন্স চার্চের ভিতরে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই একটি 'সম্পূর্ণ' কবরখানার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখনই গড়ে তোলা হয় গ্রেট সেমেট্রি। এই সেমেট্রি চালু হয় ১৭৬৭ সালে। কিন্তু মাত্র ২৩ বছরেই এই গোরস্থানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৭৯০ সালে এটি বন্ধ হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবর দেওয়া বা সৌধ নির্মাণ চলে ১৮৩০ অবধি, কেননা আগে থেকেই এখানে অনেকে জায়গা কিনে রেখেছিলেন। কিন্তু কেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল গ্রেট সেমেট্রি? কারণ, স্থানাভাব। অর্থাৎ, কবর দেওয়ার মতো একটুও জায়গা আর ছিল না গ্রেট সেমেট্রিতে।

গ্রেট সেমেট্রির এই ইতিহাসের কথা ফেলুদাও শুনিয়েছে গোরস্থানে ঢোকবার আগেই।

'...গোরস্থানের গেটের সামনে যখন পৌঁছলাম তখন জটায়ুর দিকে চেয়ে দেখি তাঁর স্বাভাবিক ফূর্তি ভাবটা যেন একটু কম। ফেলুদা তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিতে ভদ্রলোক বললেন, 'একবার এক সাহেবকে কবর দিতে দেখেছিলুম — ফর্টিওয়ানে রাঁচিতে। কাঠের বাক্সটা গর্তে নামিয়ে যখন তার উপর চাবড়া-চাবড়া মাটি ফেলে না— সে এক বীভৎস শব্দ মশাই।'

'সে শব্দ এখানে শোনার কোন সম্ভাবনা নেই,' বলল ফেলুদা। এই গোরস্থানে গত সোয়া শো বছরে কোনো মৃতব্যক্তিকে সমাধিস্থ করা হয়নি।...'

ফেলুদার এই কথার সূত্র ধরেই, এই বিশেষ গোরস্থানের আরও অনেক তথ্য আমরা জেনে যাই। যেমন

(১) এখানে রয়েছে তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু একটা সমাধি। ওটাই হল পণ্ডিত উইলিয়াম জোন্স-এর সমাধি। ওর চেয়ে উঁচু সমাধি নাকি কলকাতায় আর নেই।

(২) সমাধির উপরে যে স্তম্ভ থাকে, সেগুলোকে ইংরিজিতে বলে 'ওবেলিস্ক'।

(৩) এই গোরস্থানে রয়েছে দু'-হাজারেরও বেশি সমাধি।

এই গোরস্থান যখন প্রথম চালু হয়, সেটা ১৭৬৭। তোপ্সে অবিশ্যি জানিয়েছে, 'সবচেয়ে আগের তারিখ যা এখন পর্যন্ত চোখে পড়েছে তা হল ২৮শে জুলাই ১৭৭৯, তার মানে ফরাসি বিপ্লবের বারো বছর আগে।'

এই গল্প যারা পড়েছে তারাই জানে, ফেলুদাও এখানে এসেছিল খবরের কাগজে এক বাঙালিবাবুর মাথায় গাছ পড়ার খবর পড়ে। সেই অকুস্থলে যাওয়ার তাড়া ছিল ফেলুদার। ফলে তাড়াহুড়োয় পথে যে-সব সমাধি পড়ে সে-দিকেই চোখ ছিল তোপ্সের। আর একটু খুঁজলেই অবিশ্যি তোপ্সের চোখে পড়ত সারা পিয়ার্সনের সমাধি। এই সমাধির মার্বল-পাথরে লেখা আছে ঃ

MRS SARAH PEARSON
Obit 8 Sept 1768 AET 19

অর্থাৎ, ১৭৬৮ সালের মাত্র ১৯ বছর বয়সে শ্রীমতী সারা পিয়ার্সন মারা যান, এবং এই জায়গায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। সাউথ পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানে এইটিই সবচেয়ে পুরনো সমাধি।

১৭৬৮-র কবর দেখতে না পেলেও, ১৭৭৯-এর

কবর ফেলুদারা দেখতে পেয়েছে বোঝাই যাচ্ছে। তখন কী রকম চেহারা ছিল এলাকাটার? এপাশে ওপাশে জঙ্গল, আর বাঁশবাগানের মাঝে জলাজমি। একটা উঁচু বাঁধের মতো রাস্তা এসে মিশেছিল এই জায়গায়। রাস্তার নাম ছিল বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোড। অনেক পরে স্যর এলাইজা ইম্পে এই রাস্তার পাশে একটি পার্ক তৈরি করেন, আর সেখানে পোষেন বেশ কয়েকটা হরিণ। সেই থেকেই রাস্তার নাম বদলে হয়ে যায় পার্ক স্ট্রিট। রাতের বেলায় কাউকে সমাধিস্থ করতে হলে মশাল জ্বালিয়ে কাজ সারতে হত। কফিন বহন করতেন মৃতের বন্ধু-বান্ধবরা। বন্দুকের আওয়াজ শুনলে বোঝা যেত সেনাবাহিনীর কাউকে কবর দেওয়া হল।

আগেই বলা হয়েছে, মাত্র ২৩ বছরেই গ্রেট সেমেট্রি বন্ধ করে দেওয়া হয় স্থানাভাবে। সেই সময়েই গড়ে ওঠে ১৮৪ নম্বর মল্লিকবাজার সেমেট্রি। গ্রেট সেমেট্রিতে জায়গা না পেয়ে পরবর্তী প্রজন্মের খ্রিস্টানদের সমাধিস্থ করা হত এই গোরস্থানেই। যে-কারণেই ফেলুদা সিধুজ্যাঠাকে জানায় টমাস গডউইনের তিন পুরুষ পর

শ্বেতপাথরের ভাঙা ফলক জুড়ে জুড়ে
ফেলুদা আর তোপ্‌সে সমাধি-লিপি উদ্ধার করছে।

অবধি তাদের কেউ না কেউ এ-দেশেই মারা গেছে সে খবর আমি জানি।'

'সে কী?' সিধুজ্যাঠা অবাক।

'আসলে আজই সকালে এখানে আসার আগে আমরা লোয়ার সার্কুলার রোডের গোরস্থানটা দেড় ঘন্টা ধরে দেখে এসেছি। এটা পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানের পরে তৈরি আর এখনো ব্যবহার হয়।'

তাহলে দেখা গেল, কাহিনীর শুরু থেকে তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত সেন্ট জন্‌স চার্চের প্রথম গোরস্থান থেকে শুরু করে সাউথ পার্ক স্ট্রিট সেমেট্রি এবং তারও পরের সার্কুলার রোডের (১৮৪ মল্লিকবাজার) সেমেট্রি, যা এখনও পর্যন্ত চালু — এই তিনটি সেমেট্রির বিবরণ ক্রমানুপর্যায়ে এসেছে — যার ফলে কলকাতার গোরস্থান বিবর্তনের একটা ঐতিহাসিক রূপরেখা স্পষ্টভাবে পাওয়া যাচ্ছে এই কাহিনী থেকে।

॥ ৬ ॥

তোপ্‌সে আর লালমোহনবাবুকে নিয়ে ফেলুদা প্রথম এসেছিল সাউথ পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানে ২৫শে জুন। তোপ্‌সের লেখায় একেবারে ছবির মতো গোরস্থানের চেহারা ফুটে উঠেছে। তোপ্‌সে লিখছে: 'আমি বাঁ-দিক ডান-দিক চোখ ঘোরাচ্ছি। আর ফলকের নামগুলো বিড়বিড় করছি— জ্যাকসন, ওয়াট্‌স, ওয়েলস্, লারকিন্‌স, গিবন্‌স, ওল্ডহ্যাম...।'

যে রাস্তায় তোপ্‌সেরা হেঁটে এগিয়েছিল, সে-রাস্তায় আমি অবিশ্যি একমাত্র জ্যাকসন ছাড়া আর কারও সমাধি দেখতে পাইনি। মার্বল-পাথরে লেখা আছে ঃ

GULIEMUS JACKSON
OBIIT XXIV DIE AUGOSTI
ANNO DOMINI
MDCCCVII
AETATIS SUAE LIV

উত্তেজনায় তোপ্‌সে হয়ত সব নাম মনে রাখতে পারেনি। তখনই তো আর সে নোট নেয় না। তবে তোপ্‌সে একটা ব্যাপার ঠিকই দেখেছে। সে জানিয়েছে: 'মাঝে মাঝে দেখছি পাশাপাশি একই নামের বেশ কয়েকটি সমাধি রয়েছে — বোঝা যাচ্ছে সবাই একই পরিবারের লোক।'

একদম ঢুকতেই ডানহাতেই রয়েছে এমনই একটা সমাধি। ডরোথি স্মিথ, টমাথ স্মিথের একসঙ্গে। ১৭৯৮ সালে ২৮ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন ডরোথি। আর টমাস মারা গিয়েছেন ১৮১৫ সালে। একই পরিবারের দুই সদস্যের সমাধি একই জায়গায়। এমন আরও বহু সমাধি রয়েছে এই গোরস্থানে, যেখানে শায়িত রয়েছেন একসঙ্গে একই পরিবারের একাধিক সদস্য।

২৫শে জুন গোরস্থানে পৌঁছে ফেলুদার নজরে এসেছিল টমাস গডউইন নামের এক সাহেবের সমাধির পাশে খালের মতো গর্ত। আমগাছের ডাল পড়ে এই টমাস গডউইনের সমাধির মার্বল-পাথরের ফলক গিয়েছিল ভেঙে। মার্বলের ভাঙা টুকরো জুড়ে ফেলুদা বের করেছিল সায়েবের নাম — টমাস গডউইন। কিন্তু এখানেও সম্ভবত তোপ্‌সের স্মৃতি ঠিক কাজ করেনি। তোপ্‌সে আর ফেলুদা যেভাবে জুড়েছিল, তাতে তোপ্‌সের স্মৃতিতে জিনিসটা দাঁড়িয়েছিল এই রকম:

Sacred to the Memory of
THOMAS [ ] WIN
Obt. 24th April [ ] 8, AET 180

যে টুকরোটা সমাধির গায়ে লেগেছিল তাতে লেখা ছিল [GOD 185]

ফলে পুরো ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে

Sacred to the Memory of
THOMAS GODWIN
Obt. 24th April 1858, AET 180

ফেলুদাই জানিয়েছে 'এ-ই-টি হল এইটাইটিস অর্থাৎ বয়স'। তাহলে 'AET 180' নিশ্চয়ই ভুল। তোপ্‌সে এতটাই উত্তেজিত ছিল যে মনেই নেই 'AET'-র পরে লেখা ছিল 70। অর্থাৎ, তোপ্‌সে আর ফেলুদা জোড়া লাগিয়ে যে-জিনিসটা দাঁড় করিয়েছিল, তা হবে:

Sacred to the Memory of
THOMAS GODWIN
Obt. 24th April 1858 AET 70

তো এই টমাস গডউইনের সমাধির পাশে খালের মতো গর্ত দেখে, ফেলুদার মনে হয়েছিল কেউ বুঝি

খোঁড়ার কাজ সবে শুরু করেছে। ফেলুদার ধারণা যে ঠিক, সেটা বোঝা গেল একটু পরেই। তোপ্‌সে লিখেছে: 'অর্ধেক পথ যাবার পর সে হঠাৎ থামল কেন সেটা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারিনি। তারপর তার চাহনি অনুসরণ করে একটা জিনিস দেখে আমার হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে হার্টবীটটাও এক পলকের জন্য থেমে গেল।

'একটা গম্বুজওয়ালা সমাধি— যার ফলকে মৃতব্যক্তির নাম রয়েছে মিস্ মারগারেট টেম্পলটন — তার ঠিক সামনে ঘাসে পড়ে থাকা একটা পুরনো ইঁটের উপর একটা সিকিখাওয়া জ্বলন্ত সিগারেট থেকে সরু ফিতের মতো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছে। বৃষ্টি হবে বলেই বোধহয় বাতাসটা বন্ধ হয়েছে, নাহলে ধোঁয়া দেখা যেত না।'

তোপ্‌সে যখন এই সিগারেট ফেলে যাওয়া লোকটাকে খোঁজার কথা জানাল, তখন ফেলুদাই বলল, 'সে যদি থাকত, তাহলে সিগারেট হাতে নিয়েই থাকত; কিংবা হাত থেকে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে নিবিয়ে দিত। আধখাওয়া অবস্থায় এভাবে ফেলে যেত না। সে লোক পালিয়েছে, এবং বেশ ব্যস্তভাবেই পালিয়েছে।'

বোঝা গেল, ফেলুদাদের দেখে টমাস গডউইনের সমাধি খুঁড়তে আসা লোকটা ব্যস্তভাবে পালিয়েছে।

এই পর্যন্ত ঘটেছিল ২৫শে জুন। পরের পরের দিন, অর্থাৎ ২৭শে জুন এই গোরস্থানে টমাস গডউইনের সমাধির কাছে আরও একবার এসেছিল তোপ্‌সে আর লালমোহনবাবু। সেদিন অবিশ্যি ফেলুদা আসেনি। সেদিনকার অভিজ্ঞতা লিখতে গিয়ে তোপ্‌সে জানাচ্ছে: 'লালমোহনবাবু যেন মনে সাহস আনার জন্যই যান্ত্রিক মানুষের মতো কথাটা বলতে বলতে গডউইনের সমাধির দিকে এগিয়ে গেলেন তারপর তাকে তিনবার 'ক' আর দু'বার 'কং' কথাটা বলতে শুনলাম, আর তার পরই তিনি দাঁত কপাটি লেগে কাটা গাছের মতো সটান পড়ে গেলেন মাটির ঢিবির ওপর। প্রায় এক-মানুষ গভীর, আর সেই গর্তের মাটির ভিতর থেকে উঁকি মারছে একটা মড়ার খুলি।'

অর্থাৎ গত দু'দিনের কোনও একটা সময়ে সমাধি খোঁড়ার অসমাপ্ত কাজটা কেউ বা কারা সম্পূর্ণ করতে এসেছিল। গর্তও প্রায় হয়েছে এক মানুষ গভীর। মানে, প্রায় পাঁচ-সাড়ে-পাঁচ ফুট গভীর। আর সেই গভীরতাতেই বেরিয়ে এসেছে মাটির তলায় শুয়ে থাকা শরীরের কঙ্কাল। পরে অবশ্য ফেলুদা এসে, গডউইনের সমাধি দেখে, মাটির ভিতর থেকে উঁকি মারা প্রায় সোয়াশো বছরের পুরোন মড়ার খুলি দেখে, আর চারিদিকটা ভালো করে সার্চ করে, সমাধি থেকে হাত দশেক দূরে পড়ে থাকা একটা কোদাল ছাড়া আর কিছু পায়নি!

ফেলুদার মতে, 'যে বা যারা খুঁড়ছিল তারা মড়ার খুলি দেখেই ভয়ে পালিয়েছে। নইলে ওভাবে কোদাল ফেলে দিয়ে যায় না। হয় নিয়ে যাবে, না হয় লুকিয়ে রাখবে।'

ঠিক এই জায়গা থেকে আমরা আরও একবার ফিরে যেতে চাই জোব চার্নকের কবর খোঁড়ার রিপোর্টে। ফিরে যেতে চাই, তার কারণ রেভারেন্ড হাইড-এর এই নোটস্-এর বাকি কথা থেকেই আমরা দেখতে পাব কীভাবে ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে 'গোরস্থানে সাবধান'-এর টমাস গডউইনের কবর খোঁড়ার ঘটনাতেও।

রেভারেন্ড হাইড তাঁর নোট্স-এ লিখছেন

'২২শে নভেম্বর, মঙ্গলবার, পরের দিন সকালে সমাধি ক্ষেত্র পরিদর্শনের সময় খেয়াল করলাম ইতিমধ্যেই প্রায় ছ'ফুটের মতো খোঁড়া হয়ে গিয়েছে। মৃত শরীরের কিছু হাড়-গোড় বেরিয়ে পড়তেই, যারা খুঁড়ছিল তারা খোঁড়া বন্ধ রেখে চলে গিয়েছে। সাধারণ কবরের চেয়ে খোঁড়া জায়গাটা সামান্য ছোট বলেই মনে হল। মেঝের মাঝামাঝি অবস্থায় পূর্ব-পশ্চিমে আড়াআড়ি কবর। একেবারে তলার দিকটা সমান করে পরিষ্কার করা। পশ্চিমদিকটায় তারা একটু বেশি খুঁড়তেই একটা হাড় বেরিয়ে পড়ে। হাড়টা ঠিক সেই জায়গাতেই রাখা। হাড়টা বেরিয়ে পড়তেই খোঁড়ার কাজ একেবারে বন্ধ।'

অর্থাৎ দেখা গেল, জোব চার্নকের দুশো বছরের পুরনো কবরের ঠিক ছ' ফুট তলাতেই রয়েছে শরীরের হাড়ের চিহ্ন। গভীরতার মাপটাও (জোব চার্নকের

ক্ষেত্রে ছ' ফুট আর টমাস গডউইনের ক্ষেত্রে সাড়ে পাঁচ ফুট) দুটি ক্ষেত্রে প্রায় এক। দুটি ক্ষেত্রে আরও একটি চমকপ্রদ মিল রয়েছে। এই গভীরতায় পৌঁছতে দুটি ক্ষেত্রেই দুটি ধাপের প্রয়োজন হয়েছে। জোব চার্নকের সমাধির ক্ষেত্রে প্রথম দিন প্রায় ফুট চারেক খোঁড়া হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে ছ' ফুট গভীরতায় হাড়ের টুকরো পাওয়ার পর খননকার্য বন্ধ। টমাস গডউইনের কবর প্রথম দিন খোঁড়া হয়েছিল ছোট একটা গর্তের মতন, যে গর্তের ধারে পৌঁছতেই লালমোহনবাবু হঠাৎ সড়াৎ করে খানিকটা নিচের দিকে নেমে গিয়েছিলেন। ভাগ্যিস ফেলুদা ঠিক সময়ে তার লম্বা হাত দুটি বাড়িয়ে তাঁকে খপ্ করে ধরে টেনে তুলে, শক্ত জমিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে সেই ছোট গর্তই গভীরতা পেয়েছিল এক মানুষ সমান। সেই দিনে টমাস গডউইনের কঙ্কালের খুলি বেরিয়ে পড়তেই, খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এই চমকপ্রদ মিল ফেলুদার মতন কলকাতার ইতিহাস-জানা মানুষের চোখ এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। তাই কীসের খোঁজে টমাস গডউইনের কবর খোঁড়া হচ্ছে, সেটা বুঝে ফেলতে ফেলুদার একটুও সময় নষ্ট হয়নি। কেননা, ঠিক ওই একটি কারণে রেভারেণ্ড হাউড কঙ্কালের হাড়ের টুকরো পাওয়ার পরই খননকার্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে জোব চার্নকের সমাধি মাটি দিয়ে ঢেকে ফেলার বন্দোবস্ত করেন। এ-ব্যাপারে রেভারেণ্ড হাউড লিখছেন 'ওই হাড়টা দেখার পর আমি নিশ্চিত হলাম সেটা বাঁ-হাতের ফোর-আর্মের একটি হাড়, এই হাতটি রাখা ছিল বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে রাখা। আরও একটু মাটি সরাতেই আমার চোখে পড়ে একটা ছোট্ট জিনিস। প্রথমে ভেবেছিলাম বড় কফিন-পেরেক বুঝি! কিন্তু হাতে নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখার পর বুঝলাম—একটি ছোট্ট হাড়। সম্ভবত বাঁ-হাতেরই। আমি আর একটুও মাটি খোঁড়ার পক্ষপাতী ছিলাম না। পূর্ব দিকের মাটিতে কালো মতন কী একটা দেখা যাচ্ছিল। সম্ভবত ক্ষয়প্রাপ্ত কফিন-ঢাকনা। বোঝাই যাচ্ছিল কোদালের আর মাত্র কয়েকটা কোপেই কঙ্কালের বাকিটা বেরিয়ে আসত। সম্ভবত ২০০ বছর আগের মত একেবারে ঠিকঠাক ভাবেই। কোনও সন্দেহই আর রইলনা, যে-গভীরতায় কঙ্কালটি রয়েছে এবং যে-ভাবে রয়েছে, যে নশ্বর শরীরটিকে ঘিরে এই সমাধিক্ষেত্রটি গড়ে উঠেছে, সেটি কলকাতার জনকেরই।

সমাধিক্ষেত্রটা দেখার পর, আমি খোঁড়া জায়গাটা ভর্তি করার আদেশ দিয়ে দিলাম। আমার ভাবনা হচ্ছিল, কঙ্কালের শরীরে দামি আংটি কিংবা মূল্যবান কিছুর লোভে কুলিরা জায়গাটা না তছনছ করে দেয়...'

রেভারেন্ড হাইড-এর নোট-এর এই শেষ প্যারাগ্রাফটি ছিল সবচেয়ে জরুরি। অর্থাৎ, ২০০ বছর আগের কোনো মৃতের কঙ্কালের পাশে থাকতেই পারে তার প্রিয় কোনও মূল্যবান বস্তু, অথবা দামি কোন অলঙ্কার। অতএব, টমাস গডউইনের সমাধি খোঁড়ার পিছনেও থাকতেই পারে এমনই এক জবরদস্ত কারণ। আর ঘটনা যে আসলে এইটাই ঘটেছে, তা ফেলুদা মিলিয়ে নিয়েছে পরে, শার্লট গডউইনের ডায়েরি পড়ে। লখ্নৌ-এর নবাব সাদত আলির কাছ থেকে পাওয়া প্রথম বকশিস টমাস গডউইন রেখে গিয়েছিল তার মেয়ে শার্লটের কাছে। মারা যাবার আগে টমাস মেয়েকে বলে গিয়েছিল সেটা যেন তার কফিনের মধ্যে পুরে তার মৃতদেহের সঙ্গে কবর দেওয়া হয়। শার্লট তার বাপের ইচ্ছে পূরণ করে মনে শান্তি পেয়েছিল। তোপ্সে জানতে চেয়েছিল সাদত আলির কাছ থেকে পাওয়া প্রথম বকসিসটা কী? উত্তরে ফেলুদা জানিয়েছিল, 'শার্লটের ভাষায়—ফাদার'স প্রেশাস পেরিগ্যাল রিপীটার।'

'গোরস্থানে সাবধান' কাহিনীর যত ক্রাইম, অ্যাডভেঞ্চার এবং রহস্য গড়ে উঠেছে এই পেরিগ্যাল রিপীটারকে ঘিরেই। অর্থাৎ, ফেলুদার ধারণাই ঠিক। টমাস গডউইনের সমাধি খোঁড়া হয়েছে এই 'প্রেশাস' রিপীটারের জন্যই। আর কোনও কারণে নয়। 'রিপীটার মানে ঘড়ি অথবা বন্দুক দুটোই হতে পারে।'

WEBSTER 3rd New International Dictionary জানাচ্ছে Repeater-এর অর্থ 1) a watch or clock with a striking mechanism that upon pressure of a spring will indicate the time in hours and quarters or sometimes minutes. 2) a rifle or shotgun having a magazine that holds a number of cartridges that are loaded shot by

shot into the firing chamber by the operation of the action of the piece.

কিন্তু রিপীটারের আগে পেরিগ্যাল থাকলে কী হতে পারে, সেটা জানা ছিল না ফেলুদার। ঘড়ি সংগ্রাহক মহাদেব চৌধুরীই ফেলুদাকে জানিয়েছে 'রিপীটার মানে বন্দুকও হয়। তবে তার সঙ্গে পেরিগ্যাল যোগ দিলে সেটা হয় ঘড়ি। পকেট ওয়াচ। ফ্রানসিস পেরিগ্যাল। ইংলিশম্যান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পেরিগ্যালের মতো ঘড়ির কারিগর পৃথিবীতে কমই ছিল। দু' শো বছর আগে ইংল্যাণ্ডেই সবচেয়ে ভালো ঘড়ি তৈরি হত, সুইটজারল্যাণ্ডে নয়।'

এই ঘড়ি কেনার সামর্থ্য যে গোয়েন্দা ফেলু মিত্তিরের নেই, সে-কথাও জানিয়ে রাখেন মহাদেব চৌধুরী। একে লখ্‌নৌ-এর নবাবের দেওয়া উপহার, তার উপর দুশো বছরের পুরনো— এই দুইয়ে মিলে ঘড়িটা হয়ে উঠেছে অমূল্য। এখন এমন খবর যদি পাওয়া যায়, কলকাতারই কোনও গোরস্থানে মৃতদেহের পাশে রাখা আছে এমনই এক ঘড়ি, তাহলে তার জন্যে যে ক্রাইম ঘটবে, এতে আর আশ্চর্য কী।

॥ ৭ ॥

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আজ, ১৯৯৫ সালে, যে-অবস্থায় এই গোরস্থান রয়েছে, সেটা দেখলে তো মনেই হয় না দিনে-দুপুরে কেদাল চালিয়ে কবর খোঁড়ার মতো এমন একটা জবরদস্ত খুনে ঘটনা ঘটানো সম্ভব!

কংকালের খুলি জেগে উঠতেই হঠাৎ খোঁড়া বন্ধ।

গোরস্থানে ঘুরে বেড়ানো প্রায় একটা অভ্যেসের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার একটা সময়। ১৯৭২-৭৩ সালে, যখন আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলাম, তখন কবরখানা স্টাডি ছিল আমাদের একটা প্রিয় বিষয়। আমরা কয়েকজন প্রায়ই দুপুরবেলা সাউথ পার্ক স্ট্রিট সেমেট্রিতে এসে স্কেচ করতাম। তখন এই গোরস্থানের যে-অবস্থা ছিল, তা এখনও চোখের সামনে ভেসে রয়েছে। কেমন যেন গা-ছমছমে একটা পরিবেশ। আগাছা আর জঙ্গলে ভরে আছে চারপাশ। সমাধিক্ষেত্রগুলো এখানে ভাঙা, সেখানে ভাঙা। পুরোটাই যেন একটা পরিত্যক্ত জায়গা। মূল ফটকের কাছে দরওয়ান গোছের একজন থাকত বটে, তবে তার খাটিয়া, রোদে-শুকোতে-দেওয়া পরনের কাপড়-চোপড়, আর কিছু বাসন-কোসন ছাড়া আর-কিছু কোনওদিন দেখিনি। তাকে তো নয়ই। গোরস্থানে প্রবেশ ছিল অবাধ। কোদাল-বেলচা নিয়ে চুপিসাড়ে ঢুকে পড়ে সমাধি খোঁড়া ছিল অত্যন্ত সহজ কাজ।

১৯৭৮ সাল অবধি জায়গাটা এই রকমই ছিল। আগেই বলেছি, 'গোরস্থানে সাবধান' লেখা হয়েছিল ১৯৭৭ সালে। সেই সময় ভেঙে পড়তে থাকা সৌধ আর আগাছার জঙ্গলে সমাজবিরোধীদের আড্ডা গজিয়ে উঠেছিল। অতএব, সেই সময় দুষ্কৃতির পক্ষে টমাস গডউইনের কবর খুঁড়ে পেরিগ্যাল রিপীটার তুলে নেওয়ার কোনও অসুবিধেই ছিল না।

এরপরে ভারত এবং ব্রিটেনের শিক্ষিত মহলের টনক নড়ায় তৈরি হয় 'ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর সেমেট্রিজ ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া' (BACSA)। একই সঙ্গে পাশাপাশি কলকাতাতেও তৈরি হল একটি সংস্থা, যার নাম 'দি অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য প্রিজার্ভেশন অফ হিস্টরিক্যাল সেমেট্রিজ ইন ইণ্ডিয়া' (APHCI)। ব্রিটেন ও কলকাতায় ব্যক্তিগত ও সংস্থা পর্যায়ে অনুদান এবং অর্থসাহায্য নিয়ে, এই সাউথ পার্ক সেমেট্রির অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়। 'দ্য ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান বেরিয়াল বোর্ড'ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এর ফলেই সাউথ পার্ক সেমেট্রি ফিরে পেয়েছে তার পুরোন চেহারা!

এই সেদিনও একবার ঘুরতে গিয়েছিলাম এই গোরস্থানে। আগে যতটা সাবধানে চলতে হত, এখন সে-অবস্থা একেবারেই নেই। রাস্তাঘাট ঝকঝকে তকতকে। সৌধগুলোর সংস্কার করা হয়েছে। এখন আর ভেঙে পড়ার ভয় নেই। আরও দক্ষিণে এগিয়ে গেলে, ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা সমতল জায়গা। সব মিলিয়ে একটা স্নিগ্ধ পরিবেশ। ভিতরে অবিশ্যি বাচ্চারা ক্রিকেট খেলছে।

আমার সঙ্গে ঘুরছিলেন গোরস্থানের বর্তমান কেয়ার-টেকার। বেরিয়াল বোর্ড দায়িত্ব নেবার পর থেকে কেয়ারটেকার এসেছেন। ভারতীয় ক্রিশ্চান ভদ্রলোক। অ্যাংলো পরিবার থেকে এসেছেন বলে ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় কথা বলেন না। তিনি জানালেন, এই সেমেট্রি এখন বিদেশীদের কাছে অন্যতম ট্যুরিস্ট স্পট্। ভিজিটরস্ বুক খুলে তার প্রমাণও দিলেন আমাকে। তবে এ-কথাও বললেন, কখন যে কোন ফাঁকে কে ঢুকে গিয়ে কী করে ফেলছে তা বোঝা যায় না।

আমি জানতে চাইলাম, 'কবরের ক্ষতি কি কেউ করতে পারে এখনও?'

তিনি বললেন, 'চলুন দেখাই।'

দূরে একটা জায়গায় নিয়ে গেলেন তিনি। দেখি, একটু পুরনো সৌধের মার্বল-পাথরটি টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে, ঠিক যে-ভাবে 'গোরস্থানে সাবধান'-এ টমাস গডউইনের সৌধের মার্বলটি টুকরো হয়ে গিয়েছিল।

এমন সময় দেখি, একটি যুবক হাতে একতাল মাটি নিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন। কেয়ারটেকার ভদ্রলোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কী?' যুবকটি জানাল, এই একটু মাটি তুলতে ঢুকেছিলাম।

যুবকটি চলে যেতে কেয়ার-টেকার আমাকে বললেন, 'দেখলেন তো, কে যে কখন ঢুকছে, কী তুলে নিয়ে যাচ্ছে, বোঝাই যায় না। স্থানীয় ছেলেপিলেদের দৌরাত্ম্যের মোকাবিলা করা যাচ্ছে না। আসলে কী জানেন, এইসব মার্বল স্ল্যাব, ইঁটের টুকরোর কোনও সেল ভ্যালু তো নেই, তাই ভেঙে-চুরে দেয়। কিন্তু, এ সবের একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব তো রয়েছে, সেটা কে বোঝাবে?'

ভদ্রলোক যখন এ-সব কথা বলছিলেন, তখন স্পষ্ট, যে তিনি মনে-মনে গভীর দুঃখ পাচ্ছেন। বোঝা গেল এই গোরস্থান এখনও ততটাই বিপজ্জনক। নিরাপদ নয়।

এখনও যে কোনও দিনই ঘটে যেতে পারে 'গোরস্থানে সাবধান'-এর গ্রেভ-ডিগিংয়ের মতো সাংঘাতিক ক্রাইম!

॥ ৮ ॥

'গোরস্থানে সাবধান' ক্রাইম-অ্যাডভেঞ্চারে ফেলুদার ভূমিকাটা যেন অনেকটা রেভারেন্ড হাইড-এর মতো। আর পুরো ঘটনাটাই যেন সেন্ট জন্স্ চার্চ কম্পাউন্ডে জোব চার্নকের সমাধি খননের প্রায় পুনরাবৃত্তি। জোব চার্নকের ঘটনা যদি মূল সুর হয়, তাহলে টমাস গডউইনের ঘটনা হল 'ভেরিয়েশন অফ দ্য মেন থিম'। গ্রেভ - ডিগিং থেকে শুরু করে সমাধিক্ষেত্রের তলায় মৃতদেহের কঙ্কালের পাশে থাকা মূল্যবান সামগ্রী চুরি করা পর্যন্ত নানা ভেরিয়েশনে পুনরাবৃত্তি, আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি।

এবারে একেবারে মোক্ষম মিলের জায়গায় চলে আসা যাক্। রেভারেন্ড হাইড তাঁর নোটস্-এ লিখছেন

...'Having seen what I did, I had the grave filled in, for I feared to leave it open lest the coolies might ransack its contents in search of rings or other valuables, and further I felt it improper, in view of the interest which must attach to such investigation, to permit to continue it done. If it were to be prosecuted at all it should at least be in presence of a representative company of Englishmen.'

রেভারেন্ড হাইড-এর নোট্স্-এর এই অংশটুকুতে 'felt it improper' কথারই পুনরাবৃত্তি যেন পাই 'গোরস্থানে সাবধান'-এ ফেলুদার শেষ সংলাপে। পেরিগ্যাল রিপীটার নিয়ে অপরাধ-সমাধান হয়ে যাবার পর, ফেলুদা শেষবারের মতো যেতে চেয়েছে সাউথ পার্ক স্ট্রিট গোরস্থানে।

কেন?

ফেলুদা উত্তর দিয়েছে 'এটা যথাস্থানে ফেরত দিতে হবে না?'

ফেলুদা ইচ্ছে করলেই টমাস গডউইনকে তার রান্নার জন্য দেওয়া লখ্নৌ-এর নবাব সাদত আলির প্রথম বকশিস— ইংল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারিগর ফ্রানসিস পেরিগ্যালের তৈরি রিপীটার পকেট-ঘড়িটি নিজের কাছেই রেখে দিতে পারত। কিন্তু রেভারেণ্ড হাইড-এর মতোই ফেলুদাও felt it improper। তাই ফেলুদা আরও একবার সাউথ পার্ক স্ট্রিট সেমেট্রিতে যেতে চেয়েছে। সোয়াশো বছর ধরে যে-ঘড়ি মালিকের কঙ্কালের পাশে ভূগর্ভে শুয়েছিল, সেখানেই সেটি আবার রেখে আসতে।

আসলে 'গোরস্থানে সাবধান' উপন্যাসটি শুধু ফেলু মিত্তির নামের এক প্রাইভেট ডিটেকটিভের গোয়েন্দা কাহিনীই নয়, সত্যজিৎ রায় নামের বিংশ শতাব্দীর এক কলকাতাবাসীর তিনশো বছর আগের কলকাতার জনক জোবুস চার্নকের প্রতি আন্তরিক এক শ্রদ্ধার্ঘ্য!
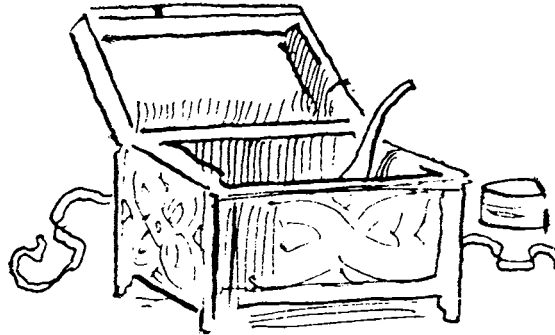
টমাস গডউইনের সম্পদ।

ফেলুদাদা ও লালমোহনবাবু

রবি ঘোষ

তখনও ফেলুদার প্রথম গল্পটা 'ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি' লেখা হয়নি, ফেলুদাদার সঙ্গে আমার আলাপ ১৯৬২ সালে। তারপর ঝাড়া ৩০ বছর ফেলুদাদার ভাবনা-চিন্তা ও কাজের সঙ্গে, আমার জীবনের স্বপ্ন আর বাস্তব ঘেঁটে গেল!

খুলে বলি ব্যাপারটা।

আমরা হলাম পূব বাংলার বরিশালের লোক, যদিও আমার জন্ম কলকাতায়। বাবা, কাকা, জ্যাঠামশাই সকলেই ছিলেন ছা-পোষা গেরস্ত। সকালের বাজারটা সেরে, সর্ষের তেল মেখে চান-টান করে, তরিবৎ করে ডাল-ভাত খেয়ে, ব্যস, পান চিবুতে চিবুতে আপিসে যেতেন। এদিকে আমি কিন্তু ইশকুলের লেখাপড়াকে তাচ্ছিল্য করে, গল্পের বই আর নাটক-ফাটকেই মাথা ঘামালাম বেশি।

কিছু পাগল-ছেলে জোগাড় করে দল পাকালাম। 'বোম্বাট অ্যাসোসিয়েশন' না কি-যেন নামটা! সে-দল উপে গেলে, আবার ক'জনকে জুটিয়ে 'শনিচক্র' বলে আর-একটা ক্লাব খুললাম। দুটো গ্রুপেই নাটক-ফাটক যা-কিছু করলাম, সবই এক্সপেরিমেন্টাল! একটা থাকে না কাঁচা বয়েসে— ট্র্যাডিশন্যাল কিছু করব না, ব্রেক হবে। ডি. এল. রায়ের 'সাজাহান' করব স্টেজে, তা-ও একটু অন্য কায়দায়!

কী অক্লান্ত আর নিখুঁৎভাবে রিহার্সাল দেবার চেষ্টা করতাম, যেন পরশুই প্লে! কিন্তু কোনও নাটকই স্টেজড্ হলো না। তারজন্যে যে টাকাকড়ি দরকার, সেটা আমরা জোগাড় করতে পারিনি কিছুতেই। আমার জীবনে তখনও কোনো ফেলুদাদা আসেনি!

তবে নাটকের রিহার্সালের সময়টুকু বাদে, আমরা খুব ব্যস্ত থাকতাম সিনেমা-থিয়েটার নিয়ে গম্ভীর সব আলোচনায়। কী আলোচনা, ভগবান জানে! মাথা নেই, মুন্ডু নেই! তাবলে আমাদের সিরিয়াসনেস এবং গাম্ভীর্য কখনও এতটুকু টস্‌কায়নি।

এমনকি আড়াই টাকার টিকিটে, বেঞ্চিতে বসে দেখলাম শিশিরকুমার ভাদুড়ির থিয়েটার। আজ কেমন যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়, ওখান থেকেই তো আমাদের স্বপ্ন-দেখা শুরু! শিশির ভাদুড়ি, নরেশ মিত্তির বা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যর একটা প্রভাব সরাসরি পড়ল। বিশেষ করে অ্যাক্টিং-এর টাইমিং!

তাছাড়া কাঁচা বয়েসেই 'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি'তে ভিড়ে গিয়ে, আমাদের লাগাম-ছাড়া স্বপ্ন আরও মাথা-চাড়া দিলো। পল মিউনি, চার্লস লটন, অলিভিয়ে বা রোনাল্ড কোলম্যান-এর ছবি দেখার পর, বেশিরভাগ বাংলা সিনেমাই অসহ্য, কুচ্ছিৎ মনে হলো! আর দেখলাম চ্যাপলিন-এর মাথা-ঘুরে-যাওয়া সব ছবি, নির্বাক ও সবাক। অবিশ্যি চার্লি চ্যাপলিনকে ঠিক ফেভারিট লেভেলে রাখি না। ওঁকে ধারণ করে রাখতে হয়!

সবে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে কলেজে ঢুকেছি, ১৯৪৯ সাল, আচমকা আলাপ হলো উৎপল দত্তের সঙ্গে। ভারি ইন্টারেস্টিং মানুষ। ভালো লেগে গেল। ক'দিন পরেই আমি আর আমার বন্ধু সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ঢুকে পড়লাম উৎপল দত্তের 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ'-এর ইংরিজি সেকশনে। ইংরিজি মিডিয়ামে পড়াশোনা করিনি, তাই বেজায় ভয় পেলাম। প্রথম দিনেই উৎপল দত্ত আমাদের ইংরিজি-উচ্চারণের নমুনা নিলেন। সে এক কেলেঙ্কারি! কোনো কিছুই উচ্চারণ না-করে, কী

আর বলব তোমাদের, স্রেফ লিপ্-মুভমেন্ট দিয়ে গেলাম! তবু শেক্সপীয়ারের 'ওথেলো' নাটকে ছোট্ট একটা চরিত্রে অভিনয় করতেই হলো। কিন্তু উৎপল দত্তকে হরদম বোঝালাম, ইংরিজিতে নাটক-ফাটক করে কিস্যু হবে না। ফর্‌ফর্ করে যে ইংরিজি বলছেন, এ-দেশে বোঝে ক'জন?

'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'-এর বাংলা নাটকেও এন্তার পার্ট করেছি। কিছু মৌলিক নাটক, বেশিরভাগই অ্যাডাপ্‌টেশন, এমনকি বাংলায় শেক্সপীয়ার করলাম। প্রায় সবই ছোটখাটো রোল, বড় চরিত্র চাইলাম না কখনও। যতটা পারা যায় অভিনয়টা এড়ানোর চেষ্টা! বসে বসে রিহার্সালি দেখতে দেখতে বা উৎপল দত্তের ফাই-ফরমাশ খাটতে খাটতে, দিব্যি 'থিয়েটার' শেখা হয়ে গেল। কিন্তু ফেলুদাদার দেখা না-পেলে, আমার স্বপ্নের পৃথিবীকে চিনব কী করে?

উৎপল দত্তের পাঠশালায় বছর দশেক ছিলাম। তারি মধ্যে বায়োস্কোপে চান্স পেলাম, ১৯৫৯ সালে। কিন্তু সেভাবে আমাকে পাত্তা দিতে চাইলেন না বাংলা সিনেমার মস্তো পরিচালকরা। এদিকে পুলিশ কোর্টের কেরানির চাকরি আর পোষাচ্ছিল না। বছর ছয়েকের ফালতু চাকরিটা ঝপ্ করে ঝেড়ে ফেলার ক'দিন পরেই, আচমকা পর পর বাবা ও জামাইবাবু মারা গেলেন।
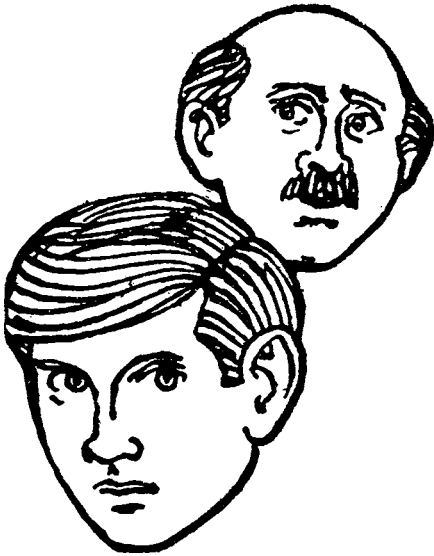
চারদিক থেকে সাংঘাতিক চাপে পড়লাম, বাপ্ রে, সে কী অর্থনৈতিক সংকট!

ইতিমধ্যে 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ'-এর সঙ্গেও সম্পর্ক ঘুচে গেছে। সময়টা কীরকম যেন টানাপোড়েনের মধ্যে কাটতে লাগল। কোনও কিছুই ভালো লাগছিল না। সবই কেমন যেন তেতো! সিনেমা-থিয়েটার ঘিরে আমার সব স্বপ্নকে মাঝ-গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে, চাকরি-বাকরি যা-হোক্ কিছু জুটিয়ে, কলকাতা থেকে কেটে পড়ার তাল খুঁজতে লাগলাম। হেনকালে ফেলুদাদার সঙ্গে আলাপ! নিম্ন-মধ্যবিত্ত ছা-পোষা বাঙালি পরিবারে জন্মেও, অনেক স্বপ্ন-দেখা অতি সামান্য একটা ছেলে 'আত্মহত্যা' না-করে, এ-জন্মের মতো 'বেঁচে' গেল!

॥ ২ ॥

সেটা ১৯৬২ সালের গোড়ার দিক। লোকে মোটেও চেনে-টেনে না আমাকে। বাসে-ট্রামে স্মার্টলি চড়ে বেড়াই। একদিন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাৎ দোতলা বাসে চেপে এসপ্ল্যানেড থেকে কালিঘাটে ফিরছি, বাসের মধ্যেই দেখা হয়ে গেল ভানু ঘোষের সঙ্গে। ভানু আমার ছোটবেলার বন্ধু, একসঙ্গে ইশকুলে পড়তাম। হাঁউমাঁউ করে ভানু বলে উঠল, 'কোথায় ছিলি অ্যাদ্দিন? শিগ্‌গিরি চল্, মানিকদা তোকে খুঁজছেন।'

ভানুর মানিকদা হলেন সত্যজিৎ রায়, আমার ফেলুদাদা। সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার দলে ভানু তখন বে-পরোয়া প্রোডাকশন ম্যানেজার। ওই রাত্তিরেই ভানুর সঙ্গে গেলাম লেক টেম্পল রোডের সেই তেতলার ফ্ল্যাটে।

কোনও ভূমিকা না-করেই, আমার স্বপ্নের জগতে ঢোকার পাসপোর্টটা আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন ফেলুদাদা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প থেকে 'অভিযান' ছবি হচ্ছে, ট্যাক্সি-ড্রাইভার নরসিং হচ্ছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তার সাকরেদ রামা-র চরিত্রে আমাকে ভেবেছেন! উৎপল দত্তের নাটকে আমাকে দেখেছেন তিনি। ভানুর কাছে আমার বায়োডেটা পেয়েছেন। আমাকে আর-একবার চাক্ষুষ দেখামাত্র, ফাইন্যাল সিলেক্‌শন হয়ে গেল! ঠিক সেই মুহূর্তেই,

ফেলুদাদার মতো একজন বিরল মানুষকে আজীবনের বন্ধু পেলাম!

'অভিযান' থেকে 'আগন্তুক' — ৩০ বছরে সত্যজিৎ রায়ের সাতটা ছবিতে অভিনয় করেছি, খালি বাঘা বাইনের ভূমিকায় দু'বার। ভারি আশ্চর্য আর রহস্যময় এই পার্থিব জীবনে 'বেঁচে' থাকার অ-আ শিখেছি ফেলুদাদার কাছেই। তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করেই নিজেকে বারে বারে শুধরেছি, তিলে তিলে গড়ে তুলেছি, নিজেকে 'মানুষ' বানিয়েছি। এমনকি ও-রকম তুখোড় আড্ডাবাজ লোক, এ-জন্মে আর দেখলাম না!

ফেলুদাদার সঙ্গে সেই আড্ডার শুরু ১৭২ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটে, 'সন্দেশ' পত্রিকার আপিসে। 'অভিযান' ছবির শুটিং-এর সময়, ১৯৬২ সাল, 'সন্দেশ'-এর আপিসটাই তখন সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন্স-এর কার্যালয়। শুটিং না-থাকলেও, হরদম চলে যেতাম সেই 'সন্দেশী' গন্ধময় দোতলার আড্ডাখানায়। বিকেল গড়াতে-না-গড়াতেই জমপেশ খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে, কী রোমাঞ্চকর ফিল্মি আড্ডা! এমনও হয়েছে, আচমকা গিয়ে দেখি আপিস ফাঁকা, একমনে নিজের উপন্যাসের প্রুফ দেখছেন 'সন্দেশ'-সম্পাদক সত্যজিৎ রায়! ওখানে ঝল্‌মলে 'সন্দেশী'-আড্ডাতেও বার কয়েক গিয়ে পড়েছি। পরে যখন ফেলুদাদার বাড়ির আড্ডায় পাকাপাকি ঠাঁই পেলাম, আমার স্বপ্নের পৃথিবীটা তিলে তিলে বাস্তবের মাটি পেলো!

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, জন্মগত দোষ-গুণ বা বংশধারার চাইতে, পরিবেশের প্রভাব বেশি জোরালো। ...এ-কথাটা যে কত সত্যি, নিজের জীবনে দিব্যি টের পেয়েছি। নইলে বাজার করা, চান-খাওয়া-ঘুম, পান চিবুনো আর মাছি-মারা কেরানিগিরির বাইরেও যে পৃথিবীতে অনেক কাজ আছে, সেটাই তো জানতেন না আমার বাবা-কাকা-জ্যাঠারা! কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমি খুঁজে পেয়েছি বা বানাতে পেরেছি সেই পরিবেশ, যেখানে আলো করে আছেন আমার কিছু বন্ধু ও প্রিয়জন, উৎপল দত্ত এবং আমার ফেলুদাদা সত্যজিৎ রায়।

॥ ৩ ॥

কেন যে সত্যজিৎ রায়কে মনে মনে ফেলুদাদা বলে ডাকি, সেটা খোল্‌সা করে বলা দরকার। ছোটবেলা থেকেই আমি গল্পের বইয়ের সাংঘাতিক পোকা! রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, রাজশেখর বসু (পরশুরাম), সৈয়দ মুজতবা আলী আর লীলা মজুমদার হলেন আমার চিরকেলে প্রিয় সাহিত্যিক। ১৯৬০ দশকের গোড়ায় 'সন্দেশ' পত্রিকার দৌলতে, সেই তালিকায় জুড়ে গেলেন সত্যজিৎ রায়। তাঁর সব ছোটগল্প, শঙ্কু-কাহিনী, তারিণীখুড়োর গল্প আর ফেলুদার অ্যাডভেঞ্চার বহুবার পড়েছি, বেশ ক' টা বই আমার হাতের কাছেই থাকে। সত্যজিৎ রায় যা হয়েছেন এবং আরও যা হতে পারতেন, কিন্তু কোনও কারণে বা নিজের ইচ্ছেতেই হননি, ফেলুদা তারই প্রতিচ্ছবি। ফেলুদার গল্প-উপন্যাসগুলো বারে বারে পড়তে বসে মনে হয়েছে — পারিবারিক পরিচয় সমেত, ফেলুদা লোকটা সত্যজিৎ রায়েরই দ্বিতীয় একটা সত্তার প্রোজেকশন, অলটার ইগো!

ফেলুদার বাবা জয়কেষ্ট মিত্তিরের কথাই ধরা যাক্। ভদ্রলোক ছিলেন অঙ্ক আর সংস্কৃতর মাস্টার। মুগুর-ভাঁজা শরীর। ক্রিকেট, ফুটবল, সাঁতার, কুস্তি — সব ব্যাপারে দুর্দান্ত। এ তো সারদারঞ্জন রায়ের বর্ণনা, যিনি সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুর্দা উপেন্দ্রকিশোরের দাদা। জয়কেষ্ট মিত্তির ছিলেন দুঃসাহসী। শেয়ালের গর্তে হাত ঢুকিয়ে, শেয়ালের বাচ্চা চুরি করতেন। কাঁচা বয়েসে ঠিক এই কাণ্ডটাই করেছেন উপেন্দ্রকিশোরের ভাই কুলদারঞ্জন রায়। ফেলুদা ন'বছর বয়েসে বাপকে হারিয়েছে, সত্যজিৎ রায় আড়াই বছরে। ফেলুদা মানুষ হয়েছে কাকার বাড়িতে, সত্যজিৎ রায় মামাবাড়িতে।

ফেলুদার হাইট কত? ছ' ফুট দু' ইঞ্চি। ছাতি? ৪২ ইঞ্চি। সুদর্শন, প্রখর দৃষ্টি, ভ্রূকুটি থেকেই বোঝা যায় বিরক্ত হয়েছে কিনা। চাপা উত্তেজনার সময় বাঁ-হাতের তেলোর চাপে ডানহাতের আঙুল মট্‌কায়। মুখ দেখে মোটেই মনের অবস্থা ঠাওর করা যায় না। অনেক রাতে ঘুমোলেও, সূর্য ওঠার আগেই উঠে পড়ে। খাদ্যরসিক। সব-রকম খাবারে সড়গড় হলেও, বাঙালি-খানাই বেশি পছন্দ। চায়ের সঙ্গে ডালমুট না-হলে চলে না। সেই ডালমুট আসে নিউমার্কেটের কলিমুদ্দির দোকান থেকে। বাইরে কোথাও গেলে, স্থানীয় খাবার চেখে দেখতে ভোলে না।...ফেলুদার এত-সব পরিচয়ের প্রায় সবই যে মিলে যাচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে!

ফেলুদা যোগব্যায়াম করে। সবচাইতে প্রিয় খেলা ক্রিকেট, স্লো-স্পিন-বোলার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে একবার লখ্‌নৌ, আর-একবার বেনারসে খেলতে গেছে। একশো রকম ইন্‌ডোর গেমস্ জানে। তাসের ম্যাজিক জানে। রাইফেল কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছিল। যুযুৎসু ও ক্যারাটেতে চৌকোস্।

সত্যজিৎ রায়-ও শরীর ফিট্ রাখতে এককালে যোগব্যায়াম করতেন। দুর্দান্ত স্লো-স্পিন বোলার হিসেবে খেলেছেন প্রেসিডেন্সি কলেজের হয়ে, এমনকি যদ্দুর জানি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট-দলেও। তাসের ম্যাজিক বা একগাদা ইন্‌ডোর গেম্‌সেও তেম্‌নি ওস্তাদ। রাইফেল কম্পিটিশনে ফার্স্ট না-হলেও, ছোটবেলায় বন্দুক-ছোঁড়ায় তুখোড় ছিলেন। ক্যারাটে শেখেননি, কিন্তু যুযুৎসু-চর্চায় মেতেছেন কাঁচা বয়েসে।

ফেলুদার মতোই সত্যজিৎ রায়কে দেখেছি গুন-গুন করে সুর ভাঁজতে, খালি গলায় গান গাইতে। বাংলা স্বরলিপি আর সব রাগ-রাগিনীও তেম্‌নি মুঠোয়। ফেলুদার মতোই চমৎকার ছবি-আঁকার হাত। একবার দেখেই, সেই লোকটার ফাটাফাটি পোর্ট্রেট আঁকতে পারতেন। পুরনো দুষ্প্রাপ্য বই ও পুরনো পেন্টিং-এর প্রিন্ট সংগ্রহের বাতিক, প্রকৃতি-চর্চা, নানা রকম বই পড়ার অভ্যেস, বইয়ের যত্ন — সবই তো মিলে যাচ্ছে। পুরনো আসবাব ও পুরনো পোর্সিলিন, বাংলা ও ইংরিজি টাইপোগ্রাফি, লেখালেখির শখ, ধাঁধা-হেঁয়ালি-ক্রশওয়ার্ড পাজল কিম্বা গ্রীক ভাষার চর্চা — সবেতেই দু'জনেই বেশ দড়। এমনকি ভালো এবং মন্দ সিনেমার চিত্রনাট্যের কী তফাৎ, তাতেও দু'জনেরি টন্‌টনে জ্ঞান!

পুরনো নিউমার্কেটের বাড়িটা ভেঙে ফেলা, শহীদ মিনারের চুড়োয় লাল-রঙ করা কিম্বা দূরদর্শনে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' খামচে দেখেই ফেলুদা মহা বিরক্ত, সেটা যে আসলে সত্যজিৎ রায়েরই মনের ভাব— বুঝতে

কারো অসুবিধে হয় না। দু'জনেই ভারি আত্ম-সচেতন। সহজে ঘাবড়াবার পাত্র নন। দুর্দান্ত রসবোধ, তীক্ষ্ণধী, সময়নিষ্ঠ। দু'জনেরি ধারণা, মনটা খোলা না-রাখলে, মানুষকে বোকা বনতে হয়!

দু'জনের মধ্যে যেটুকু অ-মিল, তারও ন্যায্য কারণ আছে। সত্যজিৎ রায় যে-সব বিষয়ে জানতেন না, বা জানলেও চর্চার অভাবে মুঠোয় নেই, অথচ সে-সব বিষয়ে জানা বা শেখার আগ্রহ কখনও টস্‌কায়নি, সেই সমস্ত বিদ্যেতেও ফেলুদাকে তিনি দক্ষ করে তুলেছেন। সুযোগ বা সময়ের অভাবে যে-সব আকাঙ্খা পূরণ হয়নি সত্যজিৎ রায়ের, ফেলুদার মধ্যে তিনি সেই আকাঙ্খাগুলো মিটিয়ে নিয়েছেন। সত্যজিৎ রায়ের একগাদা দুঃখ ভুলিয়েছে ফেলু মিত্তির।

মোট কথা, ফেলুদাকে যেহেতু নিজেরই আদলে গড়েছেন সত্যজিৎ রায়, নিজের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচি ও রসবোধকে ঢেলে দিয়েছেন ফেলুদার মধ্যে, তাই ফেলুদা-কাহিনী পড়তে বসলে কিম্বা সিনেমায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত ফেলুদাকে দেখলেও, আমার মন-জুড়ে দেখতে পাই সত্যজিৎ রায়কে। তার চেয়েও বড় কথা, সেই ফেলুদাদার কাছেই আমার জীবনের তিরিশটা বছর কেটেছে। ফেলুদাদার কাছেই আমি 'মানুষ' হয়েছি। আমার স্বপ্ন আর বাস্তবের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার লাগসই ছন্দটাকে চিনতে শিখেছি।

॥ ৪ ॥

ফেলুদা ক'জন হতে পারেন? ছেলে-বুড়ো, পুরুষ-মহিলা — ফেলুদার আপামর ভক্তরা বেশিরভাগই দেখি হতে চায় ফেলুদার সহকারী তোপ্‌সে। যদিও বাস্তব-জীবনে তোপ্‌সে হয়ে ওঠাও চাট্টিখানি কথা নয়। ছেলেটা কী বুদ্ধিমান, চৌকোস্‌, তেমনি ধারালো পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। বই পড়তে ভালোবাসে। চমৎকার বাংলা ও ইংরিজি জানে, বেড়ে লেখে গল্পগুলো।

তোপ্‌সে নয়, আমি বরং নিজেকে খুঁজে পাই লালমোহনবাবুর মধ্যে। আমি তো ওরকমি ছা-পোষা গেরস্ত-ঘরের লোক, সব-সময় যোগ্য মানুষের কাছে
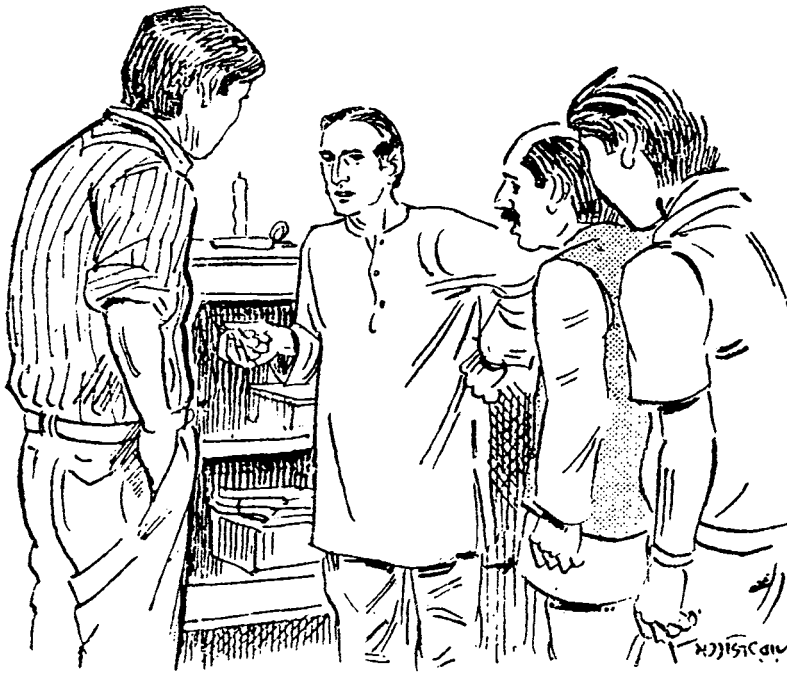
কিছু শেখার আগ্রহ, ওরকমি ফূর্তিবাজ, আড্ডা-রসিক। জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলি হলেন ফেলুদার একমাত্র খাঁটি বন্ধু, আমি অবিশ্যি ততটা 'বন্ধু' হয়ে উঠতে পারিনি ফেলুদাদার। তবে আমার মিডিয়ামে আমিও একজন 'বেস্ট সেলার', রহস্য-রোমাঞ্চ গল্পের মতো হাস্যরসের অভিনয়ও আম-জনতার সঙ্গে অতি সহজে সাঁকো বানায়। এমনকি নিজের কাজে হরদম ভুল করে, আমিও গাদা গাদা 'শিক্ষা' নিয়েছি আমার ফেলুদাদার কাছে।

দুই ফেলুদাদারই রসবোধ, বুদ্ধি-শুদ্ধি বা মাপটা, এক্সসেলেন্সটা আর-সবার থেকে আলাদা থাকের, অন্য পর্যায়ের। উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, সুকুমার ও সুবিনয় রায় থেকে পুণ্যলতা চক্রবর্তী, সুবিমল রায়, লীলা মজুমদার, কল্যাণী কার্লেকর — সেই পারিবারিক ট্র্যাডিশন বজায় রেখে, কিম্বা রক্তের ধারায় ব্যাপারটা আরও বেড়ে গিয়ে, সত্যজিৎ রায় ওরফে ফেলু মিত্তিরের জীবনে ও কাজে, মেলামেশা ও স্বপ্নে অমন যে সরসতার নদী, তার তুলনা খুঁজে পাওয়া মুশকিল! সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে, বৈদগ্ধ আর ক্যালিগ্রাফিতে, ইলাসট্রেশন ও প্রচ্ছদপটে, সাহিত্য আর সঙ্গীতে সবচেয়ে জোরালো যে গুণপনা — সেটা আর-কিছু নয়, স্রেফ সরসতা! এমন ফেলুদাদার পাল্লায় পড়ে, আমার হাস্যরসময় অভিনয়-জীবনটা যে বর্তে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

একটা চরিত্রকে ঘিরে দুর্দান্ত জনপ্রিয়তা, বাংলা সিনেমায় খুব কম অভিনেতাই পেয়েছেন। যেমন, 'গুপী গাইন' তপেন চট্টোপাধ্যায় বা 'মন্দার বোস' কামু মুখোপাধ্যায়, তেমনি 'জটায়ু' সন্তোষ দত্ত। কী আর বলব, সন্তোষ দত্ত হলেন একেবারে ওরিজিন্যাল, আর-কারো মতো নয়, সবার থেকে আলাদা। তাঁর অভিনয়ে ভ্যারাইটি এবং ডেপ্থ, দুটোই বেশি। দিব্যি চরিত্রের অনেক গভীরে ঢুকতে পারতেন। সেন্স অব টাইমিংটা দারুণ। খুব পাওয়ারফুল, বড় অভিনেতা। মাথা ঘামিয়ে অভিনয় করতেন। তেমনি রসবোধ, চাঁচাছোলা, স্পন্টেনিয়াস।

অবিশ্যি সন্তোষ দত্ত অভিনীত কী চমৎকার সব চরিত্র ছাপিয়ে, ছেলে-বুড়ো সবার কাছেই তিনি চিরকেলে

লালমোহনবাবু! অমন আশ্চর্য অভিনয়-প্রতিভায় সন্তোষ দত্ত যেমন আদ্যোপান্ত জটায়ু হয়ে গেছিলেন, তেম্‌নি গল্পের জটায়ুকেও সন্তোষ দত্ত হয়ে ওঠার জন্য তিলে তিলে নিজেকে বদলাতে হয়েছে, সেটা খেয়াল করেছ?

১৯৭১ সালে ফেলুদার যে উপন্যাসে জটায়ুর আবির্ভাব, সেই 'সোনার কেল্লা'য় জটায়ুর চেহারার বর্ণনা দিয়েছে তোপ্‌সে: 'অত্যন্ত নিরীহ, রীতিমতো রোগা, আর হাইটে নির্ঘাত আমার চেয়েও অন্তত দু'ইঞ্চি কম।' এক্ষুণি 'সোনার কেল্লা' বইয়ের পাতা উল্টে দ্যাখো, সত্যজিৎ রায়ের আঁকা ছবিতে লালমোহনবাবুর কেমন রোগা টিংটিঙে চেহারা, মাথায় চুল, চোখে চশমা, গোঁফ-টোফ নেই! তার মানে, ফেলুদার গল্প নিয়ে ছবি করার ভাবনাটা তখনও পাকেনি। অন্তত জটায়ুর চরিত্রে সন্তোষ দত্তকে ভাবা হয়নি। এদিকে আমি তখন নিজেকে সিনেমার জটায়ু ভেবে বসে আছি, যদিও ফেলুদাদাকে সে-কথা বলার সাহস নেই!

১৯৭২ সালের ফেলুদা-উপন্যাস 'বাক্স-রহস্য'-তে তোপ্‌সের বর্ণনায় জটায়ুর শরীরটা 'চিমড়ে' হলেও, সঙ্গের ইলাসট্রেশন দেখে বেজায় ভড়কে গেলাম! লালমোহনবাবু মোটেই চিমড়ে নন, বেশ স্বাস্থ্যবান! নাকের ডগায় চশমা থাকলেও, কপালে চুল কমে গেছে!

তারপর 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' (১৯৭৩) উপন্যাসে তোপ্‌সে লিখেছে, 'ভদ্রলোকের চেহারা বেশ খোলতাই হয়েছে'। ছবিতে দেখি, 'খোলতাই' চেহারা তো বটেই, তবে জটায়ুর চোখে চশমা নেই, আতিপাতি খুঁজে দেখলাম — তোপ্‌সেও এ-ব্যাপারে কিছু বলেনি। কান্ড দেখে আমার থুত্‌নি ঝুলে পড়ল, কিন্তু ফেলুদাদাকে কিছু জিজ্ঞেস করা হল না। ১৯৭৪-এর 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য'তে, আহা, লালমোহনবাবু আবার চশমা এঁটেছেন। অবিশ্যি তদ্দিনে চরিত্রটা আমার কাছ থেকে বেমালুম ফস্‌কে গেছে!

মনে আছে, ১৯৭৩ সালের পুজোর সময় গুজব শুনলাম, 'সোনার কেল্লা' ছবিতে জটায়ু সাজবেন সন্তোষ দত্ত। ক'দিন পরে দেখি সত্যি তাই, জোর কদমে শুটিং শুরু হয়ে গেল। আর ১৯৭৪-এর বড়দিনে ছবিটা রিলিজ করতেই, সন্তোষ দত্তের নাম পাকাপাকি লালমোহন গাঙ্গুলী হয়ে গেল!

তখনই মনে খট্‌কা লাগল! তাহলে কি ১৯৭২ সালে 'বাক্স-রহস্য' লেখার সময়েই সন্তোষ দত্তের কথা মনে এসেছিল ফেলুদাদার? তাই অতি গোপনে, পাঠকদের খুব-একটা টের পেতে না-দিয়ে, জটায়ুকে সন্তোষ দত্ত বানাবার কাজ শুরু করেছিলেন? মোট কথা, ১৯৭৫ সালের উপন্যাস 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ লালমোহনবাবু পুরোপুরি সন্তোষ দত্ত বনে গেলেন! সেই টাক, সেই গোঁফ, সেই চেহারা! 'সোনার কেল্লা' উপন্যাসের জটায়ু পরতেন সার্ট-প্যান্ট, এখন বেশিরভাগ সময় ধুতি-পাঞ্জাবি!

ধরো, আজ যদি হঠাৎ সন্দীপ রায় বলে বসেন, ফেলুদার অমুক গপ্‌পোটা ছবি হচ্ছে, আমাকে জটায়ু সাজতে হবে? হলপ করে বলতে পারি — সন্তোষ দত্তের লালমোহনবাবুকে মাথা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। তোমরাও পারবে না, আমিও না!

ফেলুনাথ সংকীর্তন

কৃষ্ণ ধর

কেতাবি নাম প্রদোষ মিত্তির
তার ডাকনামটি চালু
চেলা তোপ্‌সের দাদা তিনি
প্রদোষ হলেন ফেলু।
ফেলু মস্ত ডিটেকটিভ
তিনি শখের টিকটিকি
মামলা পেলে বান্দানাছোড়
আসামী বোমচিকি!
ফেলুবাবুর সঙ্গী জোটেন
জটায়ু লালমোহন
রহস্য রোমাঞ্চ লেখেন
কলমে সাতকাহন্।
ফেলু যাচ্ছেন সিকিম নেপাল
ছোটেন সোনার কেল্লায়
মগনলালকে জব্দ করেন
ফেলুর কীর্তি পেল্লায়।

অল্প কথার মানুষ ফেলু
তার নজর বেশি কাজে
শীর্ষাসন তো নিয়মিত
কখনো সুর ভাঁজেন।
রপ্ত আছে জুডোর প্যাঁচ
কারাটে কুংফু
পিস্তলটাও রাখেন তিনি
কাঁকড়া বিছে, ফুঃ!
এ সবই তো পুতুলখেলা
দেখান পেছন থেকে
রায় মহাশয় সত্যজিৎ
গড় করছি তাঁকে।

তাঁর মগজে জন্ম ফেলুর
তাঁর কলমে ফোটা,
আগলে রাখেন আড়াল থেকে
ফুলের যেমন বোঁটা।
প্রদোষ মিত্তির গোয়েন্দা
ফেলু সবার প্রিয়
তার নামেতে হুর্‌রা হুর্‌রা
সবাই মিলে দিয়ো।
তার যত না কীর্তিকথা
বইয়ের পাতায় লেখা
বাবু সত্যজিতের হাতেই
তার ছবিও আঁকা।
জয় বাবা ফেলুনাথ
জয় সত্যজিৎ
বন্দিলাম ছড়া কেটে
যিনি বিশ্বজিৎ।।

ফেলুদা
ইলাসট্রেশন অ্যালবাম

সত্যজিৎ রায় ১৯৬৫ থেকে ১৯৯০ সাল অবধি ফেলুদার গল্প ও উপন্যাসের জন্য বহু ছবি এঁকেছিলেন, যার অনেকগুলি স্থানাভাবে বইয়ে জায়গা পায়নি। সেই অগ্রন্থিত সব ইলাসট্রেশন নিয়েই তৈরি হয়েছে এই ধারাবাহিক অ্যালবাম। এ-ছাড়া, বইতে ধরানোর জন্য যে-সব ছবি কিছুটা ক্রপ করা বা ছাঁটা হয়েছিল, সে-সব ছবিরও গোটা চেহারাটা এখানে দেওয়া থাকল। এই সংগ্রহে আটটি উপন্যাসের ইলাসট্রেশন তোমরা পাবে না। 'সোনার কেল্লা', 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' ও 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর সব ছবিই বইতে ব্যবহার করা হয়েছে। 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ', 'এবার কান্ড কেদারনাথে', 'ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর' ও 'শকুন্তলার কণ্ঠহার' যখন প্রথম বেরোয়, তখন তার ছবি এঁকেছিলেন সমীর সরকার। ফেলুদার শেষ উপন্যাস 'রবার্টসনের রুবি'-র শিল্পী ছিলেন সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।

ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি। হেড-পিস
(সন্দেশ। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ১৩৭২)

ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি। 'বিদ্যুতের আলোয় আমার মুখের ঠিক সামনে—!' (সন্দেশ। মাঘ ১৩৭২)

বাদশাহী আংটি। হেড-পিস (সন্দেশ। বৈশাখ—চৈত্র ১৩৭৩, বৈশাখ ১৩৭৪)

সত্যজিৎ রায়

ধারাবাহিক

রহস্য উপন্যাস

বাদশাহী আংটি

বাদশাহী আংটি। 'একটা চোখ ঝলসানো ঝিলিক খেলে গেলো'
(সন্দেশ। বৈশাখ ১৩৭৩)
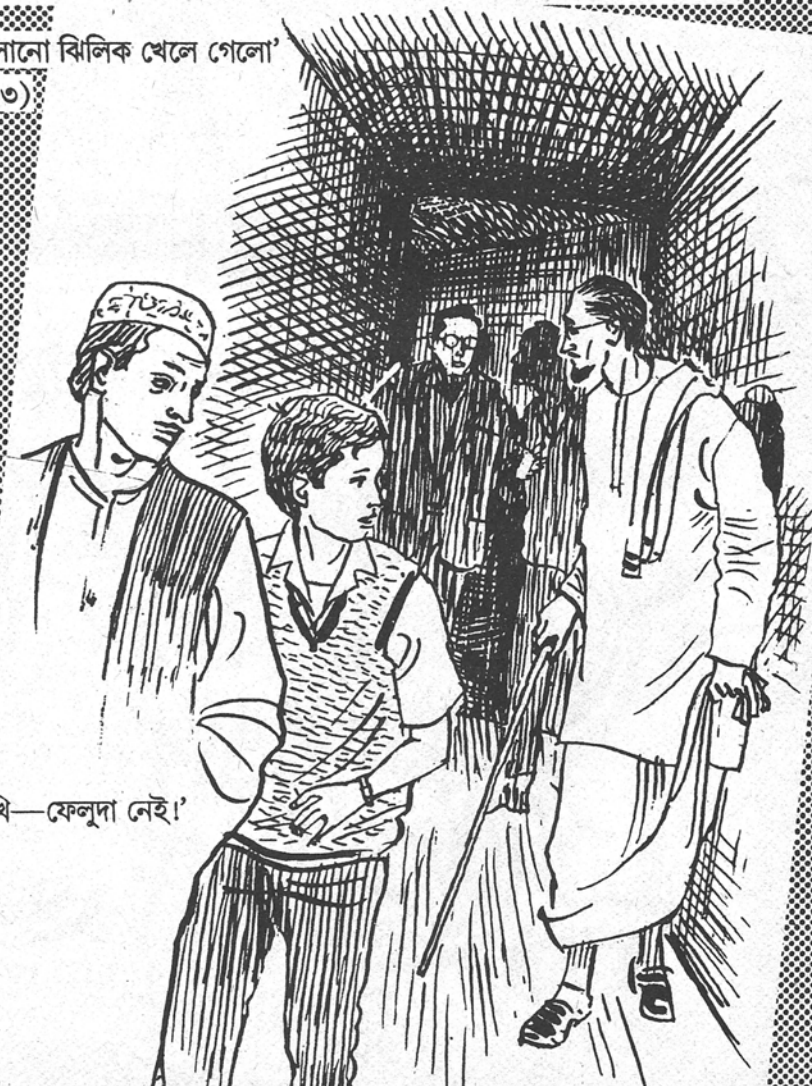
বাদশাহী আংটি। 'পিছন ফিরে দেখি—ফেলুদা নেই!'
(সন্দেশ। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩)
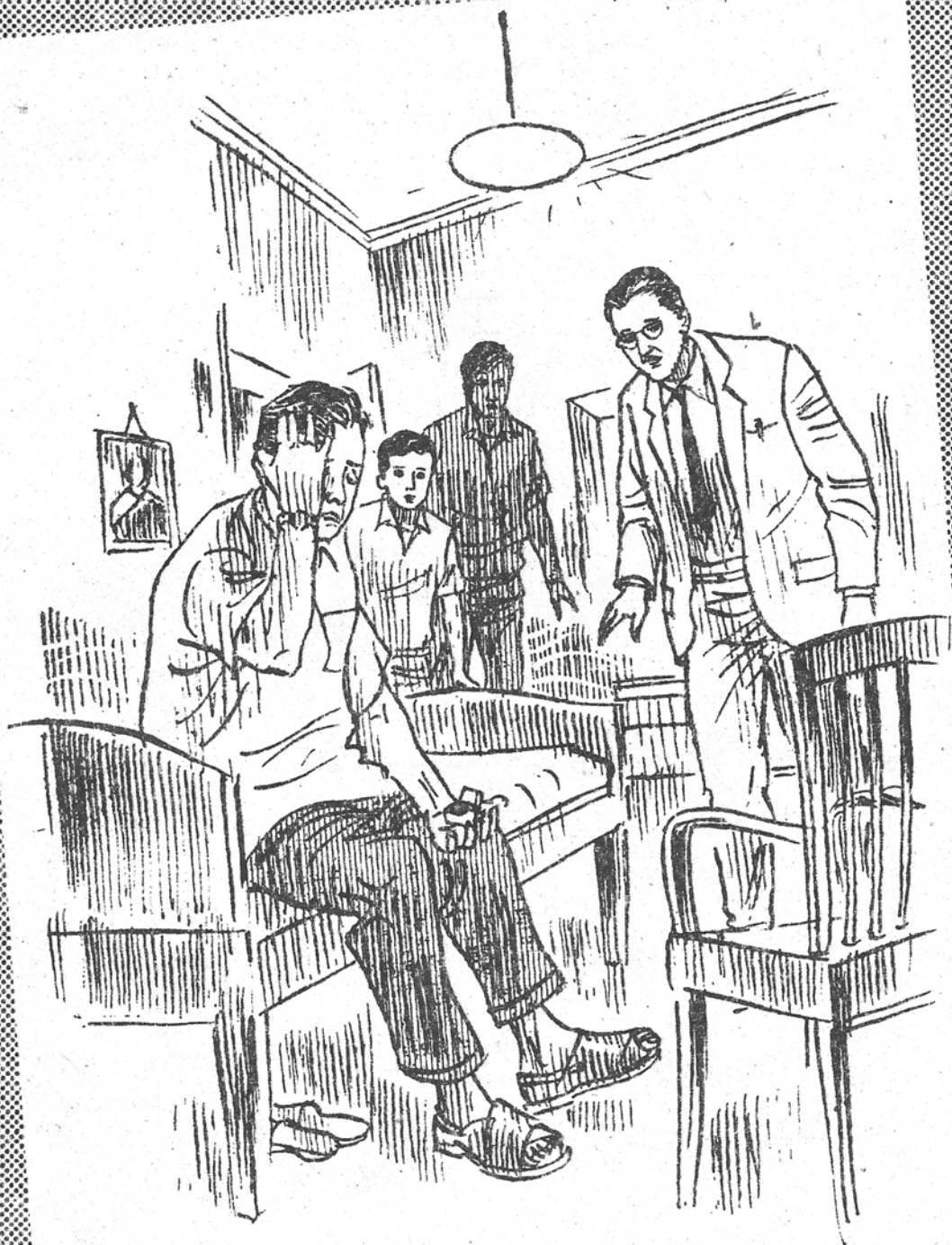
বাদশাহী আংটি। 'ধীরুকাকা ধপ করে বিছানায় বসে পড়লেন' (সন্দেশ। আষাঢ় ১৩৭৩)

বাদশাহী আংটি। 'ফেলুদা একলাফে চলন্ত টাঙ্গা থেকে নেমে ছুটে গেল।' (সন্দেশ। শ্রাবণ ১৩৭৩)
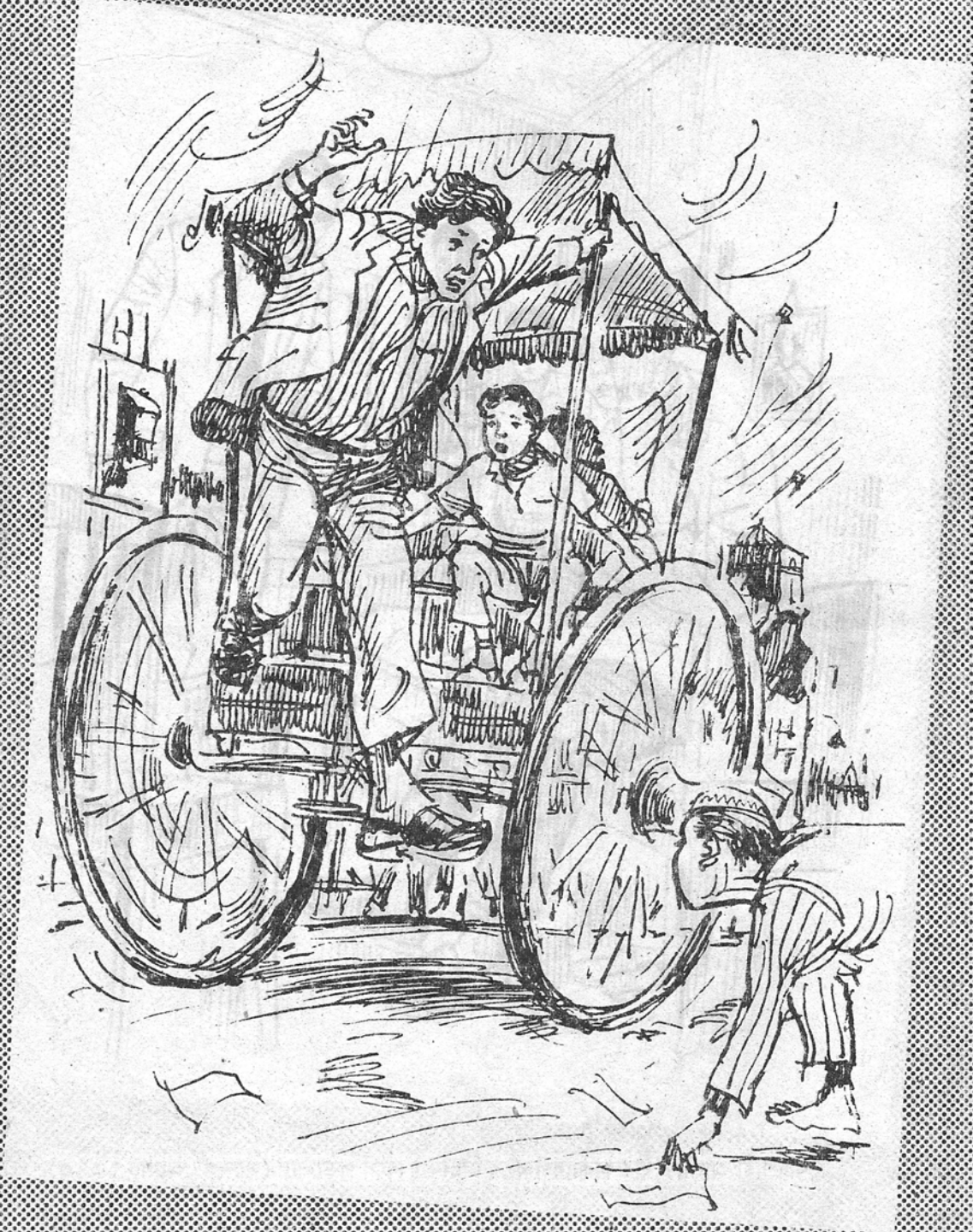
বাদশাহী আংটি। 'একটা হ্যাঁচকা টানে ফেলুদাকে টেনে নিলেন।' (সন্দেশ। শারদীয়া ১৩৭৩)

বাদশাহী আংটি। 'পানের ডগা দিয়ে লেখা...' (সন্দেশ। অগ্রহায়ণ ১৩৭৩)

বাদশাহী আংটি। 'এসো ফেলুচন্দ্র তপেশচন্দ্র, ভেতরে গিয়ে বসা যাক।' (সন্দেশ। চৈত্র ১৩৭৩)

বাদশাহী আংটি (সন্দেশ। বৈশাখ ১৩৭৪)

কৈলাস চৌধুরীর পাথর (সন্দেশ। শারদীয়া ১৩৭৪)
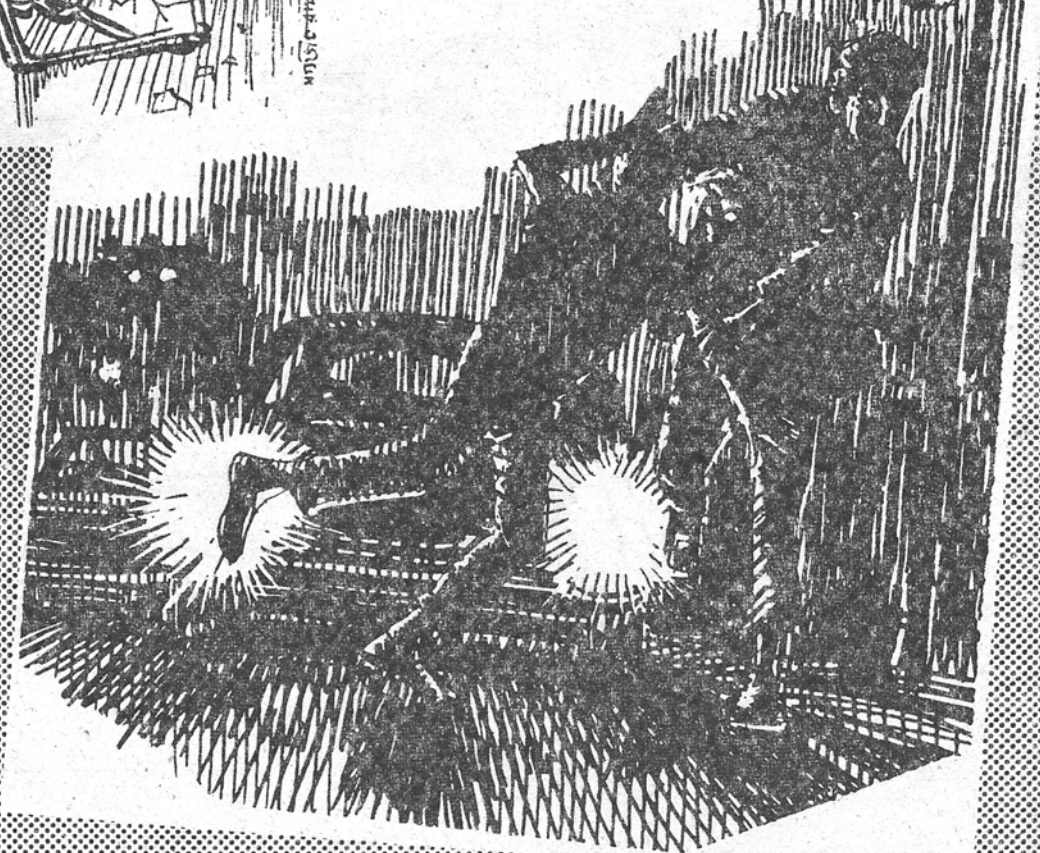
শেয়াল-দেবতা রহস্য (সন্দেশ। গ্রীষ্ম সংখ্যা ১৩৭৭)

ক্রমশ

ফেলুদার গোয়েন্দাগিরির ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে

'ফেলুদা কেন ফেলুদা' ডবল প্রতিযোগিতা

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে, বঙ্গাব্দ ১৩৭২-এর অগ্রহায়ণ মাসে সত্যজিৎ রায়ের লেখা গোয়েন্দা ফেলুদার প্রথম রহস্য অ্যাডভেঞ্চার 'ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি'র প্রথম কিস্তি ছাপা হয়েছিল 'সন্দেশ'-এ। প্রদোষচন্দ্র মিত্তির ওরফে ফেলুদার বে-পরোয়া গোয়েন্দাগিরির ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে 'রায়মঙ্গল' এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে 'সন্দেশী'দের জন্য। এবারের পুজো সংখ্যায় এই খবর বেরোবার পর অজস্র লেখা আসছে। তবু তোমাদের অনেকেরি অনুরোধে প্রতিযোগিতার সময় বাড়ানো হলো।

বাংলা সাহিত্যের সব গোয়েন্দাকে ছাপিয়ে, ফেলুদা কেন সেরা, ফেলুদা কেন সবচাইতে জনপ্রিয়, 'ফেলুদা কেন ফেলুদা'—এই নিয়ে ডবল প্রতিযোগিতা। 'ফেলুদা কেন ফেলুদা' লিখে পাঠাও— গদ্যে এবং ছড়ায়। ও হ্যাঁ, তোপ্‌সে আর লালমোহনবাবুর কথাও লিখতে ভুলো না!

'ফেলুদা কেন ফেলুদা' গদ্য প্রতিযোগিতা

'ক' বিভাগে (যাদের বয়স ১২ বছরের মধ্যে) তোমাদের লেখা যেন পাঁচশো শব্দের বেশি না-হয়।
'খ' বিভাগে (যাদের বয়স ১২র বেশি কিন্তু ১৭র বেশি নয়) তোমাদের লেখা দেড় হাজার শব্দের মধ্যে হতে হবে।

'ফেলুদা কেন ফেলুদা' ছড়া প্রতিযোগিতা

'ক' এবং 'খ' দুই বিভাগেই ছড়াটা কুড়ি লাইনের বেশি হলে চলবে না।

✻ নিয়মাবলী ✻

- ১৭ বছরের কমবয়সি 'সন্দেশ'-এর সব গ্রাহক/পাঠকরাই যোগ দিতে পারবে।
- নাম, ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখবে। গ্রাহকরা গ্রাহক নম্বর জুড়ে দিও।
- ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬-এর মধ্যে তোমাদের লেখা 'সন্দেশ'-এর আপিসে পৌঁছনো চাই।
- একই গ্রাহক/পাঠক দুটো প্রতিযোগিতাতেই যোগ দিতে পারবে।
- লেখা পাঠাবার সময় খামের ওপর লিখতে ভুলো না— *'ফেলুদা কেন ফেলুদা' ডবল প্রতিযোগিতা।*
- সেরা লেখা বাছাই করবেন 'সন্দেশ'-এর সম্পাদকরা।
- প্রতিযোগিতার ফলাফল 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত হবে।

❑ পুরস্কার ❑

'ফেলুদা কেন ফেলুদা' ডবল প্রতিযোগিতার ছড়া ও গদ্য লেখা দুই বিষয়েই, 'ক' ও 'খ' দুই বিভাগেই, তিনটে করে পুরস্কার। ১ম পুরস্কার ৫০০ টাকা। ২য় পুরস্কার ৩০০ টাকা। ৩য় পুরস্কার ২০০ টাকা। এই বারোটা পুরস্কার ছাড়াও যাদের লেখা খুব ভালো হবে, তাঁরাও বিশেষ পুরস্কার পাবে। পুরস্কার বিতরণ হবে ১৯৯৬ সালের ২ মে, ফেলুদার স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ের ৭৫ বছরের জন্মদিনে, 'রায়মঙ্গল' নিবেদিত 'সত্যজিৎ-স্মরণ' উৎসবে।

রায়মঙ্গল

CONTRACT.ITC.431.95 BEN R

একটি আকস্মিক সাক্ষাৎকার

বিভাস চক্রবর্তী

আমার দেখেই কীরকম যেন সন্দেহ হয়েছিল। যদিও আগের চেহারা, আমাদের দেখা সেই চেহারা বা পোশাকের সঙ্গে কোনো মিলই নেই। বিরল কেশ, দুই নাকের পাশ দিয়ে গভীর রেখা নেমে এসেছে থুতনির দু'পাশে। জুলপি এবং চুলের সংযোগস্থলে বেশ পাক ধরেছে। গলার চামড়ায় কুঞ্চন। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। আলিগড়ি পাজামার সঙ্গে হাফ-হাতা এলামাটি রঙের খাদির পাঞ্জাবি। পায়ে কেডস্ জুতো।

বাঁকুড়ার ছান্দার গ্রামে গিয়েছিলুম উৎপল চক্রবর্তীর আমন্ত্রণে। গ্রামীন সংস্কৃতি কারুশিল্পের একটি অসাধারণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন তিনি। দুর্গাপুরে ট্রেন থেকে নেমে গাড়িতে করে পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। পরদিন ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে পড়লাম আশেপাশের সাঁওতাল পল্লীতে। 'টুওয়ার্ডস এ সান্তালী থিয়েটার' এই শিরোনামে একটা প্রজেক্ট তৈরি করছিলাম তখন। তাই সুযোগ পেলেই হানা দিই ওদের গ্রামে।

গ্রামটা খুব ঝক্‌মকে তক্‌তকে। মেটে রাস্তা, মেটে বাড়ি, কিন্তু নিকোনো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মেয়েরা ঘরের কাজ করছে। কিছু অলস বয়স্ক লোক এখানে ওখানে বসে জটলা করছে, ধূমপান করছে, একটা কুঁড়ের দাওয়ায় কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়েকে নিয়ে রকে বসে মধ্যবয়স্ক অ-সাঁওতাল ভদ্রলোক কী যেন পড়াচ্ছেন।

প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। কিন্তু কাছে থেকেই কীরকম যেন চেনা ঠেকল। কিন্তু এইখানে, এই পরিবেশে? বিশ্বাস করতে মন চাইল না। তবুও জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতাম?'

ভদ্রলোক স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'পড়ানোটা শেষ হয়ে যাক, আমিই আপনাকে ডেকে নেবো। এর মধ্যে গ্রামটা ঘুরে দেখুন। ছোট গ্রাম, কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং।'

'আপনিই কি...?'

'যা ভেবেছেন তাই। প্রদোষচন্দ্র মিত্র।'

'ফেলুদা?'

'এখন না-হয় ওই নামটা আর না-ই বললেন।' ভদ্রলোকের কণ্ঠে যেন বিষাদমাখা উদাসীনতা।

আমি জিজ্ঞেস করি, 'কেন বলুন তো?'

'সে অযোধ্যাও নেই, আর রামও নেই—'

'আপনি কি বাবরি মসজিদের কথা বলছেন?'

'না-না, তা নয়। বলছি মানিকদাও নেই, তাই ফেলুদাও নেই।'

ভদ্রলোকের বিষাদের কারণ এবার বুঝতে পারি। কথাবার্তায় অন্য প্রসঙ্গ খুঁজি।

'আপনি এখানে কেন? কবে থেকে? আপনি কি গোয়েন্দাগিরি থেকে রিটায়ার করেছেন?'

ভদ্রলোক হেসে ফেলেন এবার, 'দাঁড়ান, এতগুলো প্রশ্নের ধাক্কা সামলে নিই। দেখুন, আমি এখানে আজকে আসিনি। গত পনেরো বছর যাবৎ এখানে ডেরা বেঁধেছি। গ্রামের লোকজনকে নিয়েই থাকি। আমার জানা বিদ্যে কিছু ওদের বোঝাই, আবার ওদের কাছ থেকেও অনেক শিখি। না, কোনো প্রজেক্ট-টজেক্টের ধান্দায় নয়। ভালো লাগে, দরকার মনে হয়, তাই।'

হঠাৎ প্রশ্ন করে বসি, 'সত্যজিৎবাবুর শেষ ছবি 'আগন্তুক' দেখেছেন?'

ভদ্রলোক— এবার থেকে ফেলুদা নামেই ডাকা যাক ওঁকে— চোখ দুটো ছোট করে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'বুঝতে পারছি কী বলতে চাইছেন। হ্যাঁ, মানিকদা মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। অনেকটা সময় কাটিয়ে যেতেন এখানকার সাঁওতালদের সঙ্গে। বলতেন, এদের কথা বলতে হবে ছবিতে। ...সেই ছবিই যে তাঁর...।' কথা শেষ না-করেই উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সামনের মাঠটার দিকে।

আমি এবার আমার খটকার কথা বলি। 'পনেরো বছর আপনি এখানে, অথচ আপনার গোয়েন্দাগিরির কেসগুলো সত্যজিৎবাবু কোত্থেকে পাচ্ছিলেন? একেবারে কারেন্ট কেসগুলো?'

'কারেন্ট আপনাকে কে বলল। ওই ভুলটা অনেকেই করেন। আমার সব কেসগুলো পনেরো বছরের বেশি পুরনো। ওগুলো তোপ্‌সে, অর্থাৎ আমার

খুড়তুতো ভাই ডাইরিতে নোট্‌ করে রাখত। সবগুলো মানিকদার হাতে তুলে দেয়।'

'তোপ্‌সে, মানে তপেশবাবু এখন কোথায়?'

'অ্যামিরিকায়। নাসায় কাজ করছেন।'

আমি চমকিত ও চমৎকৃত হই 'জটায়ু? মানে লালমোহনবাবু?'

উত্তর শুনে আরো চমকাই, 'তিনি তো শয্যাশায়ী। প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা, ওঁর জমানো সব টাকাটা খরচ করে উনি একটা হিন্দি ছবি প্রোডিউস করেন। নিজের গল্প নিয়ে ছবি করার ইচ্ছে ওঁর বহুদিনের। ওটার নাম ছিল 'মওত কা সওদাগর'। উনপঞ্চাশ'টা কপি রিলিজ করেছিল। তিন দিনে উঠে যায়। সেই শকে...'। ফেলুদার চোখের কোন চিক্‌ চিক্‌ করে ওঠে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি। আমারও কেন জানি ভেতরটা টন্‌টন্‌ করে উঠল। সহজ হবার চেষ্টা করে বলি, 'আপনার কোনো কেসই কি আমরা পড়তে পাবো না?'

'হয়ত তাই। ওইরকম সুন্দর ভাষায় লিখবে কে? তোপ্‌সে তো শুধু নোট্‌ করে রাখত, ভাষাটা তো সবটাই মানিকদার।'

'আপনার সব কেসই কি সত্যজিৎবাবুর কাছে জমা? তার সবগুলো বেরিয়ে গেছে?'

'প্রায় সবগুলো। দু-একটা হয়ত পড়ে আছে এখনো।' এ পর্যন্ত বলে খানিকটা থামলেন ফেলুদা, তারপর বললে, 'তাহলে আপনাকে একটা গোপন কথা বলি। সব কেসে তো আমার সঙ্গে তোপ্‌সে থাকতো না। স্কুল-কলেজের জন্য ও-সব সময় আমার সঙ্গে থাকতে পারতো না। দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত কেসে নারীঘটিত খুন বা অপরাধ থাকতো, সেখানে ওকে সঙ্গে রাখতাম না। এরকম অন্তত তেত্রিশটা কেস আমার ডাইরিতে নোট করা আছে।'

আমার কৌতুহল বাগ মানে না, 'তাহলে সেগুলোর কী হবে? আপনি নিজে লিখবেন, নাকি অন্য কাউকে...?'

'কী হবে এগুলো বের করে?' আমার উৎসাহে জল ঢেলে দিলেন ফেলুদা। 'এতে কি অপরাধ— খুন রাহাজানি, জোচ্চুরি কমবে কিছু? মনে তো হয় না। দিন দিন তো বেড়েই চলেছে। বাড়ির পর বাড়ি ভেঙ্গে পড়ছে। হাজার কোটি টাকার জালিয়াতি করেও পার পেয়ে যাচ্ছে, ঘুষ নিয়ে দেশের সম্পদ নামমাত্র মূল্যে বেচে দিচ্ছে ব্যবসায়ীদের কাছে। ছোটখাটো খুনী-গুণ্ডাদের কথা ফলাও করে লেখা মানে তো এদের আড়াল করা! যদি কোনদিন পারি...

ফেলুদার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। হাত দুটো পাঞ্জাবীর পকেটে নিয়ে দু'ধারে টান করে ধরলেন। না, বোঝা গেল ফেলুদার পকেটে কোল্ট-৩২ রিভলভারটি নেই। চারমিনারের প্যাকেটও নেই।

দু'জনে খানিকক্ষণ চুপচাপ। একটি সাঁওতাল রমনী দু'কাপ চা দিয়ে গেল। সঙ্গে কয়েকটি লেড়ে বিস্কুট। চা খেতে খেতে আবার প্রশ্ন করি, 'এই জীবন কীরকম লাগছে?'

ফেলুদার মুখটা আবার স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে গেল, 'ভালোই তো। বুঝতে পারি, কেন বিদ্যাসাগর কারমাটরে বাসা বেঁধেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তি খুঁজেছিলেন বীরভূমে, আর 'আগন্তুক'-এ? মামা বোধ হয় মানিকদারই অলটার ইগো।'

সাক্ষাৎকার এখানেই শেষ।

বিদায়ের আগে প্রশ্ন, 'ফেলুদার তিন দশক উপলক্ষ্যে 'সন্দেশ'-এর বিশেষ সংখ্যা বেরোচ্ছে, তাতে কি আপনার সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের কথা লিখব?'

সংক্ষিপ্ত উত্তর 'কী হবে!'

নামমাহাত্ম্য
ফেলুদা উৎসবের আগে একটা মজাদার মুখোশ তৈরি করি।
খট্‌··খট্‌
এখন আবার কে এলো!
খবর নিয়েছি, ছেলেটা একা আছে!
মুখোশটা পরে নিই।
সর্বনাশ, ফেলু মিত্তির বেঁচে আছে!
পালাও··

খসড়া খাতায় ফেলুদা

সন্দীপ রায়

ভারি বিপদে পড়লাম। 'সন্দেশ'-এর এই বিশেষ সংখ্যায় ফেলুদাকে নিয়ে এতজনে লিখছেন, যে বিষয়ের মিল হয়ে যাবার একটা আশঙ্কা থাকে। এখন এই সমস্যাকে এড়ানো যায় কীভাবে? অগত্যা সব থেকে নিরাপদ রাস্তাটাই বেছে নিলাম — ফিরে গেলাম বাবার খসড়া খাতায়। এ-খাতা কিন্তু ওঁর বিখ্যাত লাল খেরোর কাপড় দিয়ে বাঁধানো ফিল্মের খাতা নয় — পার্ক স্ট্রিটের অক্সফোর্ড বুক কোম্পানি থেকে কেনা হার্ড কভারের খাতা—যার উপর সোনার জল দিয়ে ছোট্ট করে লেখা: 'নোট্‌স'। ১৯৬১ সাল, অর্থাৎ, নতুন 'সন্দেশ'-এর প্রথম বছর থেকে এই খাতা কেনা শুরু হয়, এবং সেই অভ্যাস বজায় থাকে ১৯৯১ অবধি। এই তিরিশ বছরের প্রায় ৭০-৮০টা খাতা থেকে ফেলুদাকে নিয়ে যে কত অজানা তথ্য বেরিয়ে এলো, তার ইয়ত্তা নেই। সেই-সব কিছু তথ্যের কথাই আজ তোমাদের বলব।

১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ — এই চার বছরের কোনো খাতাতেই ফেলুদার নাম-গন্ধটি নেই। তারপর হঠাৎই, ১৯৬৫তে, খাতার একেবারে তৃতীয় পাতায় 'ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি' শুরু হয়ে গেছে। প্রথম পাতায় শুধু ইংরিজিতে লেখা বাবার সই ও সাল। এক নতুন চরিত্রের জন্মের আগে, একজন লেখক সাধারণত যে-সব প্রাথমিক খসড়া করে থাকেন, উনি তা কিছুই করেননি। গত চার বছরে লেখা অন্যান্য গল্পের মতো সরাসরি আরম্ভ করে দিয়েছেন। ফেলুদাকে নিয়ে যে একটা জবরদস্ত, সাড়া-জাগানো সিরিজ হতে পারে, সেই চিন্তা কিন্তু তখনও তাঁর মাথায় আসেনি। ২৭ পাতার ঝরঝরে খসড়াটি শেষ করেই ধরেছেন 'আশ্চর্য' পত্রিকার জন্য কল্প-বিজ্ঞানের গল্প 'ময়ূরকণ্ঠী জেলি'। এ-ছাড়া ওঁর প্রথম প্রকাশিত বই 'প্রোফেসর শঙ্কু'র প্রচ্ছদের কিছু এলোমেলো নক্‌শাও এঁকেছেন।

ফেলুদা যে হিট্‌, সেটা অবিশ্যি তার পরের বছরের খাতা দেখলেই বোঝা যায়। প্রায় এক নিঃশ্বাসে লিখে ফেলেছেন বারোটা কিস্তিতে ভাগ করা 'বাদশাহী আংটি'। তবে ১৯৬৯ অবধি ফেলুদার গল্পে বা উপন্যাসে কোনো তারিখ নেই, খালি খাতার প্রথম পাতায় যথারীতি বাবার সই ও সালটা লেখা। যদিও 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' লেখার শুরুর তারিখটা উনি দিয়েছিলেন, কিন্তু কবে লেখা শেষ করলেন, সেটা দেননি। তবে ১৯৭২ সাল থেকে উনি ফেলুদার অধিকাংশ লেখাতেই দুটো তারিখই দিতে আরম্ভ করেন। এবার পরের পাতার

	নাম	প্রথম খসড়ার নাম	রচনাকাল	ক'দিনে লেখা
১	ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি		১৯৬৫	
২	বাদশাহী আংটি		১৯৬৬	
৩	কৈলাস চৌধুরীর পাথর		১৯৬৭	
৪	শেয়াল-দেবতা রহস্য	ফেলুদা ও আনুবিস রহস্য/আনুবিস রহস্য	১৯৬৯	
৫	গ্যাংটকে গণ্ডগোল	গ্যাংটকে ফেলুদা	১৭.৬.৭০—?	
৬	সোনার কেল্লা		১৯৭১	
৭	বাক্স-রহস্য		৭.৬.৭২—১৭.৬.৭২	১১
৮	সমাদ্দারের চাবি		১৪.৬.৭৩—১৬.৬.৭৩	৩
৯	কৈলাসে কেলেঙ্কারি	কৈলাস রহস্য	১৫.৭.৭৩—২৭.৭.৭৩	১৩
১০	রয়েল বেঙ্গল রহস্য	ফেলুদার অরণ্যকাণ্ড/যেখানে বাঘের ভয়	১৮.৫.৭৪—?	
১১	জয় বাবা ফেলুনাথ	কাশীধামে ফেলুদা	৭.৬.৭৫—২১.৬.৭৫	১৫
১২	ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা	তোতা রহস্য	১৫.৮.৭৫—১৬.৮.৭৫	২
১৩	বোম্বাইয়ের বোম্বেটে		?—২১.৭.৭৬	
১৪	গোঁসাইপুর সরগরম	গোঁসাইপুরের ঠগী	১১.৮.৭৬—১৩.৮.৭৬	৩
১৫	গোরস্থানে সাবধান!	সাবধান গোরস্থান	২৭.৮.৭৭—১.৯.৭৭	৬
১৬	ছিন্নমস্তার অভিশাপ		৮.৮.৭৮—?	
১৭	হত্যাপুরী		১৯.৭.৭৯—২০.৮.৭৯	৩৩
১৮	গোলকধাম রহস্য	প্রফেসর দাশগুপ্তের ফরমুলা	১৯.৪.৮০—২৭.৪.৮০	৯
১৯	যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে		৫.৭.৮০—২৬.৭.৮০	২২
২০	নেপোলিয়নের চিঠি		২৪.৭.৮১—২৯.৭.৮১	৬
২১	টিনটোরেটোর যীশু		৫.৪.৮২—১১.৪.৮২	৭
২২	অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য		৪.২.৮৩—৬.২.৮৩	৩
২৩	জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা	নন্দন কানন রহস্য	২১.৬.৮৩—২৪.৬.৮৩	৪
২৪	এবার কাণ্ড কেদারনাথে	কেদারদা', বদ্রিদা' আর ফেলুদা	৬.১১.৮৩, ১৪—২৩.১১.৮৩	১১
২৫	বোসপুকুরে খুনখারাপি	বোসপুকুরের মামলা/ফেলুদা করল ফাঁস	৭.৫.৮৫ —১০.৫.৮৫	৪
২৬	দার্জিলিং জমজমাট	হিল স্টেশনে হত্যাকাণ্ড	১৮.২.৮৬—২৩.২.৮৬	৬
২৭	ভূস্বর্গ ভয়ংকর		৩১.৩.৮৭—৩.৪.৮৭	৪
২৮	ইন্দ্রজাল রহস্য		২২.৪.৮৭—২৬.৪.৮৭	৫
২৯	অপ্সরা থিয়েটারের মামলা	অপ্সরা মঞ্চের মামলা	৫.৫.৮৭—৭.৫.৮৭	৩
৩০	শকুন্তলার কণ্ঠহার	কণ্ঠহার রহস্য	১৩.১.৮৮—১৫.১.৮৮	৩
৩১	ডাঃ মুনসীর ডায়রি	ডাঃ নন্দীর ডায়রি	১৯.৬.৮৯—২৩.৬.৮৯	৫
৩২	গোলাপী মুক্তা রহস্য	গোলাপী মুক্তার মামলা	২৩.৬.৮৯—২৬.৬.৮৯	৪
৩৩	লন্ডনে ফেলুদা		২৭.৬.৮৯—২৯.৬.৮৯	৩
৩৪	নয়ন রহস্য		২০.৩.৯০—২৫.৩.৯০	৬
৩৫	রবার্টসনের রুবি		২১.৫.৯১— ?	

ছক্‌টা দেখে ফেলুদার কোন্ লেখা কবে লেখা হয়েছে, বা কত দিনে লেখা হয়েছে, সেটা জেনে নিতে পারো।

এতে দেখা যাচ্ছে—দুই থেকে পাঁচ দিনে গল্প লেখা হচ্ছে, তিন থেকে ন'য়ে নভেলেট, আর ছয় থেকে তেত্রিশে উপন্যাস। গোড়ার দিকে বছরে একটা, কিন্তু পরে চাহিদা বেড়ে যাওয়ার ফলে দুটো, এমনকি তিনটে করেও ফেলুদা লিখতে হয়েছে বাবাকে। আর এটাও ভুলে গেলে চলবে না, যে, এই-সব লেখার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ফিল্মও তুলে যাচ্ছেন! তবে রেকর্ড করলেন ১৯৮৯ সালে। শুধু জুন মাসেই একটানা ১১দিন লিখে শেষ করলেন তিন-তিনটে ফেলুদা কাহিনী—'ডাঃ মুনসীর ডায়রি', 'গোলাপী মুক্তা রহস্য' ও 'লন্ডনে ফেলুদা'।

'কৈলাস রহস্য' নামে বাবা একটা ফেলুদা-উপন্যাস শুরু করেন ১৯৭২ সালের ৬ই জুন। মাত্র তিন পাতা লিখে তাঁর হঠাৎ একটা নতুন প্লট মাথায় আসে। ফলে, 'কৈলাস...'কে ধামা-চাপা দিয়ে, পরদিনই খাতাটা উল্টে চালু হয়ে যায় 'বাক্স-রহস্য'। কিন্তু তার ঠিক এক বছর বাদে, তিনি আবার সেই তিন পাতার আইডিয়াতে ফিরে আসেন। তখন অবিশ্যি নাম পাল্টে সেটা 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' হয়ে গেছে।

বাবা যখন খসড়া থেকে ফুলস্ক্যাপ কাগজে ফাইনাল কপি করতেন, তখনও নানারকম অদল-বদল হতো। যেমন 'হত্যাপুরী' ও 'টিনটোরেটোর যীশু'র প্রথম খসড়ায় যথাক্রমে 'ডুংরুর কথা' ও 'রুদ্রশেখরের কথা (১)' উনি লেখেননি—সোজা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে গল্প শুরু করেছেন। 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি'র কথাই ধরা যাক্। প্রকাশিত অবস্থায় এই উপন্যাসের প্রথম দু'টি বাক্য হল—'জুন মাসের মাঝামাঝি। স্কুল ফাইনাল দিয়ে
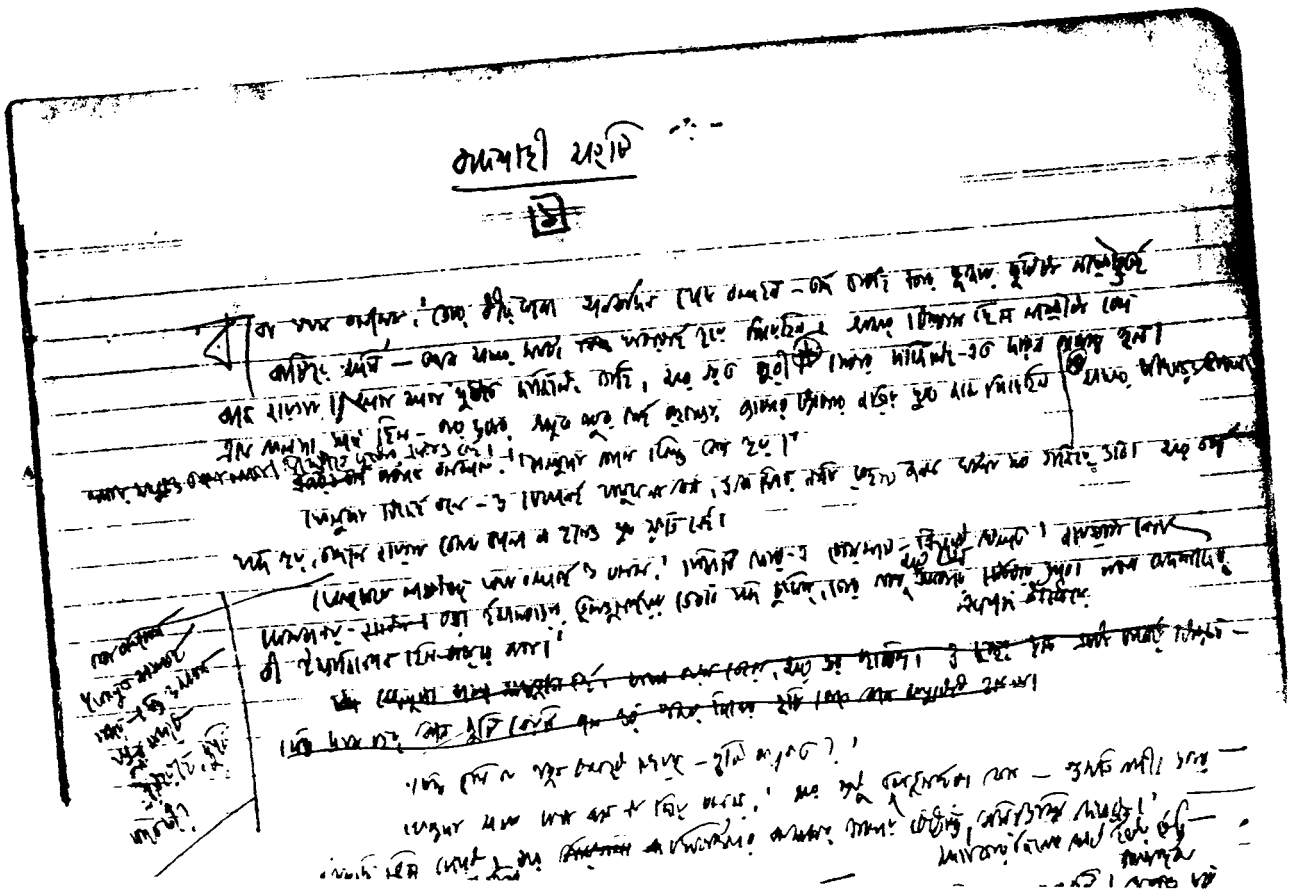
বসে আছি, রেজাল্ট কবে বেরোবে জানি না।' কিন্তু খসড়ায় সে-উপন্যাস শুরু হচ্ছে একেবারে সিধুজ্যাঠার উক্তি দিয়ে, যা বইতে আসছে তিন নম্বর পাতার গোড়ায়—'মানুষ খুন ত আকচার হচ্ছে ; তার চেয়েও সাংঘাতিক খুন কী জান?'

'কৈলাসে কেলেঙ্কারি'র এই ১১২ পাতার খসড়াটা লিখতে বাবার ন'দিন সময় লেগেছিল। কিন্তু তার মাঝখানে যে উনি চারদিন ধরে সাইনাস রোগে ভুগেছিলেন, তারও উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে শেষ পাতায়।
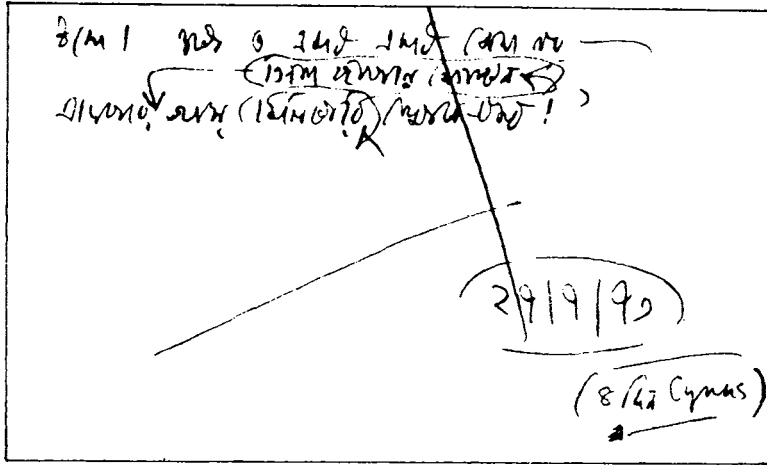
এভাবেই খুঁজতে খুঁজতে ১৯৮৭ সালের একটা খাতা থেকে বেরিয়ে পড়ল 'ইন্দ্রজাল রহস্য'। ছোটগল্প 'গণেশ মুৎসুদ্দির পোর্ট্রেট' আর ফেলুদার 'অপ্সরা থিয়েটারের মামলা'র মাঝখানে ২৬ পাতার এই সম্পূর্ণ লেখাটা দেখে ত আমি অবাক! চাপা উত্তেজনা নিয়ে এক নিমেষে লেখাটা পড়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হলাম। না, এর সঙ্গে অন্য ফেলুদা-গল্পের কোনো মিলই নেই। অথচ, যেখানে 'অপ্সরা থিয়েটারের মামলা' প্রকাশিত হল, সেখানে তার ঠিক আগে লেখা 'ইন্দ্রজাল রহস্য' বাদ পড়ল কেন? রহস্যই বটে!

এ-ছাড়াও বেরুলো এন্তার অসমাপ্ত ফেলুদা-গল্পের খসড়া—যার থেকে একটা এবার শারদীয়া 'সন্দেশ'-এ বেরিয়েছে। বাকিগুলো যে কয়েক মাসের মধ্যেই পাবে, তা বলাই বাহুল্য!

ফেলুদার লেখার এক বাড়তি আকর্ষণ যে দেশ-ভ্রমণ, সেটা তোমরা সকলেই মানবে। ফেলুদার যাওয়া সব জায়গাতেই বাবা কোনো-না-কোনো সময় গেছেন। এর মধ্যে দার্জিলিং ওঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কাজেই, তাঁর প্রথম মৌলিক চিত্রনাট্য 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' আর প্রথম ফেলুদার গল্পের ঘটনা যে দার্জিলিং শহরেই ঘটবে, তাতে আর আশ্চর্য কী?

দার্জিলিং ছাড়াও, প্রতি বছর পুজোর ছুটিতে আমাদের পুরী যাওয়াটা ছিল বাঁধা। যার ফল অবশ্যই 'হত্যাপুরী'। আর বাবার ছেলেবেলায় ঘোরা লখ্‌নৌ ও কাশ্মীরের স্মৃতি থেকেই লেখা হয়েছে 'বাদশাহী আংটি' ও 'ভূস্বর্গ ভয়ংকর'। ১৯৮২তে বাবা-মা ফিলিপাইন্‌স দ্বীপপুঞ্জের প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে ম্যানিলা শহরে আমন্ত্রিত হন। যাবার পথে তাঁরা একদিন হংকং-এ ছিলেন। যদিও সে-শহর বাবার আগেই দেখা, কিন্তু এবারের জাঁকজমক তাঁর চোখ ঝল্‌সে দিলো। ফেলুদাকে তাই আর শুধু ভারতবর্ষ-

নেপালে আটকে রাখা গেল না—লেখা হল 'টিনটোরেটোর যীশু'। বিদেশের আরো দুটো জাঁদরেল শহর বাবাকে ভীষণ টানত—লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক। লন্ডনে ফেলুদা গেল ঠিকই, কিন্তু নিউ ইয়র্কে আর তার যাওয়া হয়ে উঠল না।

বাবার ফিল্মের জীবনও যে ফেলুদার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় বার বার। সিকিমের উপর এক তথ্যচিত্র করার পরেই লেখা হয় 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল'। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর সময় জয়সলমীরে তোলা হাল্লা রাজার দুর্গ হয়ে ওঠে 'সোনার কেল্লা'। সেই একই ছবিতে গুপী-বাঘা যখন 'ঝুণ্ডি !' বলে তালি মেরে বরফের দেশে পৌঁছে যায়, তার শুটিং হয় সিমলার কাছে কুফরি অঞ্চলে। সেই সিমলা, এবং বিশেষ করে কুফরিতে ঘটে যায় তিন বছর বাদে লেখা 'বাক্স-রহস্য'র দুর্ধর্ষ ক্লাইম্যাক্স। 'অপরাজিত' তুলতে গিয়ে বাবা বেনারস চষে ফেলেছিলেন, আর সেই অভিজ্ঞতাই তাঁকে সাহায্য করে 'জয় বাবা ফেলুনাথ' লিখতে। 'হীরক রাজার দেশে'র একটা দৃশ্য নিতে আমরা সকলে নেপাল যাই। কাঠমাণ্ডু থেকে কাক্‌নি নামের একটা জায়গায় গিয়ে, গুপী-বাঘাকে নিয়ে তোলা হয় 'এবারে দেখ গর্বিত বীর...' গানটি। তারপরেই কলকাতায় ফিরে ফেলুদার যে উপন্যাসটা বাবা লেখেন, তার নাম তোমরা সকলেই জানো। এমনকি, ফেলুদার শেষ লেখা 'রবার্টসনের রুবি'তেও বাবার ফিল্ম-জীবনের এক জায়গা ও এক ঘটনা পাওয়া যাবে। জায়গাটা হল দুবরাজপুরের মামা-ভাগ্নে পাহাড় ('অভিযান'), আর ঘটনাটা হল সাঁওতাল নাচের দৃশ্য ('আগন্তুক')।

১৯৮৩ সালের ১লা অক্টোবর বাবার প্রথম হার্ট-অ্যাটাক হয়; এবং সেই দিনই তিনি ভর্তি হয়ে যান বেল-ভিউ নার্সিং হোমে। ৭২ ঘন্টা কড়া নজরে রাখার পর, ডাক্তাররা মোটামুটি হাঁফ ছেড়ে জানান যে, এ-যাত্রার ফাঁড়াটা কেটেছে—তবে ঘরে এখনো তাঁকে নামানো হবে না, ইনটেন্‌সিভ কেয়ারেই থাকবেন। সেই বেল-ভিউতেই, ৬ই নভেম্বর বাবা শুরু করেন 'এবার কাণ্ড কেদারনাথে'। কিন্তু মাত্র একদিন লিখে, সাত দিনের বিরতি। তারপর ১৪ই থেকে একনাগাড়ে দশ দিন লিখে, নার্সিং হোমেই উপন্যাসটি শেষ করেন তিনি। আর সেই লেখার প্রথম খসড়ার যে নাম উনি দিয়েছিলেন, সেটা একমাত্র ওই অবস্থাতে ওঁর পক্ষেই দেওয়া সম্ভব—'কেদারদা', বদ্রিদা' আর ফেলুদা'!

ফেলুদার সঙ্গে বেড়ানো

উত্তম ঘোষ

সপ্ত অশ্বের রথে উদিত সূর্যদেব তার আলোকরশ্মি বিচ্ছুরণে সপ্তবর্ণে রঙিন করে তোলেন পৃথিবীটাকে। সেই দ্যুতিমালা 'প্রিজম'-এর মধ্যে দিয়ে যে প্রতিসরণ সৃষ্টি করে, তাতে দিক-দিগন্ত উদ্ভাসিত! সত্যাশ্রয়ী এক জয়ীসত্তা তার বিচিত্রতা কেবলমাত্র সেললুয়েড বা রঙ-তুলির মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেনি, বহু-রসে সঞ্জীবিত রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনীর জগৎকে এক আধুনিক ডাইমেনশন দান করেছে। যে পাঠক-কুল আর্থার কন্যান ডয়েল বা আগাথা ক্রিস্টিকে অভিনন্দন জানিয়েছে কিন্তু নিজের ঘরের মধ্যে খুঁজে পায়নি, ঘরের লেখককেও যখন রবার্ট ব্লেক তৈরি করতে হয়েছে এবং অবশেষে দস্যু মোহন ও রবিনহুডের মধ্যে মিল খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, তখন কীরিটি রায় এসে খানিকটা পরিচিত চেহারায় দেখা দিয়েছে। কিন্তু কীরিটি রায়ও তার 'ডিটাচড্ এন্টিটি' নিয়ে আমাদের আত্মীয় হয়ে ওঠেনি, তার পেশাদারি স্বাতন্ত্র তাকে আমাদের মনের ঘরে ঢুকতে দেয়নি। ব্যোমকেশ বক্সীও বেশ গম্ভীর ও সদা-সিরিয়াস। আমরা বাঙালি-পাঠক ক্ষুধার্ত ছিলাম ঐ ধরনের আকর্ষণীয় ভূমিকায় (শার্লক হোমস্-এর জয় হোক্!) আমাদের কাউকে দেখতে। বিশেষ পাচ্ছিলাম না।

হঠাৎ-ই, ১৯৬৫ সালে এলো ফেলুদা, ২৭ বছর বয়েস। নামটাই আমাদের ঘরোয়া ডাকে আপনত্ব এনে দেয়। প্রদোষের ছায়া-ছায়া অন্ধকার থেকে প্রদোষচন্দ্র মিত্র আলোতে এসে দাঁড়ালেই, ফেলুদাকে স্পষ্ট দেখা যায় — ছ'ফুট দু' ইঞ্চি দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, ক্রিকেট খেলোয়াড় — যাকে অপরাধীদেরও দুর্ধর্ষ ফিল্ডিং দিয়ে 'ক্যাচ' করতে হয়। পাশে পাশে তপেশরঞ্জনকে তাই 'তোপ্সে' হতে হয়, নইলে আমাদের মতো সাধারণরা অসাধারণের মধ্যে নিজেদের পাবো কী করে!

ফেলুদা, তোপ্সে, জটায়ু (লালমোহন গাঙ্গুলী) মিলে যে জগৎটা আমাদের দেখাল, সেটা আমাদেরই জগৎ। কিন্তু তার এত বিচিত্র রূপ, সেটা জানা ছিল না। কাহিনীর ছত্রে ছত্রে তাদেরই দেখি, যারা আমাদের আশেপাশেই আছে! কিন্তু তারা যে এমন, তা তো বুঝিনি!

অ্যাদ্দিন ধরে আমাদের অতি প্রিয় গোয়েন্দা-নায়ক ফেলু মিত্তির যা যা করে গেছে, তা যেন নতুন ধরনের 'ডিস্কভারি অব্ ইন্ডিয়া'। আজকের ভারত আবিষ্কার। জটিল, বিদগ্ধ, সূক্ষ্ম। আবার কী আশ্চর্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঝল্মল্! এমনকি মানুষের কাজ আর মানুষের মনের কাজ — অপরাধ ও অপরাধীর কূটলোকে, গহন অন্ধকারে মশাল নিয়ে তার পর্যটন!

হ্যাঁ, ফেলুদা এক অভিনব পর্যটক। এ ওয়াড়লি ট্রাভেলড ডিটেকটিভ। অ্যাডভোকেট রাজেন মজুমদারকে ভয় দেখাচ্ছে কে?... গোয়েন্দাগিরি শুরু দার্জিলিঙে। তারপর বাদশাহী আংটির খোঁজে লখ্নৌ। ভুল-ভুলাইয়াতে নয়, আংটি-চোর এক পশুপ্রেমিক (ছদ্মবেশী?) বনবিহারী সরকার— অপরাধের বনে যার বিহার। আমরা দেখতে থাকি তার অদ্ভুত নিজস্ব 'চিড়িয়াখানা' (ব্যোমকেশের মানুষ-চিড়িয়া এরা নয়), প্রকৃতই পশু-পাখি, কিন্তু 'অব্ রেয়ার ভ্যারাইটি'! আমাদের ছুটতে হলো হরিদ্বার এবং লছমনঝোলাতেও।

রহস্যের হাতছানি অন্তহীন। গণ্ডগোলের (প্রকৃতপক্ষে একটি খুনের) রহস্য অবসান করতে আমরা গেলাম গ্যাংটকে। তারপর 'রাজকাহিনী'র রাজস্থানে,

'সোনার কেল্লা' দেখতে। জাতিস্মর মুকুল বলেছিল সেই সোনার কেল্লার কথা — যার 'মাথায় কামান বসানো, সেখানে যুদ্ধ হচ্ছে, লোক মরছে।' সে নিজে পাগড়ি পরে, উটের পিঠে চড়ে, বালির ওপর বেড়াত। কনুইয়ের কাছে ঐ জন্মদাগটা নাকি আসলে এক ময়ূরের ঠোকরের দাগ!...এই সব ফ্যান্টাসি-কথার ন্যায্য ব্যাখ্যার জন্য প্যারাসাইকোলজিস্ট ডাক্তার হেমাঙ্গ হাজরা এলেন। গুণ্ডারা গুপ্তধনের লোভে রাজস্থান ধাওয়া করার বিষয়টা গোয়েন্দা ফেলুদার মনে, কিন্তু ভ্রমণ-প্রেমিক ট্যুরিস্ট ফেলুদার আত্মাকে পুষ্ট করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তোপ্‌সের আসল উৎসাহ — 'এই সুযোগে যদি পুজোয় রাজস্থানটা ঘুরে আসা যায়!' যোধপুর, চিতোর, উদয়পুর...!

কৈলাসের কেলেঙ্কারি কিন্তু কৈলাশ পর্বতে আরোহনের সুযোগ দেয় না। তা নইলে চৌকোস্ স্পোর্টস্‌ম্যান ফেলুদার সঙ্গে আমরা মাউন্টেনিয়ার হতে পারতাম। এই কাহিনীর দৃশ্যপট ঔরঙ্গাবাদ পেরিয়ে ইলোরা, সেখানকার কৈলাস মন্দির। 'যক্ষী'র মাথা যারা চুরি করেছিল, সেই কুখ্যাত র‍্যাকেট বিনাশ করতে কী তৎপর ফেলুদা। সাবাস!

দিব্যি ঘুরে বেড়চ্ছি আমরা। ঠিক ট্যুরিস্ট ম্যাপ-এর বৈজ্ঞানিক ফর্মুলা ধরে যদিও নয়। বরং ক্রিস্-ক্রস্, জিগ্-জ্যাগ্ লাইন-আপ। মাঝে মাঝে জাম্প-কাট্। 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ আমরা কাশীতে —'ফেলুবাবা পার করে গা'। ফেলুদাকে হর্ষধ্বনি দিতে গিয়ে 'বাবা' বলা খুবই কৌতুকবহ জেনুইন স্তুতিধ্বনি। কারণ, সাংঘাতিক দেশদ্রোহী ভিলেন মগনলাল মেঘরাজ এখানে পরাস্ত!

আমাদের চলার তাল মাঝে-মধ্যে বদলাচ্ছে। সমুদ্র আর জগন্নাথদেবের পুরী হয়ে উঠল 'হত্যাপুরী'— ভারতবর্ষে ধর্মস্থানেই তো অধর্মের চাষ হয় বেশি! 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য'র ঘনঘটা 'উত্তরের সুন্দরবন' ডুয়ার্সে। 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডু'তে আবার মগনলাল মেঘরাজের মুখোমুখি। 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ'-এ রাঁচি। বোম্বেটে ধরতে আমরা গেলাম বায়োস্কোপের বোম্বাইয়ে।

'সোনার কেল্লা'র অকুস্থলে আমাদের গরম লেগেছিল। তাই কি ফেলুদা আমাদের থেকে থেকেই শীত-প্রধান জায়গায় ছুটিয়ে মেরেছে? ভুস্বর্গ কী ভয়ংকর! ভারি জমজমাট দার্জিলিং! 'বাক্স-রহস্য'র সমাধানে সিমলা। কেদারনাথেও কী কাণ্ড! এর আগেই সিকিম ও নেপাল তো ঘুরেই এসেছি।

হোয়াট অ্যাবাউট কলকাতা এবং তার আশপাশ?

'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া' বুঝতে পেরে, ফেলুদা আমাদের হাত ধরে নিয়ে গেছে পার্ক স্ট্রিটের গোরস্থানে, এবং সাবধানবাণী শুনিয়েছে। আজও কলকাতা আছে কলকাতাতেই। তাই 'গোলকধাম' বলে সেই বাড়িটার গোলকধাঁধায় কিম্বা 'গোয়াল-দেবতা'র রহস্যে, এমনকি কৈলাশ চৌধুরীর পাথর বা ডাক্তার রাজেন মুনসীর

ডায়রি বা অম্বর সেনের অন্তর্ধান নিয়ে কলকাতা ফেলুদার রোমাঞ্চ-রহস্যের অ্যাপেটাইট বহুলাংশে পূর্ণ করেছে বৈকি। তেমনি অপ্সরা থিয়েটারের আশ্চর্য মামলা!

কলকাতার কাছাকাছি মফস্বল বা একটু দূরের জেলা অঞ্চলেও রহস্যকণা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাইতো নিজের দেশটাকে চিনতে পারলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কাটোয়ার কাছে গোঁসাইপুর কী সরগরম (বর্ধমান জেলা)! আবার ঘুটঘুটে ঘটনার অন্ধকারে, একেবার পলাশির (মুর্শিদাবাদ) কাছে? তেম্‌নি 'সমাদ্দারের চাবি' খুঁজতে বামুনগাছি কিম্বা 'গোলাপী মুক্তা রহস্য'তে পানিহাটি (উত্তর ২৪ পরগণা)। 'রবার্টসনের রুবি'র ব্যাপারে শান্তিনিকেতন থেকে এদিক ওদিক (বীরভূম)।

'জেরিনার কণ্ঠহার' (হেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত) নিয়ে 'অবলাকান্ত' নামে এক আধাভৌতিক খলনায়ক জয়ন্ত-মানিক-বিমল-কুমারের সম্মিলিত সাঁড়াশি আক্রমণকে কলকাতারই একটি বৃহৎ সুপ্রাচীন বাড়ির মধ্যে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল। সেই ভিলেনের বিশাল আকৃতি, কিন্তু কণ্ঠস্বর একেবারে মিহি—কোনো এক মিষ্টি মেয়ের মতো। তাই লড়াই শেষে ডিটেকটিভ-দলকে পর্যুদস্ত করে, তখনকার মতো পালাতে পেরেছিল ভিলেন। পরে (অন্য কাহিনীতে) সে ধরা পড়ে।... এ-সব গল্পের পাশে বুদ্ধিতে, বিদ্যেতে, সৌন্দর্যে ফেলুদার অ্যাডভেঞ্চার—লা জবাব! তার ওপর 'শকুন্তলার কণ্ঠহার' উদ্ধারে আবার আমরা লখ্‌নৌতে। লখ্‌নৌ রি-ভিজিটেড।

হঠাৎ একসময় সাউথ। দক্ষিণ ভারতে। মাদ্রাজ। ...বলি কি, নানা রহস্য ঘিরে ফেলুদার ছোটাছুটি বা ভারত আবিষ্কার নিয়ে একটা ম্যাপ বানানো দরকার।

ফেলুদা সমভিব্যাহারে আমরা বিদেশেও গেছি। 'লন্ডনে ফেলুদা'র সঙ্গে ঘুরে-বেড়িয়ে বুঝেছি, বিলেত দেশটাও মাটির, স্বর্গ মোটেই নয়। এবং সেখানে বদ্‌মাইসি বা অপরাধের কারখানা আছে এন্তার। 'টিনটোরেটোর যীশু'র ছবি চুরি হওয়ায়, আমাদের রাতের ঘুম ছুটে যায়। কী করে রেনেসাঁস-ইটালির শক্তিমান শিল্পীর সৃষ্টিকে উদ্ধার করা সম্ভব? কলকাতা থেকে হংকং—এ ফ্রি ট্রেড জোন্। হটবেড অব্ ক্রিমিনালস্। থ্যাঙ্ক গড! ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। শিল্প-রসিকরা ফেলুদার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমরা খুশি ফরেন-ট্যুরে! তাছাড়া অন্য দেশে একটু ঘুরে না-বেড়ালে, নিজের দেশকে চেনা যায় নাকি?

মোট কথা, ফেলুদা এক ইন্‌ভেস্টিগেটিভ ট্যুরিস্ট। অবিশ্যি ট্যুরিজম উইথ এ ডিফারেন্স! নাকি

ইন্‌ভেস্টিগেশনস্‌ বাই এ ক্রেজি ট্যুরিস্ট? এত আনন্দের, রোমাঞ্চের ও শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতার এই বেড়ানোর সুযোগ, আমরা আবার কবে পাবো? যদি নাও পাই, ক্ষতি নেই। যা পেয়েছি, তারই আস্বাদ উপভোগ্য হয়ে থাকবে জীবনভর। সময় গড়াক্‌ না!

হ্যাঁ, ফেলুদার সঙ্গে তোপ্‌সে ও জটায়ু তো রয়েছেই, ডাইনে-বাঁয়ে। কিন্তু ভোলা যাবে না—আছেন আর-একজন। তিনি নেপথ্যে। কিন্তু সেই সিধুজ্যাঠার (সিদ্ধেশ্বর বসু, যিনি এক লিভিং এন্‌সাইক্লোপেডিয়া) কাছ থেকে ফেলুদা সব সময়েই অফুরন্ত পাঠ নিয়েছে। সিধুজ্যাঠার দেখা সেভাবে না-পেলেও, তাঁর সহাস্য আমন্ত্রণ আমাদের কল্পনা করতে অসুবিধে হয় না। ফেলুদার সঙ্গে আমরা কান পেতে রই এবং হয়তো শুনতেও পাই সিধুজ্যাঠার কণ্ঠস্বর

'চাই চাই করো কেন, এসো বসো এখানে
অচেনা ও অজানার যত জট যেখানে।
ক্লু আর কিউ নিয়ে যাহা কিছু প্রশ্ন—
জবাবটা পেয়ে যাবে, ঠাণ্ডা বা উষ্ণ!'
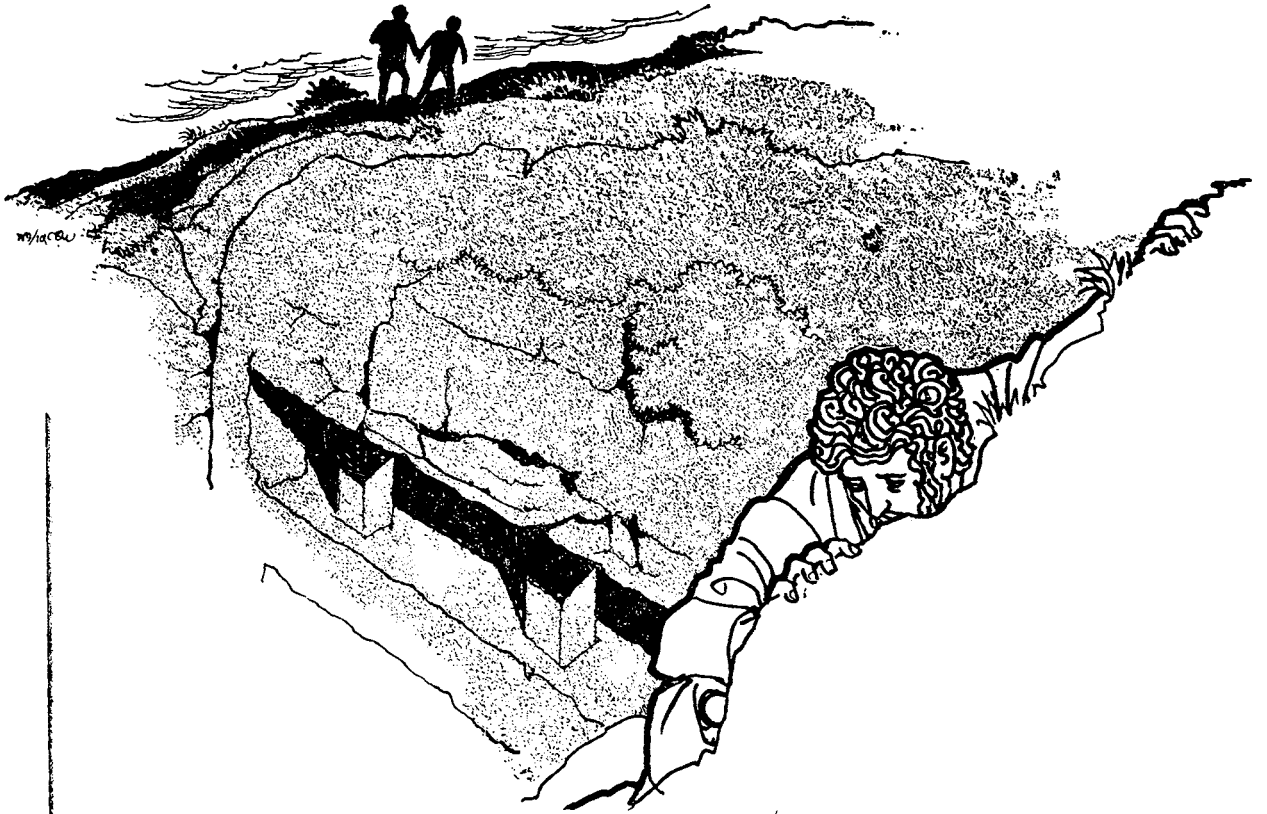
শুধুমাত্র 'সন্দেশী' গ্রাহকদের জন্য

ভুল-ঘরে-ফেলুদা প্রতিযোগিতা

আর্ট কলেজ থেকে সটাং 'সন্দেশ' পত্রিকায় ছবি আঁকতে এসেছিলেন দেবাশিস দেব, ১৮ বছর আগে। সত্যজিৎ রায়ের হাতে-গড়া, তোমাদের সেই প্রিয় শিল্পী দেবাশিস দেব কী অদ্ভুত একটা ছবি বিরাট খামে ভরে 'সন্দেশ'-আপিসে পাঠিয়েছেন, দেখে তো আমরা তাজ্জব বনে গেলাম! দেবাশিসের ম্যাজিকে একটা ভুল প্রাসাদের ভুলে-ভরা ঘরে হাজির হয়েছে স্বয়ং ফেলুদা! একা নয়, তোপ্‌সে আর লালমোহনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে। কী কাণ্ড বলো তো!

সত্যি বলতে কী, সত্যজিৎ রায়ের পর ফেলুদাকে নিয়ে এত বড় ছবি আর-কেউ আঁকেননি। কিন্তু দেবাশিস দেব আঁকলেনই যখন, আরও মন দিয়ে আঁকলেন না কেন, ছিঃ! এমনকি তিনি নিজের...এই রে, আর-একটু হলেই—যাক্ সে-কথা। নাও, তোমরা এবার আতস-কাচ দিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখো। পাশের ছবিটাতে কী কী ভুল আছে—তার একটা ফর্দ বানিয়ে, আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও।

★ নিয়মাবলী ★

- শুধুমাত্র ১৭ বছরের কমবয়েসি 'সন্দেশ'-এর গ্রাহকরা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে।
- তোমার নাম, গ্রাহক নম্বর ও বয়েস স্পষ্ট করে লিখবে।
- ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬-এর মধ্যে তোমাদের ফর্দ 'সন্দেশ'-এর আপিসে পৌঁছনো চাই।
- ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬-এর মধ্যে চাঁদা পাঠালে, নতুন গ্রাহকরাও এই প্রতিযোগিতায় ফর্দ পাঠাতে পারবে।
- ফর্দ পাঠাবার সময় খামের ওপর লিখতে ভুলো না—*ভুল-ঘরে-ফেলুদা প্রতিযোগিতা*

❑ পুরস্কার ❑

১ম পুরস্কার ৫০০ টাকা। ২য় পুরস্কার ৩০০ টাকা। ৩য় পুরস্কার ২০০ টাকা।
দরকার হলে পুরস্কারের টাকা ভাগাভাগি করা হবে।

MAY 1995
WATER COLOURS
POCKET DICTIONARY
COLLINS
PUNCH
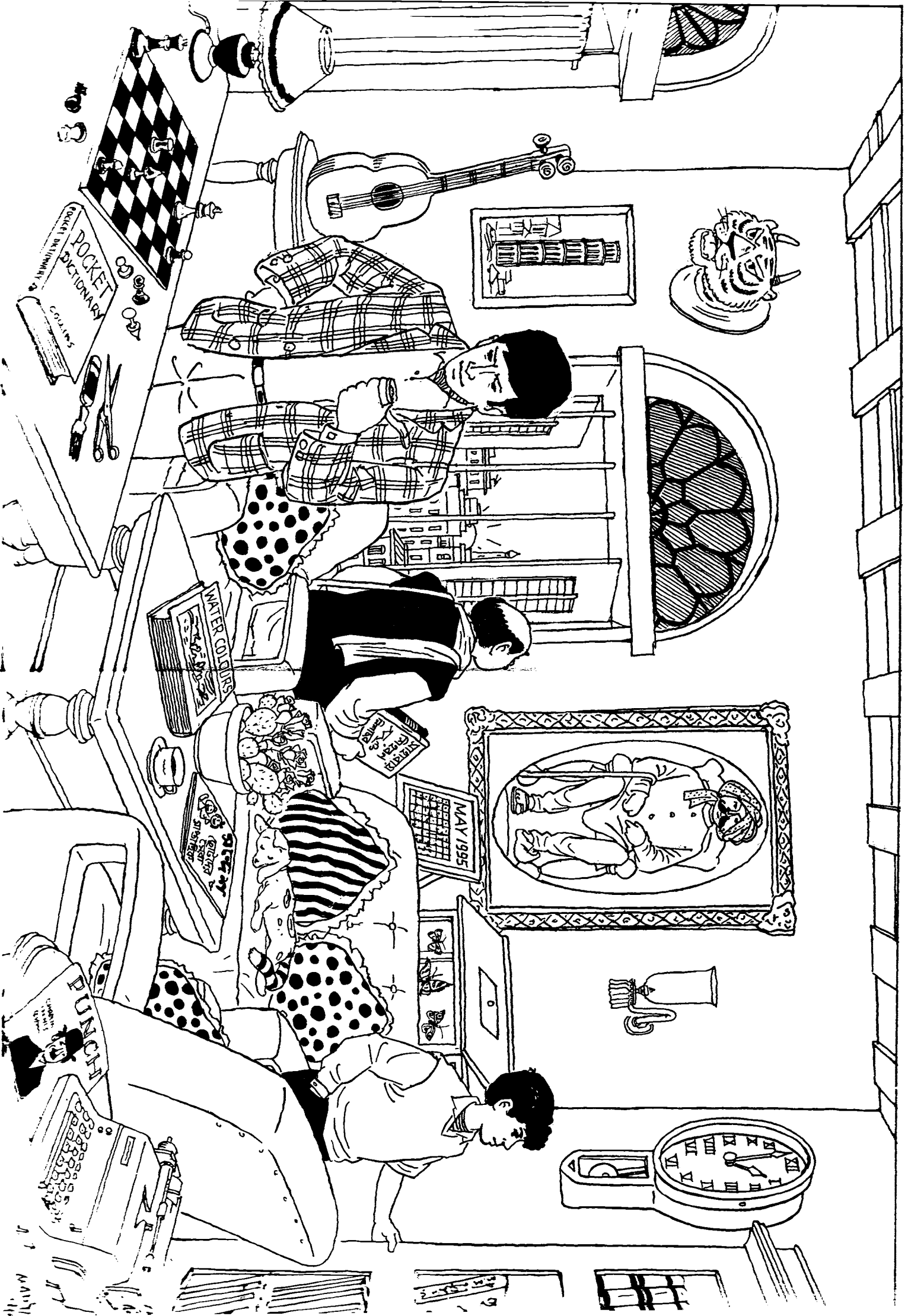
ফেলুদা ৩০

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

'সন্দেশ' হাতে, 'সন্দেশ' পাতে, 'সন্দেশ' মাঠে, ঘরে
এবার পুজোয় 'সন্দেশ' সেরা, স্বাদ আর কলেবরে।
যেই পুজো শেষ, স্টলে গিয়ে শুনি—ফুস্‌মন্তর, নেই!
আসছে দারুন 'ফেলুদা সংখ্যা,' ভীষণ শঙ্কা এই—
হকার দেবে তো? উড়ে যাবে না তো? চারিদিকে হাহাকার।
না গেলেই ভালো, হাতে নিয়ে যাবো, উৎসব ফেলুদার!
ফেলুদাকে নিয়ে 'নন্দন'-এ হবে তারকার সমাবেশ
সারাদিন ছবি, হাসি-গান-ছড়া, উদ্যোগ 'সন্দেশ'।
তিনিও আছেন গল্পে ও গানে, ছবি আর কবিতায়
নাম বলো দেখি? পদবিটা তার বলেও দিচ্ছি, 'রায়'।

জটায়ু সন্দেশে : ১৯৯৫

ন ব নী তা দে ব সে ন

ফেলুদার বালিগঞ্জের বাড়ির বৈঠকখানা-ঘরে লালমোহন গাঙ্গুলী মশায় বসে আছেন। সামনে ধোঁয়া-ওঠা কফির মাগ ও ডালমুট, হাতে রবিবারের কাগজ। শীতের সকাল। ডোর-বেল বাজলো। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে একগাল হাসলেন লালমোহন গাঙ্গুলী। দু'টি ছেলে বা ছেলে-মেয়ে দর্শকদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ায়, নমস্কার করে লালমোহনবাবুকে। সঙ্গে সঙ্গে লালমোহনবাবুর ড্রামাটিক মোনোলগটি শুরু হয়। 'প্লীজ টেক এ সীট' বলতে ছেলে-মেয়ে দু'টি মোড়াতে বসে পড়ে, দর্শকের (আমাদের) দিকে পিছন ফিরে। লালমোহন তাদের (এবং আমাদের) সম্মুখবর্তী, তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ চালাচ্ছেন। নিজে যে-সোফাতে বসেছিলেন, আবার সেইখানেই গিয়ে বসেছেন। উনি একাই কথক।

[এটি একক শ্রতিনাটকও হতে পারে]

হেল্‌লো, হেল্‌লো, হেল্‌লো! গুড মর্‌নিং! আসুন, আসুন, ইউ আর মৌস্ট ওয়েলকাম্। বসতে আজ্ঞা হোক্। প্লীজ টেক এ সীট। বাট আয়াম স্যরি, ফেলুবাবু যে একটু বেরিয়েছেন তপেশের সঙ্গে? না-না, কোনো কেসে নয়, এই একটু শপিংয়ে! ইয়ে, আজ একটা স্পেশ্যাল অকেশান কিনা! মিস্টার পি. সি. মিত্তিরের এই প্রোফেশনের আজকে থার্ট্টি ইয়ার্স কম্‌প্লিট হলো, আমরা সেটাই একটু সেলিব্রেট করব! ওঃ হো, আপনারাও তো সেই কারণেই নিশ্চয়? একটু ওয়েট করুন, এক্ষুনি এসে পড়বেন।

অ্যাঁ? আমাকে প্রতি রোববার সকালে এখানে পাওয়া যায়, আপনারা সেটা জানেন? মানে, 'জটায়ু'কে চাই? কিন্তু আমার তো এটা থার্ট্টি ইয়ার্স নয়? তারচে ঢের বেশিদিন হয়ে গেল এই লাইনে। মাচ লংগার। আরে, রহস্য-রোমাঞ্চ কি কম দিন ধরে লিখছি মশায়? তা, বলুন, আপনাদের জন্যে আমি কী কত্তে পারি; হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ? সাক্ষাৎকার নেবেন? মানে ইন্টারভিউ? আপনারা কাগজ থেকে এয়েচেন বলচেন? রিপোর্টার? অথচ আপনাদের তো পকেটে কলম কি বলপেন কিছুই দেখছি না? নোটবুক কোথায়? নেই? পকেটে ছোট্ট টেপরেকর্ডার আছে? অ, তাই বলুন। বা, বা, চমৎকার। মানে, আলট্রা মর্ডান! মানে, খুব প্রোফেশনাল ইয়ে আর কি! কোথায় কিনলেন? কাঠমাণ্ডুতে খুব সস্তায় এ-সব ইলেক্‌ট্রিকের যন্ত্রপাতি অ্যাঁ? হ্যাঁ, ওই তো একই হলো, ইলেক্‌ট্রনিকের জিনিসপত্তর বিক্রি হয়। আমিও একটা কিনিচি — এই ডিটেকটিভগিরির কাজে খুব ইউজফুল। আমার ডিটেকটিভ প্রখর রুদ্রের চারটে পকেটে সর্বদা চারটে থাকে। নিঃশব্দে চালু করে দেয়, আর গোপনে ক্রুশিয়াল সব এভিডেন্স ধরে ফ্যালে। হুঁ-হুঁ বাবা!

তা বলুন, কী জানতে চান? ফায়ার অ্যাওয়ে? শুধু একটা জিনিস জিজ্ঞেস করবেন না, সদুত্তর দিতে পারব না। আমার টোটাল ইন্‌কাম কত, আমি সত্যিই ঠিক জানি না। ড্রাইভার হরিপদবাবু জানলেও জানতে পারেন — ইন্‌কাম-ট্যাক্সের ফাইলপত্তর উনিই পৌঁছে-টৌছে দেন তো উকিলের বাড়িতে। জানতে চান না? তা বেশ, বেশ। তাহলে কী জানতে চান বলুন? ফ্যামিলি হিস্ট্রি? অফকোর্স! কেন জিজ্ঞেস করবেন না? যতটুকু জানি বলতে পারি। তা কোত্থেকে আরম্ভ করব, বলুন?

নিজেকে দিয়েই শুরু করা যাক্। 'জটায়ু' নামে লিখছি

কেন? কেননা জটায়ু সীতা উদ্ধারের কাজে একটা কিউ ধরিয়ে দিয়ে হেল্প করতে পেরেছিল। আমার পৈতৃক নাম শ্রীযুক্ত লালমোহন গাঙ্গুলী। বর্ন ইন নাইনটিন থার্টি সিক্স। গ্রোথআপ ইন ওল্ড গড়পার ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া প্রি-ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু। প্রি-ইন্ডিপেনডেন্স। ওই যে বললুম, বর্ন ইন নাইনটিন থার্টি সিক্স? বাবারা ছিলেন থ্রি ব্রাদার্স। বাবা মিড্‌ল। জ্যাঠামশাই ছিলেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার — রাসটাক্স সিক্স আর পালসেটিলা থার্টি খেতে খেতে বড় হইচি মশাই! আর কাকা ছিলেন টেররিস্ট। টোয়েন্টি নাইনে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার টার্নবুলসাহেবের থুৎনি উড়িয়ে দিয়ে ফেরার হয়ে যান। ব্রিটিশ-পুলিশকে কচুপোড়া খাইয়ে, কাকা নো-পাত্তা! ওই যে এল. এম. গাঙ্গুলী অ্যান্ড সন্স, পেপার মার্চেন্ট? নাম শুনেচেন নিশ্চয়। আজ্ঞে হ্যাঁ। উনিই আমার গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার, ললিতমোহন। আমাদের গড়পারের বাড়িটা এল. এম-ই তৈরি করেন। তাঁর পরে আমার লেট ঠাকুরদাদা আর বাবা দু'জনেই ব্যবসাটা চালিয়ে যান। ফ্যামিলি বিজনেসটা ভালোই বুঝতেন ওঁরা তিনপুরুষে। তারপর যা হয় আর কি! বাবা যদ্দিন ছিলেন, ব্যবসাও তদ্দিন ছিল। ফিপ্‌টি টু-তে বাবা চলে গেলেন আর ব্যবসাও চলে গেল! হাতবদল। জ্যাঠাও তদ্দিনে এক্সপায়ার্ড কিনা, আর ছোটকাকা দুর্গামোহন তো সন্ন্যাস নিয়ে হিমালয়ে চলে গিয়েছিলেন। কেদারনাথের ওপারে একটা গিরিগুহায় শেষ জীবনটা... আপনারাও জানেন বোধহয়, ওই যে তপেশের 'এবার কাণ্ড কেদারনাথে'তে আমার যে-কাকার কথা আছে আর কি! ওই যে, যিনি একটা সাত লাখ টাকা দামের রত্নখচিত লকেট দিয়েছিলেন আমাকে? সেই-ই আমার ছোটকাকা, তিনিই। ওই লকেটের কী কম গুণ মশাই? মিরাক্‌ল ওয়ার্কার! হলোই-বা আমার বই বাজারে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে, চারদিনে সাড়ে চার হাজার কপি বিক্কিরি—

'অতলান্তিকের আতঙ্ক', 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে', 'কাঠমাণ্ডুতে কাটা মুণ্ডু'! সবগুলোই গরম কচুরির মতো বিক্কিরি হয়েচে, নিজের মুখে কী আর বলব মশাই—কিন্তু তার জোরে তো আর আমার আলিপুরের ওই ফ্ল্যাটও হয়নি, আর সেই ঝড়ঝড়ে সবুজ অ্যাম্বাসাডারের বদলে আজকের এই এ. সি কনটেসাও হয়নি। সব ওই ছোটকাকার লকেটের আশীর্বাদে! (চোখ বুজে নমস্কার, তারপর বড় বড় চোখ খুলে) অ্যাঃ, ছি-ছি (মস্ত জিভ কেটে) ফ্যামিলি এয়ারলুম—বেচব কেন? বালাই ষাট! ব্যাঙ্কের লকারে যত্ন করে রাখা আছে। ওটা পয়া কিনা? একজন প্রখ্যাত পামিস্ট পুরীতে আমাকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—সন্ন্যাসীর প্রদত্ত দৈব অঙ্গুরীয় থেকে আমার প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। ওই অঙ্গুরীয়টাই এই লকেট হয়ে গেছে আর কি। হেঁ হেঁ হেঁ! গণৎকারের কথার সবটা তো মেলে না! গুরুজনের আশীর্বাদ। তায় আদতে এক মহারাজার খুশি হয়ে দেওয়া রয়্যাল রিওয়ার্ড। গুণ কি একটা? ওর সঙ্গে সঙ্গেই, অ্যারিস্টোক্রেসির... ধনদৌলতের... একটা... মানে, একটা ইয়ে... যাকে বলে কোর্টলি অ্যাটমস্‌ফিয়ার, তাই জড়িয়ে আছে আর কি!

আজ্ঞে ন্নাঃ। আমি ফ্যামিলি-ম্যান নই, ব্যাচিলর, ব্যাচিলর। কন্‌ফার্মড ব্যাচিলর। এই ফেলুবাবুর মতনই। এখন তো লাইফটা ওঁদের সঙ্গে জড়িয়েও গেচে। এখন তো আর শুধু লেখক নেই, ওঁদের সঙ্গে অবজার্ভার হয়ে প্রায়ই ঘুরি, কত এক্সপিরিয়েন্স হয়। কত ম্যাচিওরিটি হয়। ব্যাচেলর না-হলে কি এ-সব বিপজ্জনক লাইনে থাকা যায়? বিলেতে কোনও ম্যারেড ডিটেকটিভ দেখেচেন আপনি? নেভার। বড়ই ডেন্‌জারাস লাইনখানা কিনা আমাদের! যত অ্যান্টিসোশ্যাল এলিমেন্টদের নিয়েই কারবার। যে-কোনওদিন ফৌত হয়ে যেতে পারি। সেই ফিফ্‌টি টু-তে বাবা যখন চলে গেলেন, তখন মা খুব জোর-জার করেছিলেন প্রথম কিছুদিন 'বাবা লালু, একটা বউ আনো।' কিন্তু আনবার আগেই হঠাৎ একদিন আমাকে অনাথ অরফ্যান করে রেখে দিয়ে, মা নিজেই সরে পড়লেন! (হাত উল্টে) ভ্যানিশ!

হেঃ-হেঃ, মনে আচে সেই কামু মুখুজ্যের 'ভ্যানিশ'? ডাইরেক্টর রায়-সাহেবের তৈরি ফেলুবাবুর ছবিতে জটায়ুর যেখানে ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্স ছিল? গ্রেট অ্যাডভোকেট সন্তোষ দত্ত করতেন আমার পার্টটা। অসাধারণ ক্যারেক্টর-অ্যাক্টর ছিলেন (হাতজোড় করে নমস্কার)! তা, আমার আর ঘরকন্না করা হয়ে ওঠেনি। ব্যস্ততায় থাকি তো! বড্ডই ব্যস্ততায় থাকি। ভেরি বিজি শিডিউল।

ও হরিপদবাবু, গাড়িটাতে তেল ভরে আনুন না ততক্ষণ? সারাদিন ঘোরাঘুরি আছে আজ। আমাদের ফেলুবাবুর ডিটেকটিভ জীবনের কিনা তিরিশ বছর পূর্তি, তাই একটা সেলিব্রেশন করচি! বেশি কিছু নয়, এই ওন্‌লি থ্রি অফ আস্—আমরা তিনজনে—তপেশ খাওয়াচে আর কি তাজবেঙ্গলে! আজ্ঞে হ্যাঁ, ইয়েস! তপেশও এখন ফেলুবাবুর কীর্তি-কাহিনী লিখে টু-পাইস করেছে মন্দ নয়। একটা হিরো হন্ডা মোটরবাইক কিনে ফেলেছে, বোঁ-বোঁ করে শহর চষে বেড়ায়। তবে হ্যাঁ, ওর দিলটা বেশ জেনারাস—এই তো সেদিনই আমাদের খাওয়াতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল নিরিমিষ্যি খানার নতুন একটা হোটেলে। কী যেন নামটা? ঠিক মনে পড়চে না, বৃন্দাবন না মথুরা কী যেন! সেখেনে দেখা হয়ে গেল আমাদের একজন ওল্ড অ্যাকোয়েনটেন্সের সঙ্গে। যাকে বলে পুরনো পাপী! সেই যে, মনে আছে তো? 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর সেই মিঃ মগনলাল মেঘরাজ! পিওর ভেজিটিরিয়ান হয়েও যে কেউ অমন খুনে-বজ্জাত হতে পারে, এমনি নৃশংস, ও-ব্যাটাকে চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করতুম না মশাই। অত সাত্ত্বিক আহারের কিনা এই ফল? অ্যাঁ, বসে বসে ঘটি ঘটি কেশর বাদামের শরবৎ ওড়াচ্ছে, আর সঙ্গে ইয়াব্বড়া-বড়া পেস্তার লাড্ডু! যেন কত নিরীহ মানুষটি! আমাদের দেখে কী ভদ্রতা, সেই ঠিক কাঠমাণ্ডুতে যেমন করেছিল! 'আসুন আসুন', 'বসুন বসুন'—যেন ওরই বাড়িতে বেড়াতে গেচি। তারপর শুনি, আরে সব্বোনাশ, সত্যি সত্যি সে-ব্যাটাই ওই হোটেলের মালিক! বজ্জাতটা জামিনে ছাড়া পেয়ে, দিব্বি বাইরে ঘুরচে! কিন্তু ও-লোকটাকে নিয়ে আর কোনও ফিলিম হবে না—উৎপল দত্ত মশাই গত

হয়েছেন কিনা! ওঁর মতন করে আর-কেউ মগনলালের পার্টটা কত্তে পারবেই না (হাত জুড়ে কপালে ঠেকাল)। আমার পার্টেও যেমন ছিলেন একজন ম্যাচলেস অ্যাক্টর—অতবড় অ্যাডভোকেট—অথচ কী চমৎকার বিনয়ী মানুষ!

সে যাক্, ফেলুবাবু বললেন, 'ব্যস্, এই শেষ। আর এই মথুরা না কী যেন, বৃন্দাবন, ওখানে আমরা যাবো না।' অথচ কী বলব মশায়, ওদের মালাই চা-টা সুপার্ব, ঠিক যেন ক্ষীর খাচ্চি! আর মিক্সড চাট্‌টাও তেমনি দারুণ! যেন অমৃত! আহা-হা-হা! টু ব্যাড, ইট বিলংস টু মিঃ মগনলাল মেঘরাজ—তাই দোকানটা পেট্রোনাইজ করা চলবে না। টাকাটা ক্রিমিনাল ওয়ার্ল্ডে সার্কুলেট করবে কিনা! সে যাই হোক্, ভেজিটেরিয়ান হলেও ফুডটা সত্যিই খুব টেস্টফুল ছিল কিন্তু—আন্‌ডাউটেড্‌লি। অনেক জায়গায় তো খেলুম! জয়পুর, যোধপুর, জয়সলমীর, কাঠমাণ্ডু, বোম্বাই, দিল্লি, দার্জিলিং, কাশী, গ্যাংটক, পুরী, কেদারবদ্রী, সিমলে—এত ভালো নিরিমিষ্যি, মানে নন-ভেজিটেরিয়ান ফুড... স্যরি, মানে ভেজিটেরিয়ান ফুড—আর কোথাও খাইনি মশাই। নো মাছ-মাংস, নো ডিম, অথচ খাদ্যে কী স্বোয়াদ। আহা-হা! তপেশ বেশ খুঁজে খুঁজে বের করে কিন্তু! ঠিক ফেলুবাবুর মতন ট্যালেন্টেড হয়ে উঠচে। এদিকে ছিল 'জটায়ু' হওয়ার ইচ্চে! ম্যাগাজিনে ফেলুবাবুর রহস্য-রোমাঞ্চের সত্যি ঘটনা লিখে, নাম করবার শখ! এই ধরুন ওর 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল', 'ব্যাঙ্ককে ব্যাঙ্ক-ফেল', 'টুণ্ডলা তোলপাড়', 'কানপুরে ভাঙচুর' বাজারে দারুণ চলেচে! এমন সব ক্যাচি টাইটেল দিতে তো এক্সপিরিয়েন্সড ম্যান লাগে? লাগে কিনা বলুন? নামগুলো অবিশ্যি আমারই দোওয়া! (চোখবুজে) তপেশেরই রিকোয়েস্টে। এ-সব গোয়েন্দা-কাহিনী লিখে ওরও রোজগার আমার চেয়ে কম নয় এখন! তবে হ্যাঁ, আগে শুরু করে, সংখ্যায় আমি ওকে মেরে দিইচি। তাছাড়া আমার হচ্চে মনসা মথুরাং গচ্ছামি — বছরে বারোটা বই বাঁ-হাতে লিখে ফেলতে পারি। আর ফেলুবাবু? বছরে উনি বড়জোর গোটা দু'-তিনেক ছোটদের কাছে গল্প করে বলবার মতন কেস পান। রিয়্যাল লাইফ তো? সব কেসগুলো তো লেখা যায় না। বুঝলেন না? তাই আমার কন্‌টেসা, আর তপেশের হিরো হন্ডা। তবে নট ফর ভেরি লং—হন্ডা এবার কন্‌টেসাকে ধরে ফেললে বলে! তারপর দেখবেন আমরা কী করি! এনিথিং অ্যান্ড এভ্রিথিং ইজ পসিবল্।

এই যে আমরা থ্রি মাস্কেটিয়ার্স—মানে ফেলুবাবু, তপেশ আর আমি—আমরা একটা জোট, মানে একটা ফ্যামিলি বলেই ধরে নিতে পারেন। আজকাল জগতে আর ব্লাড-রিলেশন বলে কিছু নেই। তুমি কার কে তোমার! যে সয় সে রয়। বুঝলেন না? বার্ডস অব্ দি সেম ফেদার হওয়াটাই আসল। ইয়ে, আমি আবার শ'তিনেক ইং বাং সং প্রবাদবচন মুখস্ত করেচি সম্প্রতি। কা তব কান্তা? কাস্তে পুত্র? সংসার মে বং অতীব বিচিত্র! হেঃ-হেঃ... বুঝলেন? ছেলে-বউ কেউ কারুর নয়, এই সংসার অতীব বিচিত্র! এখেনে যে কখন্ পরও আপন হয়ে যায়, কে বলতে পারে? প্রবাদ-প্রবচন মুখস্ত করে রাখাটা একজন রাইটারের পক্ষে খুব ইউজফুল—ঠিক ঠিক অকেশানে ঠিক ঠিক প্রয়োগ করতে পারলে, দারুণ এফেক্ট পাওয়া যায় লেখার সময়ে। ভেরি হ্যান্‌ডি। তা
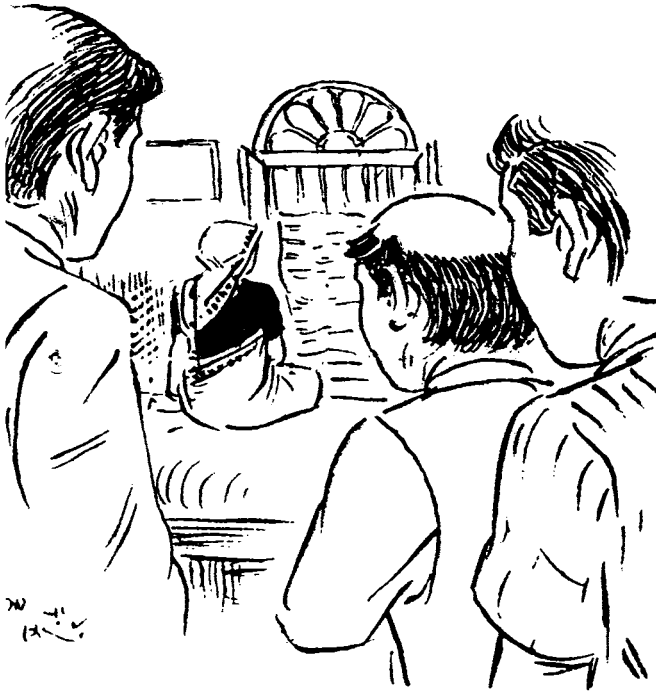
যা বলছিলুম মশাই—আম্মাদের কি রক্তের সম্পক্কো? উঁহু। (মাথা নেড়ে) আমাদের হচ্ছে এই যে, এইখানের, মানে, (বুক থাব্ড়ে) রিদয়ের সম্পক্কো। এটাই থাকে। এটাই আসল। দিস্ ইজ রিয়্যাল। বুঝলেন মশাই, ওই যে, বার্ডস অফ দি সেম ফেদার? ওইখানেই আসলে গেরোটা বাঁধা হয়েছে।

ফেলুবাবু রহস্য সমাধানে একজন জিনিয়াস। তপেশ এখনও ক্রমশ প্রকাশ্য, অ্যাপ্রেন্টিস জিনিয়াস। জুনিয়ার পি. সি. মিত্তির। আর জটায়ু, মানে আমি হচ্চি রহস্য-রোমাঞ্চ রাইটিঙের (চোখ বুজে) লাইনে আপাতত বেঙ্গল নাম্বার ওয়ান। আমার অবিশ্যি কাজটা সোজা। প্রবলেমও মনগড়া, তার সমাধানও মনগড়া। কিছু ইংরিজি বই-টই পড়লেই মাথায় প্লট চলে আসে—নট লাইক রিয়্যাল লাইফ। নট লাইক ফেলুবাবু। ইয়েস, এ গ্রেটম্যান। আই রিয়্যালি রেস্পেক্ট ফেলুবাবু। অসাধারণ মেধা। বুঝলেন? লিখে নিন, আমি 'জটায়ু' বলছি, ফেলুবাবু হচ্ছেন দি ডিটেকটিভ অফ থ্রি ডেকেড্স। গত তিন দশকে এমন গোয়েন্দা দু'টি আর দেখিনি আমরা ইন্ডিয়াতে। ইন্ডিয়া কেন? ওয়ার্ল্ডে। বাঃ! এই যে!

[শ্রীকান্ত দু'কাপ চা এনে রেখে গেল অতিথিদের সামনে, আর ডালমুট।]

আপনারা ফেলুবাবুর বাড়িতেই যে আমার সাক্ষাৎকার নিচ্চেন, এটাও খুব বুদ্ধির কাজ করেচেন। এখেনে আপনা থেকেই ঘন্টায় ঘন্টায় চা-কফি এসে যাবে। আর সঙ্গে ডালমুট। আঃ! কেমন খেলেন ডালমুটটা? বেশ মুচমুচে তো? এটা একটা স্পেশাল দোকানের। ওই নিউমার্কেটের ওখানেই। এই যে নিউমার্কেট—সাধে কি আমরা ইশকুলে পড়তুম—হগসায়েবের মার্কেট কলিকাতার অষ্টম

দ্রষ্টব্যস্থল! হুগলী ব্রিজ, চিড়িয়াখানা, হাইকোর্ট, অক্টারলোনী মনুমেন্ট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, যাদুঘর আর কালীঘাটের মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে এমন বাজার আর দেখেছেন কোথাও? অল আন্ডার ওয়ান রুফ?

কী না মিলবে নিউমার্কেটে? আফগানিস্তানের মেওয়া থেকে জাপানি ক্যামেরা। সাউথ আমেরিকার কোকো থেকে আরবের উটের চামড়ার চেয়ার। এই যে সবুজ জার্কিনখানা পড়ে আছি দেখছেন, এটাও ওখান থেকেই কেনা। অবিশ্যি এই গেরুয়ারঙের প্যান্টের পিস্‌টা সেবার কাঠমাণ্ডুতে—প্যান্টটাও! ওখানে কী সব ফ্যান্সি টেইলর—এক রাত্তিরে থ্রি-পিস্ স্যুট তৈরি করে দেবে!
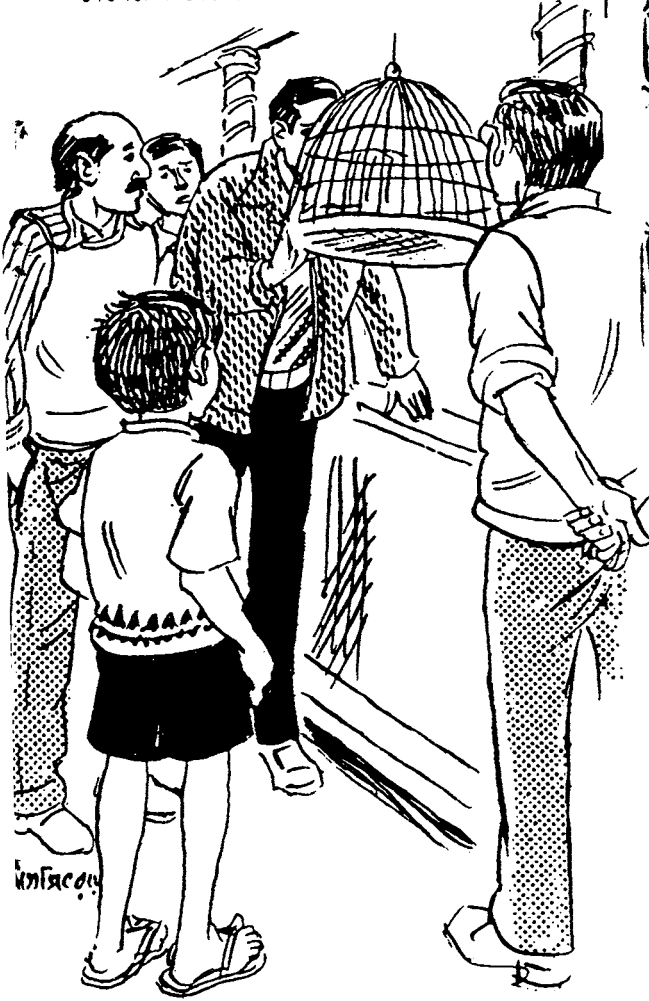
একদম পারফেক্ট! নিউমার্কেটে বাঘের দুধ চাইলে পাবেন মশাই, কিন্তু এক রাত্তিরে থ্রি-পিস্ স্যুট? ওটি হবে না। ওর জন্যে কাঠমাণ্ডু! তবে হ্যাঁ, আজকাল সবকিছুরই নকল বেরুচ্চে। কাঠমাণ্ডুরও নকল হতে পারে। আরে, গোটা যুগটাই যে নক্‌লির মশাই! নকল নিউমার্কেটেই তো ছেয়ে গেছে কলকাতা! বালিগঞ্জ নিউমার্কেট, ব্যায়লা নিউমার্কেট, বেলেঘাটা নিউমার্কেট! সর্বত্র হকার্স কর্নারগুলো আর কাটারাগুলো স-ব সায়েব সেজে নিজেদের নিউমার্কেট বলে চালিয়ে দিচ্চে। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারের ধাবাগুলো এবার 'গ্র্যান্ড হোটেল' হয়ে যাবে!

এভরিহোয়্যার ফলসিফিকিশন ইজ টেকিং প্লেস। আসলের চেয়ে নকলই বেশি। এই বিষয়ে আমাদের ইশকুলের বাংলার মাস্টারমশাই কবি বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের একটা অসাধারণ কবিতা আছে। অসামান্য দূরদৃষ্টি ছিল তাঁর! টিচার-পোয়েট তো? কী, শুনবেন? শুনুন তবে। একটু দীর্ঘ।

'একদিন মিশায়ে যাবে সাদাতে কালোতে।
একদিন মিশায়ে যাবে আঁধারে আলোতে।।
একদিন মুছে যাবে রাস্তা ও ঘাট।
একদিন হবে লীন দোকান ও পাট।।
রহিবে না আসল নকল।
সইবে না আর ধকল।।
থাকিবে কেবল শুধু হাজার হাজার।
সস্তার তিন অবস্থার চোরের বাজার।।'

গ্রেট পোয়েম! বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক ওয়াজ এ গ্রেট পোয়েট। আর ওফ্, কী পার্সোনালিটি! ব্যক্তিত্ব উইথ এ ক্যাপিটাল বি! টু ব্যাড—ফেলুবাবুর সঙ্গে ওঁর আলাপ করিয়ে দিতে পারলুম না। হি ডায়েড ইন ফর্টি নাইন, ওয়ান ইয়ার আফটার গান্ধীজিস্ ডেথ। তাঁর শেষ কবিতাটি গান্ধীর ওপরেই। কবিতা তো নয়, যেন চাণক্য-শ্লোক! আহা-হা।

'তুমি মহাত্মা
আমি পাপাত্মা
কিন্তু ওপারে গেলে চলে
সকলেই প্রেতাত্মা
নেইকো আর ভেদ আত্মা!'

কী আশ্চর্য ফিলসফি! ডেথ-এর ওপর এমন গভীর, সিন্‌সিয়ার, অথচ সিম্পল পোয়েম আমি খুব কমই পড়িচি। এটা শুনে ফেলুবাবুও খুব মুভ্‌ড। কবির নিজের মৃত্যুর প্রিমনিশানটা রয়েছে কিনা ওতে! তাই আরও ডেন্‌সিটিটা বেড়েচে। কবি বৈকুণ্ঠ মল্লিককে বাঙালি ডিস্‌কাভার করলে না, উনি যথাযথ অ্যাপ্রিসিয়েশনই পেলেন না। কালে কালে কতই হলো—অ্যাতগুলো পুরস্কার হলো—কিন্তু স্যারের জীবদ্দশায় কোনোটাই হলো না। এ জিনিয়াস লস্ট ইন দি উইলডারনেস অফ চুঁচ্‌ড়ো হাইস্কুল!

এই বৈকুণ্ঠস্যারই আসলে আমার ট্যালেন্টটা আবিষ্কার করেছিলেন, উনিই লেখার জগতে আমার পথপ্রদর্শক। এই যাকে বলে ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড। ফ্রেন্ড মানে ঠিক ফেন্ড নয় অবিশ্যি। মানে, ফেন্ডলি টিচার! ইয়ার দোস্ত কি আর? গুরু যাকে বলে। আমার নামটার পিছনেও ওঁর কন্ট্রিবিউশান আচে। বলব? কাউকে বলিনি আগে। তবে শুনুন, 'জটায়ু' নাম কেন। বৈকুণ্ঠস্যারের একটি কবিতা থেকেই এর উৎপত্তি! 'জটায়ুবন্দনা' কবিতাটি এই (চোখ বুজে)

'জয় জয় জটায়ু পক্ষীরাজা
তোমারি কারণে রাবণ পাইল সাজা
তুমিই দেখালে মোক্ষম প্রমাণ
ছাড়িলে মরণের বাণ
যেক্ষণে দেখাইলে রামকে সেই
নিদারুণ পথ
সীতাকে হরণ করিয়াছিল
যেই পথে রাবণের পুষ্পক রথ।'

অ্যাইবারে বুঝলেন তো? 'জটায়ু'র গুপ্তকথাটি কী? আমার লিটেরেচারে টেস্টটা তৈরি করে দিয়েছেন উনিই। ঈশ্বর বৈকুণ্ঠ মল্লিকের কল্যাণেই তো আজ লিখে টু-পাইস করে খাচ্ছি। এ 'জটায়ু' আর বাংলা সাহিত্যের আকাশে ডানাই মেলত না, বৈকুণ্ঠস্যারের ইনফ্লুয়েন্সটা টাইমলি না-পড়লে!

আবার ইদিগে ফেলুবাবুর আর তপেশের ইনফ্লুয়েন্সটাও আমার লাইফে বিরাট ব্যাপার। এঁদের পেয়ে যেন লাইফের কোর্সটাই চেঞ্জ করে গেচে আমার। আর ফিলিম হবার পরে তো কথাই নেই। (দু' হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে) হুড়হুড় করে বই বিক্কিরি হচ্চে—তপেশের একখানা করে নতুন বই বেরোয়, আর জটায়ুর দু'খানা করে পুরনো সংস্করণ ফুরিয়ে যায়। এই যোগাযোগটি আমার জীবনের লক্ষ্মী মশাই, লক্ষ্মী! আর ফেলুদার ফিলিম হবার পর সেটা চার ডবল হয়ে গেচে—যদ্দিন এক-একটা ফিলিম হলে চালু থাকে, তদ্দিনই জটায়ুর সমস্ত বইয়ের বিক্কিরি লাপিয়ে লাপিয়ে বেড়ে যায়! আর যাই বলুন, বাঙালিকে তো কালচার্ড পীপ্‌ল না-বলে উপায় নেই! দি মোস্ট কালচার্ড পীপ্‌ল ইন দি কান্ট্রি। নয় কি? শুধু ডিরেক্টার সাহেবের অকালে দেহান্ত হবার পর থেকেই আমার বাজারটা একটু পড়তির দিকে। জটায়ুকে উনি স্ক্রীনে যতটা ফেমাস করে দিয়েছিলেন, আমি রিয়্যাল লাইফে স্বয়ং ততটা কত্তে পারিনি, এটা কন্‌ফেস কত্তে হবে। রাইটার হিসেবে যতই সাক্‌সেসফুল হই-না-কেন, চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত

হওয়ার, সেখানে একটা ইম্পট্যান্ট ক্যারেক্টার হওয়ার গ্ল্যামারই আলাদা। পাবলিকের কাছে দরটা অনেকখানি বেড়ে যায় কিনা!

কী বলচেন? কতদিন চিনি? তা বেশ অনেকদিন হলো। সেই জয়সলমীরে গেলুম যে-বছর—মানে তপেশ যেবারে সোনার কেল্লা নিয়ে বইটা লিখলে। সেই থেকেই তো একসঙ্গে ঘেরাঘুরি। রোববার সকালবেলা রেগুলারলি ন'টা সাড়ে ন'টার মধ্যে আমি এই বালিগঞ্জে এসে পড়ি। সেটিতে ভুল নেই। আমার লেখা শেষ হোক্-চাই-না-হোক্, আমার এখেনে আসা চাই-ই-চাই। দে আর... দে আর—ইয়ে—লাইক মাই ওন ফ্যামিলি, ইউ সী?

আমার মাথাটাই খোলে না মশাই! ফেলুবাবুর সংস্পর্শে না-থাকলে, মস্তিষ্কে বিদ্যুচ্চালনা হয় না। জিনিয়াসের সঙ্গও একটু একটু জিনিয়াস বানিয়ে দেয় কিনা? যেমন ধরুন, তপেশ! একদিকে ফেলুবাবুর কাছে ফার্স্ট-হ্যান্ড গোয়েন্দাগিরি শিখচে, আর-একদিকে জটায়ুর কাছে ফার্স্ট-হ্যান্ড রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী রচনা করতে শিখচে। ওর বইয়ের নামকরণগুলো তো আমিই করে দি। আরে মশাই, পাবলিক কী খাবে, সেটা তো আমি বুঝি! হেঃ-হেঃ। তপেশ, ইউ সী, হি হ্যাজ দি বেস্ট অফ বোথ ওয়ার্ল্ডস্। ফেলুবাবু বোধহয় বিয়ে-থা আর করবেন না, ফিপ্‌টি সেভেন তো হলো! মনে হয়, আমার মতনই ফ্রী থাকার ইচ্ছে। কিন্তু তপেশ ইজ স্টিল ইয়াং। তপেশ বিয়েটা করলে আমাদের এই ঘাঁটিটা আরেকটু শক্ত হবে—ব্যাচেলর্স ডেন তো? বুঝলেন না? মেয়েদের একটা আলাদা ছিরিছাঁদ থাকে!

এই কথাটাই আমি তো লিখেছিলুম 'রঞ্জাগড়ের রাজ্যলক্ষ্মী' বইতে। ওই গল্পে রাজ্যলোভী মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে রাজা মরেই গেলেন। রাজবংশ রক্ষে কল্লেন কে? না রানী-মা। তিনি কিন্তু রাজপুত্রকে একটা চটের বস্তার মধ্যে ভরে নিয়ে পিঠে ফেলে, রাস্তার কাগজকুড়ুনি বুড়ি সেজে, রাজবাড়ি থেকে হাওয়া! পালিয়ে গিয়ে ঝোপ্‌ড়ি বস্তিতে লুকিয়ে রইলেন। একদিন সময় সুযোগ বুঝে, শী কেম ব্যাক। অ্যান্ড উইথ ভেন্‌জেন্স! চোখে ধিকি ধিকি প্রতিশোধের আগুন, হাতে বাঁকা কুক্‌রি, ড্রিপিং উইথ ব্লাড—দি ব্লাড অফ দি ট্রেটার মন্ত্রী! সভাসদেরা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল, 'জয় মা রাজ্যলক্ষ্মী কী জয়, রানীমাঈকী জয়!' ব্যস। তাপ্পর? তা-রপর, নিহত পিতার সিংহাসনে শিশুরাজপুত্র সমাসীন আর সারা দেশ লক্ষ্মীশ্রীতে ভাসছে!

নাঃ, ওটা আলাদা করে ফিলিম হয়নি, কিন্তু টিভিতে আপনারা 'জটায়ু' নামে ডিটেকটিভ সিরিয়ালটা প্রতি মঙ্গলবারে দেখছেন তো? থীম-সং... জ-টা-য়ু-উ...! আহা-হা, কী সুপার্ব সুর! শুনলেই গায়ে কাঁটা দেয়। ওতেই আচে! বাহান্নটা এপিসোড, এক-এক পর্বে এক-একটা বই। তিন বছর ধরে চলবে। টেন-থার্টি পি. এম টু ইলেভেন-থার্টি পি. এম। এবারে 'দি মোস্ট ওয়াচ্‌ড্ সিরিয়াল ইন্ রিজিওনাল ল্যাংগোয়েজেস' ডিক্লেয়ারড হয়েচে। হাইয়েস্ট রেটিং।

হ্যাঁ, বই? তা ঠাকুরের দয়ায় বেশ ক'খানি বেরিয়েচে! তিনশো পঁচাত্তর! লিখচি তো কম দিন নয়? ফার্স্ট পাবলিকেশন ফিপ্‌টি নাইনে। সেও মিস্ট্রি! হা হা হা 'হত্যাপুরী!' ওই একখানাতেই বাজার মাৎ হয়ে গেল! কী ছিল না ওতে! তারপর থেকে আর জটায়ুকে ফিরে তাকাতে হয়নি। 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' হিট্ করল। 'ম্যানিলার ম্যানহোলে', 'হনুলুলুর হননলীলা', 'নন্দাঘুন্টির নন্দী-ভৃঙ্গী', 'ভগলু ভাগল্‌বা'—টিভি-তে মিস্ট্রি-মুভির স্লটের কল্যাণে... এগুলো সব ক্লাসিক্‌স্ হয়ে গেচে। হিন্দিতেও হবে, এই নাইনটি সিক্স থেকেই—'জটায়ু'।

অবিশ্যি আজ যে আমার এই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফেম, এতে লেট সত্যজিৎ রায়েরও কিন্তু কন্‌ট্রিবিউশন কম নয়। চমৎকার সব ছবি তৈরি করেছেন উনি রিয়্যাল লাইফের লিভিং পার্সোনালিটিদের নিয়ে। যাকে বলে 'এ-ক্লাস'! এক্সেলেন্ট পিকচার্স। তাইতে আমার নাম ভূমিকায় নাবতেন যে ভদ্দরলোক—দি গ্রেট অ্যাক্টর, তিনিও আর আমাদের মধ্যে নেই। দি গ্রেট ডাইরেক্টর সায়েবের মতন তিনিও অকালে এক্সপায়ার করেচেন। ফেলুবাবুর আর তপেশের ভূমিকায় যাঁরা নাবতেন, তাঁরা এখন অনাথ, বেকার। তপেশ তো বই লিখেই যাচ্চে,

ছবি করবে কে? জটায়ুকে পাবে কোথায়? আপনারা তো আমার কাছে এয়েচেন 'জটায়ু'র ইন্টারভিউ নিতে? সন্তোষ দত্ত মশাই আজ যদি বেঁচে থাকতেন, অনেক ভালো বলতেন। ওঁর কাজই তো কথা বেচে খাওয়া, গুছিয়ে কথা বলার আর্টটা আমার চেয়ে ঢের রপ্ত ছিল। সত্যি বলতে কি মশাই, তাঁকে দেখে আর পাশাপাশি এই আমাকে দেখলে, আপনাদের যমজ ভাই বলে নিঘ্‌ঘাৎ ভুল হতো। এগ্‌জ্যাক্টলি একরকম দেখতে দু'জন লোক যে হতে পারে, ওই প্রাতঃস্মরনীয় ডাইরেক্টার রায়-সায়েবের কল্যাণেই সেইটি ডিস্‌কভার করা গেল। আমার তো মশাই ওঁর ফিলিম দেখতে দেখতে মনে হয়—এই আমিই বুঝি রূপুলী পর্দায় আমার পার্টে অভিনয় কচ্চি! অসাধারণ সন্তোষ দত্তের নকল করার এবিলিটি... কী ক্ষমতা, অবিকল জটায়ু! এক্‌কেবারে সেম-সেম। যত বয়েস হচ্চে, ততই আমি আমার গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার পেপার মার্চেন্ট এল. এম. গাঙ্গুলীর—আমার ইনিশিয়ালসও তাই, নোটিশ করেছেন কি?—আমি ওই এল. এম. গাঙ্গুলীর মতন দেখতে হয়ে যাচ্চি। বাড়িতে এল. এম-এর একটা অয়েলপেন্টিং আচে। কী বলব মশাই, যেই দ্যাখে, সেই মনে করে ওই বুঝি সন্তোষ দত্ত মশায়েরই ছবি। এমনই রিজেম্‌ব্লেন্স।

কী জানি—কোনও ফ্যামিলি কানেকশন ছিল কি না কোথাও, দত্ত আর গাঙ্গুলীতে?

একই প্ল্যানেটে জন্মেচি তো আমরা সবাই, ফ্যামিলি অব্ ম্যান বলে কথা! কোথায় যে কখন কার সঙ্গে কী সম্পক্কো বেরিয়ে পড়ে! লাইফ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিক্‌শান — এই আমার রহস্য-কাহিনী আর ফেলুবাবুর রহস্য-কাহিনীগুলোই দেখুন না। ওই একখানা কোল্ট রিভলবার পকেটে নিয়ে, কী কাণ্ডকারখানাই করে বেড়াচ্চেন ভদ্দরলোক! কেবল মগজের জোরে, মনের জোরে, আর যোগ-ব্যায়ামের জোরে। অবিশ্যি আমিও আজকাল অনেকটা ইয়ে... মানে, আগে তো স্লাইটলি ইয়ে মতন ছিলুম! এখন তার চেয়ে অনেকটা ইয়ে হইচি! সঙ্গগুণ আর কি! তবে কী জানেন, এই তিরিশ বচ্ছর ধরে—ওভার থার্টি ইয়ার্স ফেলুবাবু একটা দারুণ জিনিস শিখিয়েচেন আমাদের—হাউ টু মেনটেন ইওর ইয়ুথ!

তখন তো ছিল সাতাশ, এখন ওঁর সাতান্ন—কিন্তু চেহারাখানা একবার দেখেছেন? কী ফিট! অ্যাট দি মোস্ট, থার্টি-সেভেনের এক পা বেশি নয়। কেবল ব্যায়ামের জোরে মশাই, যোগ-ব্যায়ামে!

আমার? তাও মেঘে মেঘে আমারো বেলা কম হলো না, ফিপ্‌টি-নাইন! (টাকে হাত বুলিয়ে) সামনের মাসেই হীরকজয়ন্তী জন্মোৎসবটা হচ্চে। ওই রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের... ইয়ে ফ্যান-ক্লাব... মানে পাবলিশাররাই... রবীন্দ্রসদন ভাড়া করে 'জটায়ু'কে সম্বর্ধনা দিচ্চেন।

আর সম্বর্ধনা! আজ ডিরেক্টার-সায়েবও নেই, সন্তোষ দত্তও নেই! পাবলিকের চোখে আমাকে আজ যেমন দেখচেন, তার ফিপ্‌টি পার্সেন্ট ক্রেডিট ওই দু'জনের। ফেলুবাবুই অবশ্য পালের গোদা! মিঃ রায় থাকলে আজ ফেলুবাবুর থার্টি ইয়ার্স অব্ ডিটেকটিভ সার্ভিস নিয়ে একটা দারুণ ডকুমেন্টারি তুলতেন। আর সন্তোষ দত্তও যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে রায়-সায়েব কী আর... (টাক চুলকে) জটায়ুর হীরকজয়ন্তী জন্মোদিনে... ইয়ে রূপোলী পর্দায় দারুণ কিছু-একটা মারকাটারি কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতেন না? 'জটায়ুর জয়-জয়কার' জাতীয়? তা, এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই! মাঠ ফাঁকা! লাক, মশাই লাক! যখন ছিলেন, তখন তো অ্যাতোটা বুঝিনি। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝে না লোকে! 'আপনি কী হারাইতেছেন আপনি জানেন না'— সেই ছেলেবেলাতে কাঁচি সিগারেটের বিজ্ঞাপন দিতো, দেখিচি। ভেরি ট্রু, ভেরি ট্রু!

ওকি, উঠচেন যে? বসুন মশাই, আরেকটু বসুন, দু'নম্বরের কফিটা খেয়ে যান। এক্ষুনি এসে পড়লেন বলে ফেলুবাবুরা। আপনারা 'সন্দেশ' থেকে এয়েচেন শুনলে, তপেশ খুব খুশি হবে। প্রোফেশনে তিরিশ বছর হচ্চে, এবারকার সাক্ষাৎকারটা তো ভাই ফেলুদারই নেয়া উচিত ছিল? আরে? কেন দেবেন না? আহা, ভয় কিসের? নিশ্চয়ই দেবেন। মাটির মানুষ মশাই, মাটির মানুষ। একটু বসে নিয়েই যান ইন্টারভিউটা। ছেলে-মেয়েরা পড়লে খুশি হবে। জটায়ুরটা বরং নেক্সট সংখ্যায় দেবেন। হীরকজয়ন্তীর খবরটা সমেত। বেশ কমপ্রিহেনসিভ হবে। (টাক চুলকে) তাছাড়া তদ্দিনে টিভির ওই 'মোস্ট ওয়াচ্‌ড সিরিয়াল ইন্ এনি রিজিওনাল ল্যাংগুয়েজ' অ্যাওয়ার্ড গিভিং সেরিমনিটাও হয়তো হয়ে যাবে।

অ্যাঁ? আমার নেক্সট বইয়ের নাম কী? পরের টেলি-ফিলিমটা কে প্রোডিউস কচ্চে? ধুর্ মশাই, এতেও স্যাটিস্‌ফ্যাকশন হলো না? মোর কোশ্চেন্স? অ্যান্ড মোর অ্যানসার্স? আজগের দিনে কোথায় ফেলুবাবুর কথা জিজ্ঞেস করবেন তা নয়, নিজের কথাই সাতকাহন! (দুই হাত তুলে) বাস! তং মত্ করো। কাফী হো গিয়া! হেঃ হেঃ হেঃ—চিনতে পারলেন না? গ্রেট সন্তোষ দত্ত এন্টার্স! 'সোনার কেল্লা'র সেই ডায়লগ, মনে পড়ে? হেঃ হেঃ। অ্যা! অ্যাইবার ওরা এয়েচে। ওই শুনুন, দি বেল রিংস! মিঃ পি. সি. মিটার অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট আর হিয়ার!

Regn. No. WB/SC : 102 SANDESH December-1995 Price Rs. : 30.00
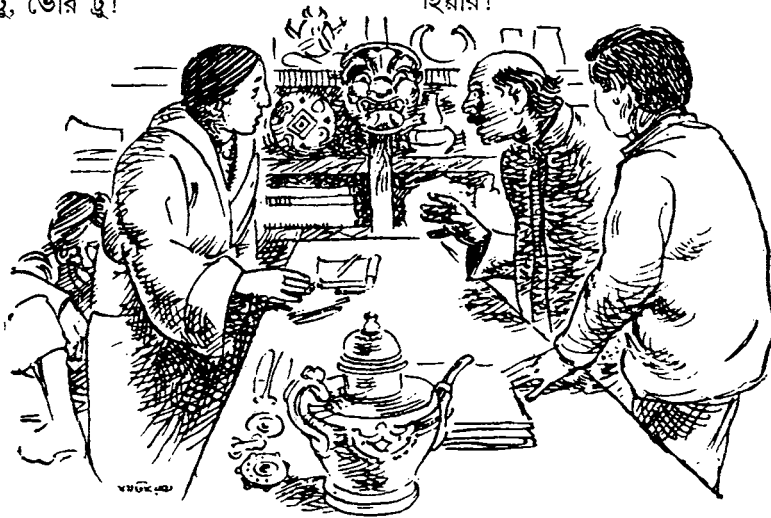
আনন্দবাজারের!

'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' গল্পে রাজেনবাবুকে কেউ উড়ো চিঠি লিখেছিল — 'তোমার অন্যায়ের শাস্তি ভোগ করিতে প্রস্তুত হও।' নানা জায়গা থেকে ছাপা কথা কেটে, আঠা দিয়ে জুড়ে চিঠিটা লেখা। ফেলুদা দেখে বলেছিল, "চিঠির দুটো শব্দ 'শাস্তি' আর 'প্রস্তুত'— মনে হচ্ছে খবরের কাগজ থেকে কাটা।" তিনকড়িবাবু বললেন, "আনন্দবাজার।"... "ওই টাইপটা আনন্দবাজারেই ব্যবহার হয়— অন্য বাংলা কাগজে নয়। ..."

ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়, ফেলুদার অ্যাডভেঞ্চারে একদিন আমরাও কেমন জড়িয়ে পড়েছিলাম।

আনন্দবাজার পত্রিকা

CONTRACT. ABP. 433.95 BEN